তিন গোয়েন্দা

ভলিউম ৩২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

কিশোর থ্রিলার

ভলিউম-৩২

তিন গোয়েন্দা

১১৫, ১১৮, ১২২

রকিব হাসান

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক

সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

ISBN 984-16-1385-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯
রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে
প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব
মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন
পেস্টিং: বি. এম. আসাদ
হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com
একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

তেষট্টি টাকা

Volume-32
TIN GOYENDA SERIES
By: Rakib Hassan

তিন গোয়েন্দা

হ্যালো, কিশোর বন্ধুরা—
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বিচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নামঃ
তিন গোয়েন্দা।
আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অপরজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভেজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নীচে
পুরনো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি এবার—
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে!

তিন গোয়েন্দার আরও বইঃ

প্রেতের ছায়া

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

গভীর নিদ্রা থেকে ধীরে ধীরে জেগে উঠল মনিকা হাওয়ার্ড। সারা গায়ে ভেজা ভেজা, ঠাণ্ডা কি যেন চেপে রয়েছে। বাতাসে নোনা গন্ধ। সৈকতে আছড়ে পড়ছে ঢেউ। আবার ঘুমের জগতে হারিয়ে যেতে ইচ্ছে করল ওর। পারল না। পুড়ে যাচ্ছে মুখ।

চোখ খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু ফুলে বন্ধ হয়ে গেছে যেন পাতা। উঠে বসতে চাইল। ভারি কি যেন বুকে চেপে আছে।

সামান্য ফাঁক হলো চোখের পাতা। মাথার কাছে শুকনো একতাল শ্যাওলার ওপরে মাছি ভনভন করছে। একটা মাছি এসে গালে বসল। পাতলা, রোমশ পা।

প্রথমে ঠোঁটে উঠল মাছিটা। সুড়সুড়ি লাগল। সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল সে। হাত তুলতে পারল না। ঠোঁট থেকে নেমে গাল বেয়ে ফোলা চোখের দিকে উঠতে লাগল। অসহ্য সুড়সুড়ি।

বিকেলের চড়া রোদ লাগছে চামড়ায়। ঠোঁট চাটল। ফেটে গেছে নরম চামড়া। ফোস্কা পড়ার উপক্রম। গলা শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত খসখসে হয়ে গেছে। ঢোক গিলতে ব্যথা লাগে।

নড়তে পারছি না কেন? কিসে আটকে রেখেছে?

জোর করে চোখের পাতা মেলে তাকাল।

গায়ের ওপর বালির পাহাড়। মনে পড়ল, সে-ই এভাবে চাপা দিতে বলেছিল। ভয়ানক বোকামি করে ফেলেছে।

অনেক কষ্টে মাথা উঁচু করে দেখল কাছে চলে এসেছে ঢেউ। সাগরে জোয়ার। আতঙ্কে কাঁপুনি শুরু হলো বুকের মধ্যে। উঠতে হবে ওকে। উঠে পালাতে হবে। নইলে ডুবে মরবে।

গরম বালিতে মাথা রেখে সাহায্যের জন্যে চিৎকার করে উঠল সে। ঘড়ঘড়ে শোনাল কণ্ঠস্বর। শুকনো ঠোঁটে ব্যথা লাগল।

কেউ সাড়া দিল না।

'শুনছ?' আবার চিৎকার করে ডাকল সে। 'শুনতে পাচ্ছ? আমাকে বাঁচাও।'

অনেক ওপর থেকে ডেকে উঠল একটা সী-গাল। ওর চিৎকারকে ব্যঙ্গ করল যেন।

নিষ্ঠুর রোদ শত্রুতা করে যেন পুড়িয়ে দিতে চাইছে ওর মুখ।

হাত বের করার চেষ্টা চালাল। পারল না। পানি উঠে এসে বালি ভিজিয়ে দিয়েছে। শুকনো বালির চেয়ে ভেজা বালি অনেক বেশি ভারী। ঠেলে সরানো কঠিন। তা ছাড়া ভয়াবহ গরম যেন তার শক্তি শুষে নিয়েছে।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল মনে করার চেষ্টা করল। কতক্ষণ শুয়ে আছে? জাস্টিনরা কোথায়?

চাঁদিতে ব্যথা শুরু হলো। মেঘশূন্য উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার ঝিমুনি আসতে চাইল তার।

হাত নড়াতে পারলে বালি ঠেলে সরানোর চেষ্টা করতে পারত। নড়াতেই পারছে না। বের করা দুঃসাধ্য।

বুকের মধ্যে জোরে জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা। কপাল থেকে গড়িয়ে নামছে ঘাম। আবার চিৎকার করে উঠল সে।

জবাব নেই। কেবল ঢেউয়ের শব্দ আর ওপরে সী-গালের কর্কশ, তীক্ষ্ণ ডাক।

'এই, শুনছ!' চেঁচিয়ে ডাকল আবার সে।

বাড়ি ফিরে গেল নাকি জাস্টিনরা? তাহলে যত জোরেই চেঁচাক না কেন সে, ওদের কানে পৌঁছবে না।

গলা বাড়িয়ে তাকাল। ষাট ফুট ওপরে পাহাড়ের চূড়ায় বাড়িটা। কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে।

পুরু পাথরে তৈরি দেয়াল। দুর্গের মত। ওই বাড়ি থেকে কেউ শুনতে পাবে না তার চিৎকার। কেউ আসবে না বাঁচাতে।

তবু চিৎকার করেই চলল সে।

দুই

প্রিয় মনিকা,

কেমন আছ?

গত গ্রীষ্মে রেড হিল ক্যাম্পে এত কম সময়ের জন্যে দেখা হয়েছে আমাদের, ঘনিষ্ঠতাটা বাড়াতেই পারিনি। তাই আবার দেখা করতে চাই।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আমার বাবা-মা বাইরে চলে যাচ্ছে। বলেছে, ইচ্ছে করলে ওই সময়টা আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে আমাদের সাগরপারের সামার হাউজে কাটাতে পারি।

তো, কি বলো, মনিকা? আসবে নাকি? আবার একসঙ্গে একটা সপ্তা কাটাতে চাই—তুমি, আমি, অ্যাঞ্জেলা আর নিকি। রেড হিল ক্যাম্পে যে চারজন বান্ধবী ছিলাম।

সময় খুব কম। এলে তাড়াতাড়ি করতে হবে তোমাকে। বাড়িতে ছুটি কাটাতে নিশ্চয় একঘেয়ে লাগবে তোমাদের। কথা দিতে পারি, এখানে লাগবে

না।

এসো। আমি অপেক্ষা করব।

—জাস্টিন

★

ওই চিঠিই নির্জন এই সৈকতে মনিকাকে টেনে এনেছে। জাস্টিনের আমন্ত্রণ পেয়ে অবাক হয়েছিল সে। তবু সঙ্গে সঙ্গে চলে এসেছে।

রিভারসাইড কাউন্টিতে ওদের বাড়ি। গরমকালটা ওখানে ভয়াবহ। বিশ্রী। ওর কোন বন্ধু নেই ওখানে। যে রেস্টুরেন্টে পার্ট টাইম চাকরি করত, সেটাও গরমের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং বাড়িতে হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে অযথা সেদ্ধ না হয়ে চলে এসেছে রকি বীচের সাগরপারে আরামে কাটানোর জন্যে।

চার বান্ধবীর একসঙ্গে হওয়ার ব্যাপারটাও বেশ রোমাঞ্চকর। একেকজন একেক শহরে থাকে ওরা। গত গ্রীষ্মে রেড হিলে ক্যাম্প করতে গিয়ে পরিচয় হয়েছিল। একটা সপ্তাহ বেশ হাসি-আনন্দে কেটে গিয়েছিল। এত মজা…এত মজা…কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব মাটি করে দিল দুর্ঘটনাটা…

★

জাস্টিনের চিঠি পাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে এক সুন্দর সকালে রকি বীচে আসার জন্যে বাসে চেপে বসল মনিকা। দীর্ঘ যাত্রা। সময় কাটানোর জন্যে একটা বই নিয়েছিল সঙ্গে। কিন্তু পড়া আর হয়নি। যাত্রার পুরো সময়টা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে প্রকৃতি দেখেছে আর ভেবেছে ক্যাম্পের কথা, জাস্টিন এবং অন্য তিন বান্ধবীর কথা।

রকি বীচে পৌঁছে বাস-স্টেশনে নেমে দেখে আগেই এসে ওর জন্যে বসে আছে অ্যাঞ্জেলা আর নিকি। ওরই সমবয়েসী দুজনে। কৈশোর শেষ হতে চলেছে।

নিকির কাঁধে হালকা একটা ডিজাইনার ব্যাগ। আর অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে বড় বড় চারটে ব্যাগ, সবগুলোর পেট ফোলা। হাসি চাপতে পারেনি মনিকা। কোথাও গেলে এত বেশি জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে যায় অ্যাঞ্জেলা, যেন চিরকালের জন্যে বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে। রেড হিল ক্যাম্পে নিয়েছিল বড় বড় দুটো ট্রাংক বোঝাই জিনিসপত্র আর একটা বিশাল ব্যাগে ভরে কসমেটিকস। এ নিয়ে বান্ধবীদের হাসাহাসি করতে দেখলে কৈফিয়ত দেয় অ্যাঞ্জেলা, কোথাও বেরোতে গেলে কোন জিনিসটা নেয়া উচিত, আর কোনটা বাদ দিলেও চলে, বুঝতে পারে না সে।

বাস থেকে নেমে হাত নেড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল মনিকা। এগিয়ে গেল। এই সময় চকচকে রূপালী একটা মার্সিডিজ গাড়ি প্রায় নিঃশব্দে এসে থেমে গেল বাস-স্টেশনের কাছে। ড্রাইভিং সীট থেকে দরজা খুলে নেমে এল জাস্টিন। দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরল নিকি আর অ্যাঞ্জেলাকে।

জাস্টিনের দিকে তাকিয়ে হাঁটছে মনিকা। এক বছর পর দেখা। আরও লম্বা হয়েছে জাস্টিন। ওজন কমেছে আগের চেয়ে। ওর সোনালি চুলও লম্বা

হয়েছে। আকাশী রঙের ডিজাইনার টপ আর সাদা টেনিস শর্টসে সুন্দর লাগছে ওকে।

নিকি সেই আগের মতই আছে। হালকা সবুজ চোখ, জলপাই রঙের চামড়া, টসটসে ঠোঁট, আর সোজা কালো চুল আলগাভাবে ঝুলে রয়েছে, কোমর ছুঁই ছুঁই করছে।

অ্যাঞ্জেলারও পরিবর্তন নেই। চারজনের মধ্যে খাটো সে। হালকা বাদামী পাতলা চুল। হাঁটতে গেলে ওর গোলাকার মুখের ওপর বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে ওঠে চুলগুলো। নিজেকে বয়স্ক আর ভারিক্কি করে তোলার জন্যে চোখে পরেছে ওইআর-রিমড চশমা।

মনিকাকে প্রথম দেখতে পেল নিকি। 'মনিকা!' এত জোরে চিৎকার করে উঠল সে, স্টেশনের সবগুলো চোখ ঘুরে গেল তার দিকে।

মনিকা জবাব দেয়ার আগেই তার কাছে দৌড়ে এল নিকি। জড়িয়ে ধরল। খুব আন্তরিক সে।

অ্যাঞ্জেলা এল। জড়িয়েও ধরল। তবে ছেড়ে দিল সঙ্গে সঙ্গেই।

জাস্টিনও জড়িয়ে ধরল মনিকাকে। তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এসো। দেরি করা যাবে না। এটা পার্কিঙের জায়গা নয়।'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সাগরপারের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল গাড়ি। এয়ারকন্ডিশনড। মাখন রঙা কোমল সীট। আরাম করে গা এলিয়ে দিয়ে বাইরে তাকাল মনিকা।

ছোট ছোট একসারি দোকানের পাশ দিয়ে চলল গাড়ি। সার্ফিঙের জিনিসপত্র আর মাছ ধরার সরঞ্জাম বিক্রি হয় ওগুলোতে। কতগুলো সামার-বাংলোর পাশ কাটাল। বাংলোর পর বড় বড় কয়েকটা বাড়ি। তারপর ফাঁকা।

'জাস্টিন,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম রকি বীচ শহরের ভেতরেই তোমরা থাকো।'

'না,' রাস্তার দিক থেকে চোখ সরাল না জাস্টিন, 'বাড়িটা শহর থেকে পনেরো মাইল দূরে, সী-সাইড হিলসে। তবে চিঠি পোস্ট করতে হলে রকি বীচে আসতেই হয়।'

রাস্তাটা মোড় নিল। দুধারে লম্বা ঘাসে ঢাকা বালির ঢিবি আর টিলা। তার ওপাশে শোনা যাচ্ছে সমুদ্রের মৃদু গর্জন।

'সৈকতের এই অংশটা সংরক্ষিত এলাকা,' জাস্টিন বলল, 'বার্ড স্যাংচুয়ারি।'

স্যাংচুয়ারির ভেতর দিয়ে কয়েক মাইল এগোল গাড়ি। অন্য পাশে বেরিয়ে এল। সরু হয়ে গেছে রাস্তা। খোয়া বিছানো। একটামাত্র গাড়ি চলতে পারে।

ফিলিপ ম্যানশন চোখে পড়তে অস্ফুট শব্দ করে উঠল মনিকা। সামনে আচমকা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যেন বাড়িটা। ক্যাম্পে থাকতে জাস্টিনের কাছে এটার ছবি দেখেছে সে। কিন্তু বিশাল বাড়িটার আকার আর সৌন্দর্য

ছবিতে ফোটেনি তেমন।

মোটা তারের জাল দিয়ে বেড়া দেয়া হয়েছে বাড়ি ঘিরে। সেই বেড়াকে আড়াল করে রেখেছে সুন্দর করে ছাঁটা লম্বা পাতাবাহারের বেড়া। গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একটা ধাতব গেট খুলল জাস্টিন। গাড়ি ঢোকাল ভেতরে। ধূসর পাথরে তৈরি বাড়ি। সামনে চমৎকার লন। এত সুন্দর করে সাজানো, মনে হয় রূপকথার পাতা থেকে তুলে আনা হয়েছে।

বাড়ির একপাশে গিয়ে শেষ হয়েছে গাড়িপথ। কাঁচের গম্বুজওয়ালা কনজারভেটরি চোখে পড়ল মনিকার। পেছনে ছড়ানো আঙিনায় টেনিস কোর্ট, রঙিন ঝলমলে গ্যাজেবো, বাগান, বিরাট সুইমিং পুল এবং কতগুলো ছোট ছোট বাড়ি।

তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে হাত তুলে দেখাতে লাগল জাস্টিন, 'ওটা বোট হাউজ। ওটা যন্ত্রপাতি রাখার ঘর। আর ওটা ক্যাবানা—সাঁতার কাটতে যাওয়ার সময় ঘর থেকে যদি কাপড় বদলে যেতে ইচ্ছে না করে তাহলে ওখানে বদলাতে পারবে। আর ওই যে ওটা মালীর ঘর, তারপরেরটা ছুতোর মিস্ত্রীর···আর বাড়ির পেছনের ওই বড় বাড়িটা গেস্ট হাউজ।'

'জাস্টিন,' রসিকতা করে বলল নিকি, 'তোমার কাছে ম্যাপ আছে? এত্তবড় বাড়ি। ম্যাপ দেখে দেখেও সাতদিন লাগবে শুধু বাড়ির কোথায় কি আছে সেটা জানতে।'

'ম্যাপ লাগবে না, সব সময় আমিই থাকব সঙ্গে। হারাবে না।'

একসঙ্গে দশটা গাড়ি রাখার মত বিশাল গ্যারেজে গাড়ি ঢোকাল জাস্টিন।

★

'সব সময় সঙ্গে থাকব!'

জাস্টিনের কথাটা এখন এক মস্ত রসিকতার মত কানে বাজতে লাগল মনিকার। জোয়ার আসছে ওকে ডুবিয়ে মারতে। সব সময় সঙ্গে থাকার প্রতিজ্ঞা ভুলে এখন কোথায় গেল জাস্টিন? অ্যাঞ্জেলা আর নিকিই বা কোথায়? এই প্রচণ্ড রোদে বালির নিচে ওকে একা রেখে কি করে চলে যেতে পারল ওরা?

চোখ বুজল মনিকা। গলা ব্যথা করছে। মুখের চামড়া পুড়ছে। ঘাড়ে সাংঘাতিক সুড়সুড়ি হচ্ছে। কিন্তু হাত আটকা। চুলকাতে পারছে না।

চাপা দিয়ে রাখা বালির ঢিবির প্রান্ত ছুঁয়েছে ঢেউ। যে কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে নাকের কাছে। শ্বাসরুদ্ধ করে দেবে।

বুকে এক ধরনের চাপ অনুভব করছে।

এগিয়ে আসছে ঢেউ।

ডুবেই মরব! বাঁচব না আর বেশিক্ষণ!

চোখ মেলল সে। ছায়া দেখতে পেল। মনে হলো মৃত্যুর ছায়া।

ছায়াটা ভারী হচ্ছে। আরও। আরেকটু।

দ্রুত এগিয়ে আসছে মৃত্যু।

মরিয়া হয়ে শেষবারের মত আরেকবার নিজেকে মুক্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা

চালাল মনিকা।

ছায়াটা ঢেকে দিল ওকে।

তিন

কিসের ছায়া বুঝতে অনেক সময় লাগল মনিকার। একজন মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে ওর ওপর। মানুষটার ফাঁক হয়ে থাকা পা চোখে পড়ল। পানি পড়ছে টপ টপ করে। ভেজা গোড়ালিতে বালি লেগে আছে।

ওপর দিকে তাকাল মনিকা।

সুন্দর এক জোড়া কালো চোখ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। কোঁকড়া চুল লেপ্টে আছে মাথার সঙ্গে। পরনে কমলা রঙের বেদিং স্যুট। ষোলো-সতেরো বছরের এক কিশোর।

'সাহায্য লাগবে?' জানে লাগবে, তবু কথা শুরু করার জন্যে মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল ছেলেটা।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করল মনিকা। 'হাত বের করতে পারছি না।'

বড় একটা ঢেউ এসে আছড়ে ভাঙল সৈকতে। সাদা ফেনা মেশানো পানি উঠে এল মনিকার নাকের কাছে।

দুই হাতে ভেজা, ভারী বালি সরাতে শুরু করল ছেলেটা। 'সাঁতার কেটে উঠে তোমার চিৎকার শুনলাম। তুমি কি একা?' অন্য কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে সৈকতের এদিক ওদিক চোখ বোলাল সে।

জবাব দেয়ার চেষ্টা করল মনিকা। খসখসে গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। মাথা ঝাঁকাল কেবল।

ঢেউ এগিয়ে আসতে দেখে আরও দ্রুত হাত চালাল ছেলেটা। বালি সরিয়ে মনিকার হাত ধরে টান দিল। 'বেরোও। পারবে?'

'পারব,' কোনমতে বলল মনিকা। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করছে।

'মুখের চামড়া তো পুড়েছে ভালমতই,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধহয়,' কাঁপা গলায় বলল মনিকা। বালির নিচে চাপা পড়ে থাকা পা বের করে এনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। 'আমার বন্ধুরা আমাকে ফেলে চলে গেছে। বুঝলাম না কেন!...আমি...'

দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। টলমল করছে পা। ছেলেটার কাঁধে ভর দিলে পড়ে যেত। রোদের দিকে তাকাতে গিয়ে আপনাআপনি সরু হয়ে এল চোখের পাতা। ধবধবে সাদা বালিতে রোদ যেন চমকাচ্ছে। দূরে চমকাচ্ছে ফিলিপদের সাদা রঙ করা বোট হাউজটা। দেখা যাচ্ছে এখান থেকে।

'তুমি না এলে কি যে হত...' কথা আটকে গেল মনিকার। মাথা ঝাড়া

দিয়ে লালচে চুল থেকে বালি ফেলার চেষ্টা করল।

ভেজা, আঠাল বালি চামড়া কামড়ে রেখেছে। সারা গা বালিতে মাখামাখি। ভীষণ চুলকায়। পা চুলকাতে শুরু করল সে।

ছেলেটা বলল। 'না ধুলে কমবে না।'

'ভালমত গোসল করতে হবে,' গুঙিয়ে উঠল মনিকা।

'ফিলিপদের বাড়িতেই তো যাবে তুমি?' পাহাড়ের ওপরের প্রাসাদটা দেখাল ছেলেটা। 'চলো, দিয়ে আসি।'

একা যাওয়ার সাহস করল না মনিকা। রাজি হয়ে মাথা ঝাঁকাল।

'আমার গলা পেঁচিয়ে ধরো। কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটো। লজ্জার কিছু নেই। ধরো। নইলে পারবে না।'

নীরবে নির্দেশ পালন করল মনিকা। ছেলেটার ভেজা শরীর ওর নিজের তেতে ওঠা শরীরের তুলনায় আশ্চর্য শীতল মনে হলো। পোড়া চামড়ায় যেন শান্তির পরশ বুলাল। পানিতে ভেজাতেই এমন ঠাণ্ডা হয়েছে হয়তো। পরম নিশ্চিন্তে ভর দিল ছেলেটার কাঁধে।

খুব সুন্দর চেহারা। আড়চোখে তাকিয়ে মনে মনে না বলে পারল না মনিকা। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ দুটো। মায়াময়। 'আমি মনিকা,' পরিচয় দিল সে। 'মনিকা হাওয়ার্ড। ফিলিপদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।'

জবাব দিল না ছেলেটা। মনিকাকে ধরে ধরে পাহাড়ের নিচে সিঁড়ির গোড়ায় নিয়ে এল। কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে পাহাড়ের চূড়ায়। ফিলিপ এস্টেটে।

ছেলেটার জবাবের অপেক্ষা করছে মনিকা।

'পোড়া চামড়ায় এক্ষুণি কিছু লাগানো দরকার,' ছেলেটা বলল। 'ফোস্কা পড়ে ঘা হয়ে যাবে নইলে।' নির্দ্বিধায় মনিকার কোমর জড়িয়ে ধরল সে। সরু সিঁড়ি বেয়ে উঠতে সাহায্য করল।

ছেলেটার এই সহজ, নির্বিকার ভঙ্গি খুব ভাল লাগল মনিকার। 'তোমার নামটা কিন্তু বললে না?'

দ্বিধা করল ছেলেটা। 'আমি? অলিভার।'

'কাছাকাছিই থাকো?'

অদ্ভুত হাসি ফুটল ছেলেটার ঠোঁটে। 'নাহ্।'

অবাক লাগল মনিকার। কি বোঝাতে চাইল?

সিঁড়ির মাথায় উঠে এল ওরা। লোহার তৈরি গেট। বন্ধ। ধাক্কা দিল মনিকা। শব্দ হলো। কিন্তু খুলল না গেট।

'সব সময় তালা দেয়া থাকে,' অলিভার বলল। 'চোর-ডাকাতের ব্যাপারে ফিলিপরা খুব সতর্ক। কুত্তাও পালে।' গেটের পাশের ঝোপের ভেতরে খুঁজতে লাগল সে। বেশিক্ষণ লাগল না, পেয়ে গেল কালো একটা বাক্স। ডালা তুলল। ভেতরে ইলেকট্রনিক কীপ্যাড। কয়েকটা নম্বর টিপল। কট করে একটা শব্দ হলো। খুলে গেল গেট।

'তুমি ওদের কোড জানলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল মনিকা।

রহস্যময় হাসি হাসল অলিভার। 'আরও অনেক কিছুই জানি আমি।'

অনেকটা শক্তি ফিরে পেয়েছে মনিকা। সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারছে এখন। টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুল পার হয়ে এসে দাঁড়াল পেছনের আঙিনায়। একটা স্লাইডিং ডোরের ওপাশে জাস্টিনকে দেখতে পেল।

মনিকাকে দেখে অবাক হয়েছে জাস্টিন। দরজা খুলে দৌড়ে বেরিয়ে এল। পরনে সাদা টেনিস খেলার পোশাক। পেছন পেছন বেরোল অ্যাঞ্জেলা আর নিকি।

'মনিকা!' চিৎকার করে উঠল জাস্টিন, 'এতক্ষণে এলে! আমি তো ভাবলাম বহু আগেই ফিরে এসে ঘরে ঘুমিয়ে আছ। ডিসটার্ব করতে যাইনি আর। যা ঘুম দেখলাম তখন চোখে...'

'ভেবেই খুশি থাকো,' তিক্তকণ্ঠে বলল মনিকা। 'আমাকে বালির নিচে সেদ্ধ হওয়ার জন্যে ফেলে এসেছ...'

'আমাদের দোষ দিচ্ছ কেন? তুমিই তো আমাদের বললে বালি চাপা দিয়ে দিতে...'

'চাপা দিতে বলেছি। কিন্তু ফেলে চলে আসতে বলিনি!' ফুঁসে উঠল মনিকা। 'জোয়ার শুরু হয়ে গেছে! আরেকটু হলেই আজ গেছিলাম!...জেগে উঠে দেখি নরক হয়ে গেছে জায়গাটা...রোদ কি! বাপরে বাপ! এমন জানলে কে যেত চামড়া ট্যান করতে! কিন্তু আমাকে ফেলে এলে কেন তোমরা?'

'জানলে আসতাম না। বিশ্বাস করো। ভাবতেই পারিনি এই রোদের মধ্যে তুমি এতক্ষণ বালির নিচে থাকতে পারবে!'

'গেছিলে কোথায় তোমরা?'

জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা, 'জাস্টিন জিজ্ঞেস করল, বার্ড স্যাংচুয়ারিটা দেখতে যাব নাকি? রোদের মধ্যে অহেতুক দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে লাগলাম। পাখি দেখার পর তোমাকে আনতে যেতে চেয়েছিলাম...'

বাধা দিল জাস্টিন, 'কথা পরেও বলা যাবে। ওর মুখের অবস্থা দেখেছ! তাড়াতাড়ি মলম লাগানো দরকার। নইলে ফোস্কা পড়ে যাবে।'

'বালির নিচ থেকে একা একা বেরোতে পারলে?' জানতে চাইল নিকি।

'পারতাম না,' মনিকা বলল। 'অলিভার সাহায্য না করলে।'

ভুরু কুঁচকে গেল জাস্টিনের, 'কে সাহায্য করেছে?'

'অলিভার...এই তো, আমার সঙ্গেই এসেছে।'

পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্যে ঘুরল মনিকা।

কিন্তু কোথায় অলিভার! কেউ নেই। কখন চলে গেছে টেরও পায়নি মনিকা।

★

শাওয়ারে ভালমত গোসল করল মনিকা। ঢিলেঢালা একটা নীল-হলুদ সানড্রেস পরল।

এক বোতল অ্যালো লোশন আর চামড়ার জ্বলুনি বন্ধ করার এক কৌটা স্কিন ক্রীম নিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিন। পুরো এক বোতল ফ্রিজের ঠাণ্ডা পানি

খাওয়াল মানকাকে।

বার বার দুঃখ প্রকাশ করছে জাস্টিন। বলল, 'নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারব না আমি। হাঁটা শেষ করে অন্য পথে বাড়ি ফিরেছি আমরা। বালির ঢিবিগুলোর ভেতর দিয়ে। নইলে তোমাকে দেখতে পেতাম। আমি ভেবেছি...'

'দোষ আমারও আছে। এত রোদের মধ্যে কেউ ঘুমায়! সম্ভব? জেগে থাকলেই তো তোমাদের চলে যেতে দেখলে ডাক দিতে পারতাম।' ড্রেসারের আয়নায় নিজের আগুনের মত লাল হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে রাগ করে বলল মনিকা, 'অ্যানটিহিস্টামিন ট্যাবলেটের জন্যেই হয়েছে এরকম। ঘোড়ার ডিমের ওষুধ দিয়েছে ডাক্তার। এত রোদের মধ্যেও ঘুম পাড়িয়ে দেয়...'

চামড়ায় হাত বোলাতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল সে, 'মাগো, ফোস্কা পড়ে যাবে! তারপর শুরু হবে চামড়া ওঠা। উফ্, মুখের চেহারাটা যা হবে! মাংস খসা ভূত...'

'আরে নাহ্, অত ভেবো না। কিছুই হবে না,' সান্ত্বনা দিতে চাইল জাস্টিন। 'তোমার চুল কিন্তু খুব সুন্দর লাগছে। আগের চেয়ে লম্বা হওয়াতেই বোধহয়। চুলের রঙ আর মুখের রঙে মানিয়ে গেছে।'

কৌটা খুলে এক খাবলা ক্রীম নিয়ে মুখে ঘষতে শুরু করল মনিকা। 'মানাক আর না মানাক, জীবনে আর এই বোকামি করব না আমি।'

★

বাড়িটার অন্য সব কিছুর মতই ডাইনিং রুমটাও বিশাল। অনেক লম্বা।

একধারে মার্বেল পাথরের একটা টেবিল ঘিরে বসল ওরা। পুরো ঘরটাই খালি পড়ে রইল। অনেক বড় একটা ঝাড়বাতি ছাত থেকে ঝুলে আছে ঘরের মাঝখানে বসানো বিরাট টবের ওপর। তাতে হলুদ আর সাদা কৃত্রিম ফুল।

'এত বড় ঘর,' চারদিকে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল অ্যাঞ্জেলা, 'আমার অস্বস্তি লাগছে।'

'অস্বস্তির কি হলো?' জাস্টিন বলল, 'যেন পরের বাড়িতে এসেছ। বসো আরাম করে।'

'ঠিক আছে, এই বসলাম,' চেয়ারে জাঁকিয়ে বসার ভঙ্গি করে হাসল অ্যাঞ্জেলা।

'রাতের মেন্যু কি?' জানতে চাইল নিকি।

মাথা নাড়ল জাস্টিন, 'জানি না। সে দায়িত্ব হিউগির ওপরই ছেড়ে দিয়েছি। দেখে এলাম বার্গার বানাচ্ছে। রান্না এমনিতে খারাপ না ওর। মজা করেই খেতে পারবে। তবে চোখে দেখে না তো, কোন্টার মধ্যে কি দিয়ে বসবে কে জানে!' হেসে রসিকতার ঢঙে বলল, 'বার্গারে শুয়োরের বদলে কুত্তার মাংসও দিয়ে ফেলতে পারে।'

ওয়াক ওয়াক শুরু করল নিকি।

হাসল মনিকা। 'চোখের অবস্থা এতটাই খারাপ? চশমা নেয় না কেন?'

ঠোঁট ওল্টাল জাস্টিন। 'কি জানি! কত বলি নিতে, শোনে না। একটা অহেতুক ভয়—চশমা পরলে নাক আর কানের গোড়া নাকি ব্যথা হয়ে যাবে।'

হিউগির সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওদের। হাসিখুশি, কুমড়োর মত গোল, মাঝবয়েসী লোকটার মাথায় অদ্ভুত গোলাপী রঙের টাক। নাকের ডগায় যেন একটা মার্বেল বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তার নিচে সরু গোঁফ। জাস্টিন জানিয়েছে এক হপ্তার জন্যে এ বাড়িতে ও-ই একমাত্র কাজের লোক। বাকি সবাইকে ছুটি দিয়ে গেছেন তার আম্মা। তাঁরা ফিরলে তারপর আসবে।

দুই হাতে ধরে রূপার বড় একটা বোল নিয়ে ঘরে ঢুকল হিউগি।

'ওখানে রেখে যাও,' জাস্টিন বলল, 'আমিই বেড়ে দিতে পারব। তুমি বাকি খাবার নিয়ে এসোগে।'

'আচ্ছা,' টেবিলের একধারে বোলটা রাখল হিউগি। সালাদ। 'বার্গারও বানানো হয়ে গেছে। নিয়ে আসছি।'

জুতোর মচমচ শব্দ তুলে ঘর থেকে চলে গেল সে।

উঠে গিয়ে ওদের দিকে পেছন করে চীনামাটির প্লেটে সালাদ বাড়তে শুরু করল জাস্টিন। ওখান থেকেই বলল, 'এত বেশি ব্যস্ত ছিলাম ক্যাম্প থেকে আসার পর, তোমাদের কোন খোঁজই নিতে পারিনি এতদিন। সব সময় মনে হয়েছে তোমাদের কথা। কতবার যে ভেবেছি চিঠি লিখব, লেখা আর হয়ে ওঠেনি। কিছু মনে কোরো না।'

মনিকা জিজ্ঞেস করল, 'এতক্ষণ পর মাপ চাওয়াচাওয়ি কেন?'

'এখন মনে পড়ল তাই...'

খাবার বাড়ায় হাত চালু নয় জাস্টিনের। সময় লাগল। সবাইকে একটা করে প্লেট দিয়ে নিজেরটা নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসল।

চামচ তুলে নিয়ে খেতে শুরু করল ওরা।

'এখন বলো,' সালাদ চিবাতে চিবাতে বলল জাস্টিন, 'গত এক বছরে কার কি নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে?...একসঙ্গে হই-হই করে উঠো না সবাই। কারোরটাই শোনা যাবে না শেষে।'

এক টুকরো শসা তুলে মুখে দিল মনিকা। ভাবছে, কি বলবে। বছরটা তেমন ভাল যায়নি তার। বড়ই একঘেয়েভাবে কেটেছে। নতুন কিছু ঘটেনি।

নিকি আর অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল বিকৃত হয়ে যাচ্ছে নিকির চেহারা।

'কি ব্যাপার...' জিজ্ঞেস করতে গেল মনিকা।

কথা শেষ হলো না তার। বিকট এক চিৎকার দিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল নিকি। ঠেলা লেগে চেয়ারটা মেঝেতে উল্টে পড়ল ঠাস করে।

চার

চেঁচিয়েই চলেছে নিকি। কারও দিকে তাকাচ্ছে না। চুল খামচে ধরেছে।

'কি, নিকি? কি হয়েছে?' ব্যস্তভাবে জানতে চাইল জাস্টিন।

থরথর করে কাঁপছে নিকি। একটা হাত চুল থেকে সরিয়ে এনে সালাদের প্লেটের দিকে ইঙ্গিত করল। নিজে তাকাল না।

পাশে কাত হয়ে প্লেটে কি আছে দেখল মনিকা। নিকির মতই চোখ-মুখ বিকৃত হয়ে গেল তারও। লেটুস পাতার মধ্যে নড়ছে একটা বাদামী রঙের কেঁচো।

অ্যাঞ্জেলা উঠে এসে নিকির কাঁধে হাত রাখল, 'কি?'

'কেঁচো!' মনিকা বলল।

দুই হাতে মুখ ঢাকল নিকি। 'আ-আমি···যদি মুখে চলে যেত···ওহ্, মাগো!' কেঁপে উঠল সে।

নিকির গলা জড়িয়ে ধরে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল অ্যাঞ্জেলা।

চিৎকার করে হিউগির নাম ধরে ডাকতে লাগল জাস্টিন।

আস্তে করে মুখ থেকে হাত সরাল নিকি। 'সরি! একটা কাণ্ডই করে ফেললাম। কিন্তু কি করব? যা ভীষণ ভয় লাগে আমার। সেবার ক্যাম্পে দেখোনি শুঁয়াপোকা দেখে কি করেছিলাম!···আমি আসলে মানুষকে জ্বালাই খুব।'

'থাক ওসব কথা,' মনিকা বলল।

ক্যাম্পের কথা উঠতেই দুর্ঘটনাটার কথা আবার মনে পড়ে গেল তার। কিন্তু ভাবতে চাইল না। এখানে এসেছে আনন্দ করার জন্যে। উল্টোপাল্টা ভেবে মন খারাপ করলে মজাই নষ্ট হবে কেবল।

ছুটতে ছুটতে এল হিউগি। ওর লাল মুখ আরও টকটকে হয়ে গেছে। 'কি হয়েছে, মিস?'

'সালাদে কেঁচো এল কি করে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল জাস্টিন।

মুহূর্তের জন্যে হাঁ হয়ে গেল হিউগি। সামলে নিল দ্রুত। নিকির প্লেটটা টেনে নিয়ে কেঁচোটা দেখল। 'আমাদের বাগানের লেটুসই তো দিলাম। কি করে যে এল···' সালাদের বোল আর প্লেটগুলো গুছিয়ে নিয়ে তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে গেল সে।

ও চলে যাওয়ার পর অ্যাঞ্জেলা বলল, 'এটা কোন কৈফিয়ত হলো—আমাদের বাগানের লেটুসই তো দিলাম? যে কোন বাগানেই কেঁচো থাকতে পারে···কি বোঝাতে চাইল সে?'

'কি আর বোঝাবে?' হেসে বলল মনিকা। 'হয়তো বলল কেঁচোটাও আমাদের বাগানেই জন্মেছে।'

'মাঝে মাঝে বড়ই উদ্ভট আচরণ করে হিউগি,' মুখ কালো করে মাথা নাড়তে নাড়তে জাস্টিন বলল। 'ওর চশমা নেয়া জরুরী। চোখে দেখলে আর কেঁচো দিত না।'

নিচু হয়ে চেয়ারটা তুলে নিল নিকি। অনেকটা সামলে নিয়েছে। আঙুল চালিয়ে পেছনে সরাল সামনে চলে আসা কালো চুল। সবুজ চোখে উজ্জ্বলতা ফিরে আসছে।

ওর দিকে তাকিয়ে ভাবছে মনিকা। তিন বান্ধবীর মধ্যে নিকিকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে সে। কেন করে জানে না। করার কথা নয়। নিকি অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ, অস্থিরতা বেশি, স্বভাবে ওর নিজের সঙ্গে মেলে না। নিকির চেয়ে অনেক বেশি শান্ত সে। অনেক কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে পারে···

জাস্টিনের কথায় ভাবনা কেটে গেল তার। বিশ্রী ঘটনাটা ভুলিয়ে দেয়ার জন্যে নতুন প্রসঙ্গে চলে গেল জাস্টিন, 'মনিকা, তখন একটা ছেলের কথা বলেছিলে। বালি খুঁড়ে বের করে এনেছিল তোমাকে?'

'ঠিক। বলো না ওর কথা, শুনি?' চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে মনিকার দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা।

বড় রূপার ট্রে-টা নিয়ে ঘরে ঢুকল হিউগি। চীজবার্গারে বোঝাই। টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল। ফিরে এল এক বোল ফ্রেঞ্চফ্রাই নিয়ে।

যার যার প্লেটে বার্গার তুলে নিল ওরা।

মনিকা বলল, 'ও বলল ওর নাম অলিভার। সাঁতার কেটে উঠে নাকি আমার চিৎকার শুনতে পেয়েছে।'

'সাঁতার কেটেছে? আমাদের সৈকতে?' চোখের পাতা সরু করে ফেলল জাস্টিন। 'দেখতে কেমন?'

'ভালই তো। বেশ লম্বা। কোঁকড়া কালো চুল। সবচেয়ে সুন্দর ওর চোখ দুটো।'

'ওর নাম অলিভার বলল?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা।

'আশ্চর্য! কখনও দেখিনি ওকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল জাস্টিন। 'আমাদের সৈকতে কখনও কোন ছেলেকে ঢুকতে দেখিনি।'

'আমার মনে হয় দেখলে চিনতে পারবে,' মনিকা বলল। 'তোমাদের পেছনের গেট খোলার কোড জানে ও।'

জাস্টিনের চীজবার্গারটা হাত থেকে প্রায় খসে পড়ে গেল প্লেটের ওপর। 'বলো কি!'

'ও-ই আমাকে গেট খুলে দিল। নইলে ঢুকলাম কি করে?'

'অসম্ভব!' ভয় দেখা দিল জাস্টিনের নীল চোখে। 'একটা অচেনা ছেলে আমাদের গেট খোলার কোড জানে! সত্যি বলছ, মনিকা? রোদের মধ্যে কতক্ষণ পড়েছিলে তুমি, বলো তো?'

'অনেকক্ষণ। কেন?'

'ভুল দেখোনি তো? হ্যালুসিনেশন? বাস্তবে হয়তো ওরকম কোন ছেলে

'আহ্, কল্পনায় আমিও যদি অলিভারকে দেখতে পেতাম!' হালকা গলায় রসিকতা করল অ্যাঞ্জেলা।

হেসে উঠল নিকি।

রাগ লাগল মনিকার। জোর দিয়ে বলল, 'কল্পনা করিনি। ও আছে। আমাকে বাঁচিয়েছে। বালি খুঁড়ে বের করেছে।' বার্গারে কামড় বসাল সে। ফাঁক দিয়ে ফুচুত করে বেরিয়ে কোলের ওপর পড়ল টমেটো সসের ফোঁটা। 'আরে দূর! খাওয়াও ভুলে গেলাম নাকি আজ!' কাপড় থেকে সস মুছতে লাগল সে।

'কিন্তু কোন ছেলে থাকে না আমাদের বাড়ির আশেপাশে,' জাস্টিন বলল। 'আর আমাদের গেটের কোড জানা তো অসম্ভব। এমন কোন্ ছেলে...'

আচমকা কি মনে পড়ায় থেমে গেল সে। হাঁ হয়ে যাচ্ছে মুখ। তাড়াতাড়ি হাত তুলে চাপা দিল। বোধহয় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল। চওড়া হয়ে গেল নীল চোখ। গভীর ভাঁজ পড়ল কপালে।

ওর ভাবভঙ্গিতে চমকে গেল নিকি। 'কি হলো, জাস্টিন? বার্গারেও কেঁচো পেলে নাকি?' তাড়াতাড়ি নিজের আধখাওয়া বার্গারটা চোখের সামনে এনে দেখতে শুরু করল সে।

ওর কথা যেন কানেই ঢোকেনি জাস্টিনের। আনমনে মাথা নেড়ে বলল, 'আশ্চর্য!' মনিকার দিকে তাকিয়ে আছে। 'এ কি করে সম্ভব?'

'কোনটা? কী কি করে সম্ভব? এমন রহস্য করে কথা বলছ কেন?' জানতে চাইল মনিকা।

'এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি, ও কে!' কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলেছে জাস্টিন। 'সত্যি দেখেছ তুমি ছেলেটাকে, মনিকা, মিথ্যে বলোনি। হ্যালুসিনেশনও নয়। কিন্তু ও ছেলে নয়, মনিকা, ছেলে নয়!'

'কি আবল-তাবল বকছ?'

'ছেলেই ও,' টেবিলে ফেলে রাখা জাস্টিনের হাতটা অল্প অল্প কাঁপছে, দেখতে পেল মনিকা। 'কিন্তু বেঁচে নেই। ওটা ভূত। মরে যাওয়া একটা ছেলের ভূত!'

পাঁচ

হেসে ফেলল মনিকা। 'ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ? পারবে না। কারণ আমি নিজের চোখে দেখেছি ওকে। ভূতফুত কিছু না। ও বলল ওর নাম অলিভার।'

'আমিও ওকে জ্যান্তই ভেবেছিলাম,' ফিসফিস করে বলল জাস্টিন, 'যখন প্রথম দেখেছিলাম। কিন্তু ও জ্যান্ত নয়। ভূত।'

চকচক করছে নিকির সবুজ চোখ। 'তারমানে বলতে চাইছ তোমাদের বাড়িতে ভূত আছে?'

মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন। লম্বা জানালাটার দিকে আঙুল তুলল। পেছনের আঙিনা দেখা যায়। 'ওই গেস্ট হাউসে বাস করে। বেশির ভাগ ওখানেই দেখেছি ওকে।'

'তারমানে অনেকবার দেখেছ?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

প্লেটটা সামনে থেকে ঠেলে সরিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিনের দিকে তাকিয়ে আছে।

হালকা হাসি ফুটেছে মনিকার ঠোঁটে। জাস্টিনের কথা বিশ্বাস করছে না।

'একবার দেখেছি টেনিস কোর্টে,' জাস্টিন বলল। ওর নীল চোখের দৃষ্টি দ্রুত নড়াচড়া করছে তিনজনের ওপর। 'সাদা, কড়া মাড় দিয়ে ইস্তিরি করা পুরানো ধাঁচের পোশাক পরে ছিল। হাতে কাঠের তৈরি একটা টেনিস র‍্যাকেট। আগের কালে যে জিনিস দিয়ে খেলত টেনিস প্লেয়াররা। খুব মন খারাপ করে রেখেছিল। ওর দিকে তাকিয়ে হাত নেড়েছিলাম আমি।'

'টেনিস খেলেছ নাকি ওর সঙ্গে?' হেসে জিজ্ঞেস করল মনিকা।

রসিকতায় কান দিল না জাস্টিন। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আমার দিকে ঘুরেই বুঝল আমি ওকে দেখছি। কয়েক সেকেন্ড বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর উধাও হয়ে গেল।' তুড়ি বাজাল সে। 'একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল যেন।'

চোখের পাতা সরু করে জাস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা, 'সত্যি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ। একটুও বানিয়ে বলিনি।'

'কিন্তু আমি যাকে দেখলাম সে তো বাস্তব! দুই হাতে বালি সরাল। হাত ধরে টেনে তুলল আমাকে। ওকে স্পর্শ করেছি আমি। ওর গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছি। স্বাভাবিক মানুষের মত শক্ত কাঁধ। বাতাস কিংবা ছায়া নয়।'

'ওর কোন কিছুই অস্বাভাবিক লাগেনি?'

'তা লেগেছে!' দ্বিধায় পড়ে গেল মনিকা। 'ওর গা খুব ঠাণ্ডা ছিল। কিন্তু...'

'দেখলে?' টেবিলে চাপড় মারল জাস্টিন। 'গা ঠাণ্ডা। মরা মানুষের গা ঠাণ্ডা থাকে, মনিকা। লাশ।'

'কিন্তু ও আমাকে বলেছে সাঁতার কেটে উঠে এসেছে। পানিতে বেশিক্ষণ থাকলে মানুষের শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

'হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি,' মাথা নাড়ল জাস্টিন। 'তোমাকে ভুল বুঝিয়েছে। সাঁতার কেটে ঠাণ্ডা হয়নি, হয়েছে মৃত বলে। একশো বছর আগে মারা গেছে ও।'

'তুমি জানলে কি করে?' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে নিকি। কপালে এসে পড়া এক গোছা চুল আঙুলে পেঁচিয়ে টানতে লাগল। 'ভূতটার সঙ্গে কথা

'না,' নিকির দিকে ফিরল জাস্টিন। 'জায়গাটা আমরা কেনার সময় জামর দালাল লোকটা বলেছিল এই গল্প। একশো বছর আগে গেস্ট হাউসে নাকি খুন হয়েছিল ছেলেটা। খুনী ধরা পড়েনি। তার পর থেকে এবাড়িতে এবং বাড়ির আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় ছেলেটার ভূত। একা একা হাঁটতে যায়, সাঁতার কাটে, বাগানে ঘুরে বেড়ায়।'

বরফ মেশানো চায়ে লম্বা চুমুক দিল সে। 'তিনবার দেখেছি আমি ওকে। শেষবার তো অনেক কাছে চলে এসেছিল। মনে হলো কিছু বলবে আমাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলল না। আমি ওকে 'হালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে গায়েব হয়ে গেল।'

'বাপরে!' মাথা নেড়ে বিড়বিড় করে কি বলতে লাগল নিকি।

'দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর ও,' জাস্টিন বলল। 'চেহারা আর পোশাক যদিও সবই পুরানো।'

'অদ্ভুত কথা শোনালে!' আস্তে করে বলল অ্যাঞ্জেলা। জোরে বলতে ভয় পাচ্ছে যেন।

'ওকে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে,' নিকি বলল। 'ভূত আছে একথা আমি বিশ্বাস করি। চিরকালই আমার দেখার শখ।'

'ওর গা-টা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ছিল!' চিন্তিত ভঙ্গিতে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল মনিকা, 'এত রোদের মধ্যেও কি করে এত ঠাণ্ডা হয়? লাশের গায়ের মত?' কেঁপে উঠল সে। 'কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না একটা ভূত এসে আজ বিকেলে আমাকে বাঁচিয়েছে!'

হো-হো করে হেসে উঠল জাস্টিন। 'তাহলে কোরো না।'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মনিকা। 'মানে?'

'মিথ্যে কথা বললাম,' হাসতে হাসতে বলল জাস্টিন। ওর নীল চোখে আলোর ঝিলিক।

'মানে?' চিৎকার করে উঠল মনিকা।

নাকের ওপর চশমাটা ঠেলে দিল অ্যাঞ্জেলা। স্তব্ধ হয়ে গেছে।

'সব বানিয়ে বলেছি,' বন্ধুদের ঠকাতে পেরে খুব মজা পাচ্ছে জাস্টিন। 'পুরোটাই বানানো গপ্পো। এখানে কোন ভূতুড়ে ছেলে নেই। কোনকালে ছিল না। গেস্ট হাউসে কখনও খুন হয়নি। টেনিস কোর্টে বিষণ্ণ চেহারার কোন ছেলের সঙ্গেও দেখা হয়নি আমার।'

'জাস্টিন!' চিৎকার করে উঠল মনিকা। রেগে গেছে। মারবে যেন।

হাসির দমকে ফুলে ফুলে উঠছে জাস্টিন।

'আমি সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছিলাম!' হতাশ কণ্ঠে বলল নিকি।

'আমিও,' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'ইস্, ভিডিও রেকর্ডারটা সঙ্গে রাখা উচিত ছিল!' হেসেই চলেছে জাস্টিন। 'তোমাদের চেহারাগুলো রেকর্ড করে রাখতে পারতাম।' মনিকার দিকে তাকাল সে। 'তুমি আমাকে আজ সত্যি অবাক করলে, মনিকা।

ক্যাম্পে তোমাকে কখনও ভয় দেখানো যেত না। যত দুনিয়ার ভূতপ্রেত আর ভয়ের গল্প বলে তুমিই আমাদের ভয় দেখাতে। তুমি কি করে আমার বানানো গপ্পো বিশ্বাস করে বসলে?'

গাল লাল হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছে মনিকা। চিলের মত চেঁচিয়ে উঠল, 'কিন্তু একটা ছেলে যে বাঁচিয়েছে আমাকে, সেটা তো মিথ্যে নয়! নামও বলল, অলিভার। আমাকে গেটের কাছে পৌছে দিয়ে স্রেফ গায়েব হয়ে গেল।'

'তাই নাকি! সত্যি!' বিশ্বাস করল না জাস্টিন। হাসতেই থাকল।

ভ্রূকুটি করল মনিকা। কে এই অলিভার?

★

সেদিন রাতে। দোতলার বেডরুমে শুয়ে আছে মনিকা। ঘুম আসছে না। খানিকক্ষণ গড়াগড়ি করে উঠে গিয়ে বড় জানালার সাদা পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে একটানা।

পেছনের লনে তির্যক ভঙ্গিতে হলদে আলো ফেলছে সার্চলাইট। টেনিস কোর্ট আর সুইমিং পুলের চারপাশে এত আলো, প্রায় দিনের আলোর মতই স্পষ্ট করে তুলেছে।

ডিনারের পর ভিসিআরে একটা ছবি দেখেছে ওরা। পুরানো আমলের গল্প নিয়ে হাসির ছবি। নাকের ওপর চশমা ঠেলে দিয়ে নাকমুখ কুঁচকে অ্যাঞ্জেলা মন্তব্য করেছে, 'দাদার আমলের ওই মেয়েগুলো গবেট ছিল একেকটা। ছেলেদের খুশি করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই যেন জানত না।'

'হ্যাঁ,' আনমনে জবাব দিয়েছে মনিকা, 'এখনকার মেয়েদের চেয়ে অন্য রকমই।'

সিনেমা দেখা শেষ করে 'গুডনাইট' জানিয়ে ওপরে চলে এসেছে ওরা, যার যার ঘরে। ঘুম ঘুম লাগছিল মনিকার। রোদে পোড়া চামড়ার জ্বালা কমানোর জন্যে ঘরে এসেই গরম পানিতে গোসল করেছে আরেকবার। বিছানায় আরাম করে শোয়ার জন্যে লম্বা একটা নাইটশার্ট গায়ে দিয়ে আরেক খাবলা ক্রীম মেখেছে মুখে।

হাই তুলতে তুলতে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার কাছে। কাঁচের দরজায় হেলান দিয়ে তাকিয়েছে পেছনের আঙিনার দিকে। ঘুমানোর আগে শেষবারের মত তাকানোর কৌতূহল দমাতে পারেনি। এত সুন্দর, বিলাসবহুল ঘরে আর রাত কাটায়নি সে। আলো, সাজানো বাগান, পাহাড়ের নিচ থেকে ভেসে আসা সাগরের ঢেউয়ের মৃদু শব্দ রাতের পরিবেশকে যেন পরীর রাজ্যে রূপান্তরিত করেছে।

গেস্ট হাউজের জানালার দিকে চোখ পড়তে আটকে গেল দৃষ্টি। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে।

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, গালে হাত ঠেকিয়ে, চোখ সরু করে, তীক্ষ্ণ করল দৃষ্টি। ভালমত তাকাল।

হ্যাঁ।

একটা ছায়া নড়ছে গেস্ট হাউজের জানালায়।
একটা ম্লান আলো জ্বলছে।
কেউ আছে ওখানে। আরও ভালমত দেখার জন্যে কাঁচের গায়ে নাক ঠেসে ধরল।
জানালার কাঁচে এসে পড়া ছায়া দেখে ছায়ার মালিককে চেনার চেষ্টা করল।
অলিভার?
ভূত?
কঠিন একটা হাত কাঁধ চেপে ধরল মনিকার।

ছয়

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সে। চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল। ভূতের দিকে তাকিয়ে আরেকবার চেঁচিয়ে ওঠার জন্যে ফাঁক হয়ে গেল ঠোঁট।
কিন্তু বেরোল না চিৎকারটা।
'সরি, মনিকা,' কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিচু স্বরে বলল জাস্টিন, 'তুমি এতটা ভয় পেয়ে যাবে ভাবিনি।'
'জাস্টিন! আ-মি···আমি···' জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে মনিকার। এখনও যেন কাঁধে জাস্টিনের হাতের স্পর্শ লেগে রয়েছে।
'এত মনোযোগ দিয়ে কি দেখছিলে?' জানতে চাইল জাস্টিন।
সরে এসে পর্দাটা টেনে দিল মনিকা। 'গেস্ট হাউজের জানালায় কার যেন ছায়া দেখলাম।'
'তাই?' অবাক হলো জাস্টিন। দরজার কাছে এসে আবার সরাল পর্দাটা।
'শুধু ছায়া না,' মনিকা বলল, 'আলোও দেখেছি।'
'তা কি করে হয়?' মাথা নাড়তে লাগল জাস্টিন। 'গেস্ট হাউজে কেউ থাকে না। হিউগি ছাড়া বাড়িতে অন্য কোন লোকও নেই যে থাকতে যাবে।'
'কিন্তু আমি দেখেছি···'
'সার্চলাইটের আলোর প্রতিফলন দেখে থাকবে হয়তো,' দরজার কাছ থেকে সরে এল জাস্টিন। 'আলো অতিরিক্ত উজ্জ্বল। এত আলো দেখলে চোর-ডাকাত ঢুকতে সাহস করবে না ভেবে লাগিয়েছে বাবা। কিন্তু বাড়াবাড়ি রকমের বেশি। আমার ভাল লাগে না।' মনিকার দিকে সরাসরি তাকাল সে। 'জানালায় প্রতিফলনই দেখেছ, অন্য কিছু না।'
'হবে হয়তো,' অনিশ্চিত শোনাল মনিকার কণ্ঠ।
'তোমার কিছু লাগবে কিনা দেখতে এসেছিলাম।'
'না, লাগবে না,' হাই তুলল মনিকা। 'রোদ আমার বারোটা বাজিয়ে

দিয়েছে আজকে।'

'হুঁ, আসলেই খুব কড়া ছিল। অনেক পুড়েছে।'

জাস্টিনের বলার ভঙ্গিটা ভাল লাগল না মনিকার। কেমন যেন! ওর দুর্গতিতে মায়া হচ্ছে মনে তো হলোই না, বরং যেন খুশি হয়েছে।

দূর! কি যা-তা ভাবছি! শরীর, মগজ অতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে গেছে আমার। সেজন্যেই যতসব উল্টোপাল্টা দেখা, আজেবাজে ভাবনা···ঘুমালেই ঠিক হয়ে যাবে।

জাস্টিনকে গুডনাইট জানিয়ে আলো নিভিয়ে দিল সে। মখমলের চাদরে ঢাকা নরম বিছানায় উঠে এল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে হারিয়ে গেল ঘুমের অতলে। কিন্তু এর মধ্যেও অবচেতন মনে আটকে রইল অলিভারের চেহারাটা। ঘুমের মধ্যেও এসে দেখা দিল সে।

★

এক ঘুমে পার করে দিল রাতটা। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলে শরীর টানটান করে পড়ে রইল নরম বিছানায়।

পর্দার ফাঁক দিয়ে ঘরে এসে পড়ছে সকালের রোদ। একটা দরজা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। সেটা দিয়ে ঢুকছে সাগরের নোনা গন্ধ। কানে আসছে সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ।

গায়ের চাদর সরিয়ে উঠে বসল মনিকা। বিলাসবহুল ঘর। দামী দামী আসবাব আর জিনিসপত্রে ঠাসা।

বিছানার ঠিক উল্টো দিকে বসানো চেরিকাঠের একটা আয়না লাগানো ড্রেসার। তাতে রাখা নানা ধরনের পারফিউমের শিশি। পাশে মানানসই চেস্ট অভ ড্রয়ারস। দেয়াল ঘেঁষে বসানো একটা ছোট লেখার টেবিল। লেখার জন্যে প্রয়োজনীয় কাগজ, কলম আর অন্যান্য জিনিস সাজানো রয়েছে টেবিলের ওপর। এককোণে সুন্দর ফুলদানীতে রাখা একগোছা তাজা ফুল।

টেবিলের পাশে বাথরুমের দরজা। ওর মতে সবচেয়ে সুন্দর হলো বাথরুমটা। গত রাতে বিরাট বাথটাবে পানিতে গা ডুবিয়ে বসে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখেছে। পুরো ছাত জুড়ে সাগরকন্যার ছবি আঁকা।

ভাবছে মনিকা, এ রকম বাড়িতে সব সময় প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে, দামী দামী জিনিস ব্যবহার করতে কেমন লাগে জাস্টিনের? কখনও কি খেয়াল করেছে এই বাড়ি, বাড়ির ঘর আর জিনিসপত্রগুলো কতটা সুন্দর?

বড়লোকেরা বোধহয় করে না—নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিল মনিকা।

জাস্টিনের বান্ধবী হলেও ওদের পরিবার সম্পর্কে খুব একটা জানে না সে। জাস্টিনের বাবা অরিগন ফিলিপ একজন বিরাট ব্যবসায়ী। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর বড় বড় শহরে তাঁর ব্যবসা ছড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে ফোনে জাস্টিনের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। কখনও ভিয়েনা, কখনও স্টকহোম, কখনও বার্সেলোনা থেকে।

মিসেস ফিলিপও পারতপক্ষে বাড়িতে থাকতে চান না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়ান।

এত বড় বাড়িতে একা থাকতে নিশ্চয় ভাল লাগে না জাস্টিনের। হিউগি লোকটা ভাল, কিন্তু জাস্টিনের সঙ্গী হওয়ার উপযুক্ত নয় কোন দিক দিয়েই।

বিছানা থেকে নেমে এসে ড্রেসারের সামনে বসল মনিকা। আয়নায় গালের পোড়া দাগগুলো দেখতে লাগল। এখনও লাল হয়ে আছে চামড়া। ভুরু উঁচু করলে, নাক কুঁচকালে, এমনকি হাসতে গেলেও চামড়ায় টান পড়ে ব্যথা লাগে।

নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল, ওর নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে রোদের মধ্যে সৈকতে শুতে যাবে কেন? কেনই বা বলবে বালি দিয়ে ওর শরীর ঢেকে দিতে? সবচেয়ে আর্শ্চযের ব্যাপার, এত রোদের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়াটা। নিশ্চয় অ্যান্টিহিস্টামিনের প্রতিক্রিয়া। এ ছাড়া এই অদ্ভুত কাণ্ড করার আর কোন যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছে না সে।

আবার খানিকটা অ্যালো জেল মুখে মাখল মনিকা। দ্রুত কাপড় পরে নিল—হলুদ টি-শার্ট, কালো স্প্যানডেক্স শর্টস। সাদা স্নীকার পায়ে দিয়ে নিকি আর অ্যাঞ্জেলার ঘরের পাশ কাটিয়ে এসে নিচতলার সিঁড়ির দিকে এগোল। ওদের দুজনের দরজা এখনও বন্ধ।

ঘড়ি দেখল সে। ন'টা বাজে। রাতে তো সকাল সকালই শুতে গিয়েছিল সবাই। এত বেলা করে ঘুমাচ্ছে কেন? ঘরে রোদ ঢুকছে, তারপরেও শুয়েই আছে! নিশ্চয় এত আরামের বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

নিচে নেমে জাস্টিনকে পেল রান্নাঘরে। সাদা শর্টস আর হালকা গোলাপী টপ পরেছে ও। মনিকাকে দেখে বলল, 'নাস্তার জন্যে ফ্রুট সালাদ, বিস্কুট আর সসেজ বানিয়েছে হিউগি।' কাউন্টারে রাখা সাদা চীনামাটির বোল আর প্লেটগুলো দেখাল, 'ওই যে। নিয়ে নাও।'

'নিকি আর অ্যাঞ্জেলা এখনও ঘুমাচ্ছে,' মনিকা বলল।

'ক্যাম্পেও তো এইই করত,' জাস্টিন বলল, 'দুপুরের আগে উঠতেই চাইত না নিকি।'

'আর নিকি যা করে, অ্যাঞ্জেলাও সেটাই করতে চায়,' হাসল মনিকা। 'ঘুমাকগে। নাস্তা খেয়ে গিয়ে আমরা বরং একটু টেনিস খেলি, কি বলো?' বোল থেকে একটা প্লেটে চামচ দিয়ে ফ্রুট সালাদ তুলতে লাগল। টেনিস সে ভাল খেলে। রেড হিল ক্যাম্পে, মনে আছে, একমাত্র জাস্টিনই তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারত। এখন নিশ্চয় আরও ভাল খেলে জাস্টিন। শুনেছে ক্যাম্প থেকে আসার পর খেলা শেখানোর জন্যে একজন কোচ রেখে দিয়েছেন ওর বাবা।

'ঠিক আছে, খেলব,' ভঙ্গিতেই বোঝা গেল, তেমন ইচ্ছে নেই জাস্টিনের। 'তবে এক গেম। এই রোদের মধ্যে বাইরে থাকাটা তোমার উচিত হবে না। চামড়ার আরও ক্ষতি হবে।'

'সাবধানে থাকব, কিছু হবে না।'

★

মোটেও জমল না টেনিস খেলা। একটা মারও ঠিকভাবে মারতে পারল না জাস্টিন। ক্যাম্পে তো এ রকম ছিল না! অন্যমনস্ক হয়ে আছে নাকি?

'চোখে রোদ লাগছে,' নাকমুখ কুঁচকে বলল জাস্টিন।

সাইড বদল করল ওরা।

তাতেও জাস্টিনের খেলার কোন পরিবর্তন হলো না। আগের বারের মতই উল্টোপাল্টা মারতে লাগল। এদিক মারলে ওদিক চলে যায়, ওদিক মারলে সেদিক। নতুন র‍্যাকেট হাতে নিলে যা হয়, একেবারে আনাড়ি খেলোয়ারের মত। কোচ রেখে আরও অধঃপতন ঘটল নাকি তার?

'কি যে হলো কে জানে। হাত অচল হয়ে আছে। নড়তেই চাইছে না।' রাগ করে র‍্যাকেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল জাস্টিন, 'দূর, খেলবই না!'

'খেলতে থাকো। ঠিক হয়ে যাবে। কিংবা খানিকক্ষণ জগিং করে নাও। হাত-পায়ের আড়ষ্টতা কাটুক।'

মুখ বাঁকাল জাস্টিন। মাথা নাড়ল, 'হবে না।' মনিকার দিকে তাকাচ্ছে না। 'অনেক দিন প্র্যাকটিস নেই,' বিড়বিড় করে বলল। 'এ বছর খেলার সময়ই পাইনি।'

পাশে এসে দাঁড়াল মনিকা। আলতো করে হাত রাখল কাঁধে। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি হয়েছে, বলো তো?'

মুখ তুলে তাকাল জাস্টিন। নীল চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। 'কি আবার হবে?'

'মন খারাপ হয়েছে।'

'তাই বা হবে কেন?'

'আমাদের দেখে নিশ্চয় গত বছরের দুর্ঘটনাটার কথা মনে পড়ে গেছে তোমার। বোনের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে...'

লাল হয়ে উঠল জাস্টিনের গাল। একটানে চুলের ব্যান্ড খুলে এনে ঝাঁকি মেরে ছড়িয়ে দিল সোনালি চুলগুলো। মনিকার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মুখ নিচু করে বলল, 'প্লীজ, শারমিনের কথা তুলো না! আমার ভাল লাগে না!'

'আচ্ছা আচ্ছা, বলব না। তোমার মনের অবস্থা বুঝতে পারছি, জাস্টিন,' সহানুভূতির সুরে মনিকা বলল। 'শারমিনের কথা ভাবলে আমাদেরই বুকের মধ্যে টনটন করে ওঠে...'

'মিথ্যে কথা!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল জাস্টিনের কণ্ঠ।

চমকে গেল মনিকা। বোকা হয়ে তাকিয়ে রইল জাস্টিনের দিকে। ওর মেজাজের এই হঠাৎ পরিবর্তনের কোন কারণ বুঝতে পারল না।

'সরি!' স্বর নরম করল জাস্টিন। 'দয়া করে আর কখনও শারমিনের ব্যাপারে আলোচনা কোরো না।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গটমট করে বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করল সে।

★

বাড়িতে ফিরে জাস্টিনকে শান্ত হতে দেখে স্বস্তি বোধ করল মনিকা। আঙিনায়

একটা সাদা ছাতার নিচে গিয়ে বসেছে নিকি আর অ্যাঞ্জেলার সঙ্গে। কথা বলতে বলতে নাস্তা খাচ্ছে অন্য দুজন। পেছনে, গেস্ট হাউসের কাছে রডোডেনড্রনের ডাল ছাঁটতে ছাঁটতে আপনমনে গুনগুন করে গান গাইছে হিউগি।

ছাতার নিচে একটা ক্যানভাস চেয়ার টেনে এনে বসল মনিকা।

'কেমন খেললে টেনিস?' জিজ্ঞেস করল নিকি।

'ও আমাকে জিতিয়ে দিল,' রসিকতার ঢঙে জাস্টিনকে দেখিয়ে বলল মনিকা। 'ভুলভাল মেরে আমাকে অসতর্ক করে পরে জবাই করতে চেয়েছিল। আমিও সুযোগ দিইনি।'

জোর করে হাসল জাস্টিন। 'আমার প্র্যাকটিস নেই। তা ছাড়া তোমারও যে খেলার অনেক উন্নতি হয়েছে সেটা বলছ না কেন?' টেবিলে রাখা একটা কাঁচের কুঁজো থেকে এক গ্লাস কমলার রস ঢেলে নিল সে।

মেঘমুক্ত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে নিকি বলল, 'কি পরিষ্কার। সৈকতে গিয়ে বসার দিন আজ।'

'আমার তো এখানে একটা মুহূর্তও মন টিকছে না!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল অ্যাঞ্জেলা।

'সঙ্গে করে লাঞ্চ প্যাকেট নিয়ে যেতে পারি,' জাস্টিন বলল। 'হিউগিকে বললেই বানিয়ে দেবে। সৈকতে বসেই খাব।'

'ঢেউ কেমন আছে কে জানে,' নিকি বলল। 'তোমার একটা বুগি বোর্ড নিয়ে চেষ্টা করে দেখতাম।'

'ঢেউ এখন সব সময়ই বেশি থাকে। ওগুলোকে ঠেকাতে কিংবা ভেঙে দেয়ার জন্যে বালির চড়া নেই কোথাও।' লম্বা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা প্রায় অর্ধেক খালি করে ফেলে মনিকার দিকে তাকাল জাস্টিন। 'তুমি তো নিশ্চয় যাবে না? যাওয়া উচিতও না। রোদ লাগলে পোড়া চামড়ার ক্ষতি হবে।'

একটু দ্বিধা করে জবাব দিল মনিকা। 'না, যাব। একা একা ঘরে থাকতে ভাল লাগবে না। সৈকতে ছাতার নিচে বসে থাকব, তাহলেই রোদ লাগবে না আর।'

'তা ঠিক। বেশ, চলো যাই।' হিউগিতে ডাক দিল জাস্টিন। ছাতা আর খাবার সাজিয়ে দিতে বলল।

ছাতার সঙ্গে একটা বড় স্টাইরোফোম কুলারও নিয়ে এল হিউগি। তাতে খাবার ভরে দিয়েছে। মেয়েদের লাঞ্চ। একটা ছোট ব্যাগে ভরে দিয়েছে তোয়ালে, চাদর এসব।

ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে কুলারের এক হাতল ধরে নিকিকে বলল জাস্টিন, 'ওপাশটা ধরো তো। একা নিতে পারব না। মনিকা, তুমি ছাতাটা নাও।'

হাত বাড়াল অ্যাঞ্জেলা, 'আমি খালি খালি যাব? ব্যাগটা আমাকে দাও।'

দিল না জাস্টিন। 'না, আমিই পারব। তোমার হাত খালিই থাকুক। গেট খুলতে হবে।'

লন পেরিয়ে পেছনের গেটের দিকে এগোল চারজনে। যেখান থেকে

কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে সৈকতে। মনিকার কাঁধে একটা লাল-সাদা ডোরাকাটা ছাতা। জাস্টিন আর অ্যাঞ্জেলা কুলার বয়ে নিয়ে এগোচ্ছে ওর পেছনে। আগে আগে হাঁটছে অ্যাঞ্জেলা।

চূড়ার কিনার থেকে সাগরের গর্জন বেশি শোনা যায়। কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে তাকিয়ে সী-গালের ওড়া দেখতে লাগল মনিকা। নীল আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেছে পাখিগুলো।

এগারোটাও বাজেনি। ইতিমধ্যেই ভীষণ গরম হয়ে গেছে রোদ। বাতাসে আর্দ্রতা খুব বেশি।

ভারী ছাতাটা কাঁধ বদল করল সে। ভাবল, একেবারে চুপ করে বসে না থেকে সামান্য সাঁতার কেটে এলে মন্দ হয় না। মুখে ভাল করে সানস্ক্রীন মাখিয়ে নিলেই হবে, পোড়া চামড়ার আর কোন ক্ষতি হবে না তাহলে।

ধাতব গেটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অ্যাঞ্জেলা।

পেছন থেকে জাস্টিন বলল, 'হাতল ধরে মোচড় দাও, খুলে যাবে। ভেতর থেকে খুলতে কোডের দরকার হয় না।'

ছাতাটা কাঁধে ফেলে তাকিয়ে আছে মনিকা। অ্যাঞ্জেলাকে ডিম্বাকৃতির হাতলে হাত দিতে দেখল। চড়চড় করে শব্দ হলো একটা। স্থির হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলা। পরক্ষণে ঝটকা দিয়ে পেছনে বেঁকে গেল ওর শরীরটা। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে উল্টে পড়ল মাটিতে।

সাত

কুলারটা হাত থেকে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে গেল জাস্টিন। ছোট একটা ঝোপের কাছে প্রায় ডাইভ দিয়ে পড়ল। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে টান মেরে নামিয়ে দিল একটা হাতল।

ছাতাটা কাঁধ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল মনিকা। মাটিতে পড়ে থাকা বান্ধবীর পাশে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে বসল।

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাঞ্জেলা। চশমা খুলে ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

কুড়িয়ে নিল মনিকা। ডাকল, 'অ্যাঞ্জেলা! অ্যাঞ্জেলা! তুমি ঠিক আছ?'

বার দুই চোখ মিটমিট করল অ্যাঞ্জেলা। সাদা হয়ে যাওয়া মুখে রক্ত ফিরতে আরম্ভ করেছে।

মনিকার পাশে বসে অ্যাঞ্জেলার মুখের ওপর ঝুঁকল জাস্টিন। উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইল, 'খুব শক লেগেছে?'

ধীরে ধীরে উঠে বসল অ্যাঞ্জেলা। 'বাপরে বাপ! সারা শরীরে মনে হচ্ছিল ঝড় বয়ে যাচ্ছে। ভয়ানক ঝাঁকি। বোঝাতে পারব না।'

তাকে বসতে সাহায্য করল জাস্টিন। হিউগির নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকতে

শুরু করল।

নিশ্চয় বাড়ির ভেতর চলে গেছে ও। বাগানে দেখা যাচ্ছে না। জাস্টিনের চিৎকার শুনতে পেল না।

'কিছু বুঝতে পারছি না,' মনিকার দিকে তাকিয়ে বলল জাস্টিন, 'মাথায় ঢুকছে না কিছু! দিনের বেলা তো সুইচ অফ থাকে। বিদ্যুৎ থাকে না বেড়া কিংবা গেটে।'

গুঙিয়ে উঠে ঘাড় ডলতে শুরু করল অ্যাঞ্জেলা। 'উফ্, ব্যথা করছে এখানটায়। পেশীগুলো মনে হচ্ছে জোড়া লেগে গেছে।'

'খুব খারাপ লাগছে?' জানতে চাইল নিকি। 'মাথা ঝিমঝিমানি, বা ওরকম কিছু?'

'খারাপ কিছুটা লাগছে,' ঘাড় ডলতে ডলতে জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। 'এখানে খুব ব্যথা করছে।'

'বেঁচেছ যে এই বেশি!'

'থাক থাক, আর মনে করিয়ে দিয়ো না,' হাত নেড়ে বলল জাস্টিন। 'এমনিতেই কষ্ট পাচ্ছে...'

'সরি!' মাথা নাড়ল নিকি।

'লাগছে কেমন এখন?' মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করল মনিকা।

'শরীরের চেয়ে বেশি কাহিল হয়েছে চুল,' পরিস্থিতি হালকা করার জন্যে বলল অ্যাঞ্জেলা। 'এমনিতেই খাড়া খাড়া। আরও খাড়া করে দিয়েছে।'

হেসে উঠল নিকি আর মনিকা।

জাস্টিন হাসল না। উঠে দাঁড়াল। পায়চারি শুরু করল ওদের সামনে। মুঠো পাকিয়ে রেখেছে দুহাতের আঙুল। বিড়বিড় করে বলতে লাগল, 'আমি কিছু বুঝতে পারছি না। দিনের বেলা বন্ধ থাকার কথা। অটোমেটিক সিসটেম। রাতে আপনাআপনি অন হয়, দিনে অফ হয়ে যায়।'

'টাইমার নষ্ট হয়ে গেছে বোধহয়,' মনিকা বলল। উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল অ্যাঞ্জেলাকে। ওর হাত থেকে কাঁপা হাতে চশমাটা নিয়ে পরল অ্যাঞ্জেলা।

'ও মারাও যেতে পারত!' একটু আগে এধরনের কথা বলতে গিয়ে জাস্টিনের ধমক খেয়েছিল ভুলে গেছে নিকি।

কড়া চোখে এবারও ওর দিকে তাকাল জাস্টিন। তবে ধমক দিল না আর। অ্যাঞ্জেলার দিকে ফিরে বলল, 'সরি। আমাদের বাড়িতে এসে...সত্যি দুঃখিত আমি। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকবে?'

'নাহ্,' মাথা নাড়ল অ্যাঞ্জেলা। 'শুয়ে থাকা লাগবে না। হার্টটা সামান্য জোরে চলছে বটে। এ ছাড়া আর কোন অসুবিধে নেই। চলো যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই যাই। এত সুন্দর একটা দিন নষ্ট করতে চাই না।'

'কিন্তু বিদ্যুতের শক...' বলতে গেল নিকি।

'ওটা আমাকে বরং জাগিয়ে দিয়েছে,' হেসে বলল অ্যাঞ্জেলা। 'ঘুমের জড়তা দূর করেছে। মাত্র একটা হপ্তার জন্যে এসেছি আমরা। ঘরে বসে নষ্ট

করার কোন মানেহ হয় না।'

'বেশ, তোমার যদি অসুবিধে না হয়...' অ্যাঞ্জেলার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে জাস্টিন।

'না, হচ্ছে না। তোমরা যখন এতই দুশ্চিন্তা করছ, সৈকতে গিয়ে মনিকার সঙ্গে আমিও নাহয় চুপচাপ ছাতার তলায় বসে থাকব। বললাম তো, মাথার মধ্যে সামান্য ঝিমঝিমানি ছাড়া আর কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমার।'

'বেশ,' অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাজি হলো জাস্টিন, 'চলো। তবে খারাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গে বলবে।'

মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা।

ভারি কুলারটা একলাই তুলে নিল নিকি।

'এখানে যেন খাবার তৈরি হতে এসেছি আমরা,' হেসে রসিকতা করল মনিকা। 'আমি প্রথমে রোদের মধ্যে কাবাব হলাম। এখন অ্যাঞ্জেলা গেটে হাত দিয়ে ফ্রাই হলো।'

কথাটা হালকাভাবেই বলেছে মনিকা, কিন্তু গম্ভীর হয়ে গেল জাস্টিন। 'দেখো, দুটো ব্যাপারই ব্রেফ অ্যাক্সিডেন্ট। অন্য কিছু ভাবার কোন কারণ নেই।'

'অন্য কথা ভাবব কেন?'

'না, যদি আবার ভেবে বসো! আমাদের বাড়ি বেড়াতে এসে একের পর এক দুর্ঘটনা...' হিউগির নাম ধরে আবার চিৎকার করে ডাকতে শুরু করল মনিকা।

এবারও সাড়া দিল না হিউগি। কোথাও কাজ করছে হয়তো। শুনতে পায়নি।

রাগ করে জাস্টিন বলল, 'দাঁড়াও, সৈকত থেকে এসে নিই। ধরব আমি ওকে। এসব কেন ঘটছে জিজ্ঞেস করব।'

★

ধীরে ধীরে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল ওরা। এখন আগে রয়েছে জাস্টিন। ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে যদি কোন অঘটন ঘটে তার বেলায়ই ঘটুক। মেহমানদের কিছু না হোক।

অনেক নিচে রোদে ঝলমল করছে সাগর। মাথায় সাদা ফেনার মুকুট নিয়ে বালির সৈকতে আছড়ে পড়ছে নীলচে-সবুজ ঢেউ।

পাহাড়ের গোড়ায় বাতাস অনেক ঠাণ্ডা। কিন্তু রোদ লেগে কাঁধের চামড়া ঠিকই জ্বলছে মনিকার।

সে নামল সবার শেষে। ততক্ষণে বালিতে চাদর বিছিয়ে ফেলেছে জাস্টিন।

একধারে কুলারটা নামিয়ে রাখল নিকি। ব্যাগ থেকে খুলে একটা তোয়ালে বিছাল। গায়ের টপ টেনে খুলে রাখল তার ওপর। নিচে সবুজ রঙের বিকিনি পরেছে। চিরুনি বের করে লম্বা, কালো চুল আঁচড়াতে শুরু করল।

এই একটা ব্যাপারে এক বছরে কোন পরিবর্তন হয়নি নিকির, ভাবছে

মনিকা। রেড হিল ক্যাম্পে যেমন দেখেছিল তেমনই আছে। সুযোগ পেলেই চুল আঁচড়ানো।

সিঁড়ির কাছ থেকে বেশ কিছুটা দূরে চাদর বিছিয়েছে জাস্টিন। অ্যাঞ্জেলাকে পাশে নিয়ে হেঁটে সেদিকে এগোচ্ছে মনিকা। বালি এতটাই গরম, স্যান্ডেলের পাতলা সোল ভেদ করে এসে তাপ লাগছে পায়ে।

বাপরে বাপ, কি গরম! আকাশের দিকে তাকাল সে। পুরো আকাশ জুড়ে বসে আছে যেন সূর্যটা।

ছাতাটা বালিতে গেঁথে দিল মনিকা। নিচে বসল সে আর অ্যাঞ্জেলা। হাতব্যাগ খুলে সানস্ক্রীনের কৌটা বের করল। পুরু করে গোলাপী মলম ঘষে দিতে লাগল মুখে।

'ওহ্, দারুণ লাগছে তোমাকে, ডার্লিং!' হেসে বলল নিকি।

'চুপ করো!' হাসতে হাসতে ধমক লাগাল মনিকা। লাল রঙের ওয়ান-পীস সুইম-স্যুটের স্ট্র্যাপ আটকে দিয়ে শরীরের বাকি খোলা অংশেও সানস্ক্রীন মাখতে শুরু করল।

চিরুনি ব্যাগে ভরে একটা শিশি বের করল নিকি। চামড়ায় হালকা করে ট্যানিং অয়েল মাখতে লাগল।

জাস্টিনের দিকে তাকাল মনিকা। হাত দিয়ে ডলে চাদর সমান করছে সে। পিঠের ওপরের অংশটা পুরো বেরিয়ে আছে। পরিষ্কার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে চামড়ার রঙ। এই প্রথম ওর চামড়ার রঙটা লক্ষ করল মনিকা।

ফ্যাকাসে!

জাস্টিন বলেছে এখানে এলে বেশির ভাগ সময়ই ঘরের বাইরে অর্থাৎ এই সৈকতে কাটায় সে। ওরা আসার অনেক আগেই এসেছে এখানে সে। এতদিনে তো রোদে পুড়ে চামড়া বাদামী হয়ে যাওয়ার কথা। মড়ার চামড়ার মত এরকম ফ্যাকাসে কেন? রোদকে ফাঁকি দিল কিভাবে?

'দেখো দেখো, কারা আসছে!' বলে উঠল নিকি।

ফিরে তাকাল মনিকা।

একহাত কপালে তুলে পানির দিকে তাকিয়ে আছে নিকি।

পাহাড়ের বাঁকের ওপাশ থেকে এসেছে তিনটে ছেলে। পরনে নীল রঙের হাতাবিহীন সুইম-স্যুট। বগলের নিচে লাল-কালো ডোরাকাটা সার্ফবোর্ড।

একটা ছেলেকে চিনতে পেরে চিৎকার করতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল মনিকা।

অলিভার!

আট

বালিতে উঠে এল ছেলে তিনটে। ভেজা স্যুট থেকে টপটপ করে পানি ঝরছে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মনিকা। ও কি আসলেই অলিভার? সেই কালো কোঁকড়া চুল। একই রকম লম্বা। সবচেয়ে বড় কথা, চেহারাটা অবিকল এক।

মাথা গরম হয়ে যাওয়ার জোগাড় হলো মনিকার। দিনের বেলা রোদের মধ্যেও ভূত বেরোয়, জানত না।

অন্য দুটো ছেলের একজন নিগ্রো। অলিভারের চেয়ে লম্বা। কুস্তিগীরের মত পেটা স্বাস্থ্য। তারের মত চুল যেন জট পাকিয়ে খুলি কামড়ে ধরে রেখেছে। তৃতীয় ছেলেটা তিনজনের মধ্যে খাটো, স্বাস্থ্যও অতটা ভাল নয়। লালচে-বাদামী চুল। গোলগাল মুখ।

ফিসফিস করে জাস্টিন বলল, 'ওদের এখান থেকে তাড়াতে হবে।'

'কি করে? যদি বসতে চায়?'

'খারাপ ব্যবহার করব।'

'সেটা কি উচিত হবে?'

জবাব দিল না জাস্টিন।

এদিকেই আসছে ছেলেগুলো। মেয়েদের কাছ থেকে খানিকটা দূরে থাকতে নিগ্রো ছেলেটা বলল, 'বললাম না, বার্ড স্যাংচুউরি থেকে অনেক সরে এসেছি আমরা।'

কাছে এসে জাস্টিনকে জিজ্ঞেস করল, 'পাখিগুলো কোন দিকে বলতে পারো?'

'পারি,' মুখ গোমড়া করে জবাব দিল জাস্টিন। 'আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে বোকা ডোডো।'

ওর আচরণে অবাক হলো মনিকা। রেড হিলে এতটা অভদ্র তো ছিল না ও!

নিকি ছেলেগুলোর দিকে একবার তাকিয়ে আবার চুল আঁচড়াতে শুরু করল। ছাতার নিচে আগের মতই বসে আছে অ্যাঞ্জেলা। তবে আগন্তুকদের দেখে খুশি হয়েছে মনে হলো।

জাস্টিনের জবাবে হাসি মিলিয়ে গেল নিগ্রো ছেলেটার। অপ্রস্তুত হয়েছে। তার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে এল বাদামী-চুল ছেলেটা। হাসিমুখে বলল, 'সার্ফিং করতে করতে ঢেউয়ে অনেক সরে গেছি। সাংঘাতিক স্রোত। একেবারে তীর ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে। টান মেরে যে কোথায় নিয়ে চলে গেল, প্রথমে বুঝতেই পারলাম না।'

'আহাহা,' কর্কশ কণ্ঠে বলল জাস্টিন, 'শুনে একেবারে বর্তে গেলাম!'

ওর দুর্ব্যবহার দেখে চুল আঁচড়ানো থামিয়ে দিল নিকি। ফিসফিস করে বলল, 'জাস্টিন, একটু ভালমত বলো না!'

কিন্তু জাস্টিনের ব্যবহারে যেন কিছুই মনে করল না বাদামী-চুল ছেলেটা। 'এখানে সাঁতরাতে নামলে সাবধানে থেকো। কখন যে স্রোতের মধ্যে পড়ে যাবে বুঝতেও পারবে না। যখন পারবে, বেরিয়ে আসার আর উপায় থাকবে না।'

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল জাস্টিন। শীতল কণ্ঠে বলল, 'সাবধান করার

জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এটা আমাদের প্রাইভেট বীচ। এখানে ঢুকেছ কেন?' কি ভেবে হাত তুলল দূরের দিকে, 'স্যাংটিউরিটা ওদিকে। পাবলিকের জায়গা। তোমাদের মত সাধারণ মানুষেরা ওদিকে সাঁতার কাটতে নামে।'

হেসে ফেলল ছেলেটা। 'আমি তো জানতাম সব সৈকতই পাবলিকের।' পাহাড় থেকে নেমে আসা সিঁড়িটা দেখিয়ে বলল, 'বুঝতে পারছি তুমি ওই বাড়ির মেয়ে। সাগরটাও কিনে নিয়েছ নাকি তোমরা?'

নিগ্রো ছেলেটার মুখ দেখে মনে হলো ঝগড়ার ভয় পাচ্ছে। বন্ধুর হাত ধরে টান দিল, 'থাক, বাদ দাও। চলো, যাইগে।'

কোঁকড়া-চুল ছেলেটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কোন ভাবান্তর নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করছে মেয়েদেরকে।

হাত ছাড়িয়ে নিল বাদামী-চুল ছেলেটা। অ্যাঞ্জেলার পাশে বসে পড়ে বলল, 'তুমি কি সব সময়ই এরকম চুপচাপ থাকো নাকি?'

হাসল অ্যাঞ্জেলা। চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে তুলে দিল। 'না না। আজকে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো…'

ওর কথাটা মুখ থেকে পড়তে দিল না কোঁকড়া-চুল ছেলেটা। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, 'অ্যাক্সিডেন্ট?'

'হ্যাঁ, গেটে কারেন্ট ছিল। হাত দিয়ে ফেলেছিলাম…'

অ্যাঞ্জেলাকে কথা শেষ করতে দিল না জাস্টিন। বাদামী-চুল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'বসলে কেন আবার? যাবে, না-কি?'

'সেটা নির্ভর করে তোমাদের কাছে কি খাবার আছে তার ওপর,' কুলারটা দেখাল ছেলেটা। নিগ্রো বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মুসা, ওটা আনো তো এদিকে। কি আছে, দেখি।'

কোঁকড়া-চুল ছেলেটার দিকে তাকাল মুসা। দ্বিধা করতে লাগল। মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি দিল তার বন্ধু।

'পরিচয়টা দিয়েই নিই,' বলল বাদামী-চুল ছেলেটা। অ্যাঞ্জেলার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল, 'আমি রবিন মিলফোর্ড।…ও মুসা আমান।…আর ও কিশোর পাশা।'

আগ্রহের সঙ্গে রবিনের হাতটা ধরল অ্যাঞ্জেলা।

মনিকারও হাত মেলাতে আপত্তি নেই। জাস্টিনকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে। রাগে ফুঁসছে ও।

এতটা রেগে যাচ্ছে কেন জাস্টিন? ছেলেগুলোকে কি চেনে? খারাপ ছেলে? ভয় পাওয়ার কিংবা এড়িয়ে যাওয়ার মত কিছু করেছে? দেখে ওদেরকে মোটেও খারাপ লাগছে না মনিকার।

ওর দিকেই তাকিয়ে আছে কিশোর পাশা, যার সঙ্গে অলিভারের মিল আছে। চোখে চোখ পড়তে হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, গায়ে এত লোশন মেখেছ কেন? রোদকে ভয় পাও নাকি?'

মনিকাকে চিনতে পারার কোন লক্ষণ নেই ওর হাবভাবে। বাঁচিয়েছিল যে, সেটারও উল্লেখ করল না। তারমানে ও অলিভার নয়! আর নাম তো

লজ্জা পেল মনিকা। লোশন মাখা অবস্থায় ভূতের মত লাগছে নিশ্চয় ওকে। অস্বস্তিভরে বলল, 'কাল···কাল একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। কাবাব হয়ে গিয়েছিলাম···'

'বড় বেশি দুর্ঘটনা ঘটছে মনে হচ্ছে এখানে?'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল মনিকা, ফুঁসে উঠল জাস্টিন, 'তাতে তোমাদের নাক গলানোর প্রয়োজন নেই!'

'প্রচুর কাবাব আছে এখানে,' কুলারের ডালা তুলে ভেতরের খাবারগুলো দেখতে দেখতে বলল রবিন। এক এক করে বের করতে লাগল। 'গরুর কাবাব। মুরগীর রোস্ট। পটেটো সালাদ। স্যান্ডউইচ। আরে মুসা, দাঁড়িয়ে রইলে কেন? লাঞ্চের সময় তো প্রায় হয়ে গেছে। একটু আগেভাগে খেলে কোন ক্ষতি হবে না। স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ করে পেটের মধ্যে মোচড় দিচ্ছে। বোসো, বোসো।'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। এ কোন্ রবিনকে দেখছে? পাহাড়ের ওপাশ থেকে বেরোনোর সময় কিশোরের সঙ্গে পরামর্শ করে বলেছিল রবিন, 'কোন ভাবনা নেই, ওদেরকে আমি সামলাতে পারব।' ঠিকই পারছে।

রবিনের পাশে বসল কিশোর। দেখাদেখি মুসাও।

মেয়েদের দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'খেয়ে যে ফেলতে চাও, ওদের হবে তো?'

'আরে হবে হবে, হয়ে আরও বেশি হয়ে যাবে,' হাসিমুখে জবাব দিল রবিন। আড়চোখে তাকাল জাস্টিনের দিকে। মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে ওর দুই হাত। পারলে এখন ওদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলত।

'আগে ওদের দিয়ে নাও,' কিশোর বলল।

স্যান্ডউইচের প্লেটটা নিকির দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'তোমার নাম কি?'

'নিকি। নিকি মেয়ার।'

ছেলেদের পাশে এসে বসল নিকি। প্লেট থেকে একটা স্যান্ডউইচ তুলে নিল।

হাসিমুখে অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমার নাম অ্যাঞ্জেলা ব্রেকহার্ট।' মুরগীগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাহ্, দারুণ রোস্ট করে দিয়েছে তো ইউগি। দেখেই পানি আসছে জিভে। এতটা খিদে পেয়েছিল বুঝতে পারিনি।'

রাগে গজরাতে গজরাতে পানির কিনারে চলে গেল জাস্টিন।

'ওর ব্যবহারে কিছু মনে কোরো না,' নিকি বলল। 'বড়লোকের মেয়ে তো। একটু মেজাজী। এমনিতে ওর মনটা খুব ভাল।'

'আরে না না, কে মনে করতে যাচ্ছে। খিদে পেয়েছে, খেয়ে নিচ্ছি, ব্যস।' একটা আস্ত মুরগী মুসার হাতে দিয়ে আরেকটার ঠ্যাং ছিঁড়ে কামড় বসাল রবিন।

চোখের সামনে লোভনীয় খাবার দেখে আড়ষ্টতা কেটে গেল মুসার।

মেয়েদের অবাক করে দিয়ে দেখতে দেখতে সাবাড় করে দিল আস্ত মুরগাটা। হাড়গুলো বালিতে ছড়িয়ে ফেলে স্যান্ডউইচের প্লেটের দিকে হাত বাড়াল।

'আই, কি করছ?' হাসতে হাসতে জাস্টিনকে শুনিয়ে বলল রবিন, 'নোংরা করছ কেন? এটা প্রাইভেট বীচ।'

খুঁচিয়ে জাস্টিনকে রাগিয়ে দিতে বলেছে কিশোর। কেন, সে-ই জানে। সেজন্যেই এরকম আচরণ করছে রবিন। নইলে জোর করে অন্যের খাবার খেয়ে ফেলা, আজেবাজে কথা বলে কোন মেয়েকে অপমান করা, এতটা অভদ্র সে কোনকালেও নয়।

হেসে উঠল মুসা। চাপড় মারল রবিনের কাঁধে। এটাও অভিনয়। ডেঁপো ছেলেদের অভিনয় করছে ওরা।

তবে ওদের এই আন্তরিক ব্যবহার ভাল লাগছে অ্যাঞ্জেলা আর নিকির। মনিকারও। বার বার তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে। ও তাকালেই চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবছে, অলিভারের সঙ্গে এত মিল কেন ছেলেটার? চোখ দুটোও এক। তেমনি সুন্দর। রহস্যটা কোথায়?

রোদ ভীষণ কড়া। সহ্য করতে না পেরে নিকিও ঢুকল ছাতার নিচে। সার্ফিং নিয়ে কথা বলতে শুরু করল তিন গোয়েন্দার সঙ্গে। বুঝতে পারল এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞ মুসা।

খাওয়া শেষ করে সোডার বোতল বের করল রবিন। এ জিনিসটা অবশ্য সাতজনের তুলনায় কম। ভারী বলে বেশি বোতল বয়ে আনা কঠিন। ভাগ করে খেতে হলো।

আকাশের আরও ওপরে উঠছে সূর্য। রোদ চড়ছে। সাগর আর সৈকতের সীমারেখা এখন আগুনের মত জ্বলছে।

'পিকনিকটা ভালই জমল,' মনিকা বলল।

'আরও ভাল হত,' হাত তুলে জাস্টিনকে দেখাল রবিন, 'যদি রাজকুমারী আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।'

রোদ সহ্য করতে না পেরেই বোধহয় পানির কাছ থেকে ঘুরে দাঁড়াল জাস্টিন। রাগত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে শুরু করল ওদের দিকে। কাছে এসে বলল, 'সব সাফ?'

'আরে না না, আছে,' হেসে বলল রবিন। 'সবই একটু একটু করে রেখেছি। অত অভদ্র নাকি আমরা। তোমার জন্যে রেখে তারপর খেয়েছি। দেখো? তবে একটা কথা। বিনয়ের সঙ্গে না চাইলে কিছুই দেব না।'

ধক করে জ্বলে উঠল জাস্টিনের চোখ। আড়াআড়ি হাত রাখল বুকে। কঠিন গলায় বলল, 'বিনয়ের সঙ্গে একটা কথাই বলতে পারি তোমাদের—যাবে এখান থেকে? না অন্য ব্যবস্থা করব?' দাঁতে দাঁত চাপল সে।

উঠে দাঁড়াল রবিন। লালচে চুলে আঙুল চালাল। জাস্টিনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, 'খারাপ কিছু তো বলিনি আমরা, খারাপ কিছু করিওনি। এমন দুর্ব্যবহার করছ কেন?'

'আমি তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছি,' ভয়ঙ্কর গলায় হিঁসিয়ে উঠল জাস্টিন, 'ভালয় ভালয় চলে যাও!'

'যদি না যাই?' এক পা এগোল রবিন। 'দেখো, জাস্টিন··· ওটাই তো তোমার নাম, না কি? অহেতুক গোলমাল বাধানোর চেষ্টা কোরো না। অত সহজে ভয় পাবার পাত্র আমরা নই। তোমার খাবার দিয়ে লাঞ্চ করেছি, সেজন্যে ধমকটা সহ্য করলাম। চাও তো একটা ধন্যবাদও দিতে পারি। সেটা তোমার পাওনা।'

আরেক পা এগোল রবিন।

পিছিয়ে গেল জাস্টিন।

হাসল রবিন, 'হ্যাঁ, শোনো। এত তাড়াতাড়ি যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের নেই। ভাবছি তোমাদের বাড়িটা দেখতে যাব। ভেতরটা নাকি দেখার মত। সবাই মিলে একটা পার্টি দিলে কেমন হয়? ভয় পেয়ো না, এখনকার মত মুফতে খেয়ে ফেলব না। খরচের ভাগ আমরাও দেব।'

অবাক চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ইচ্ছে করলে মুখচোরা রবিন যে এতটা বাচাল হতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি কোনদিন—হোক না সেটা অভিনয়।

মুসার মনের কথা বুঝতে পেরে মুচকি হাসল কিশোর। সবার অলক্ষে চোখ টিপল।

বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। ভড়কে গেল মনিকা। কি করে বসবে জাস্টিন কে জানে!

রবিনের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল জাস্টিন, 'সরো, সামনে থেকে সরো বলছি!'

হাসি মুছল না রবিনের মুখ থেকে। 'অহেতুক ধমকাচ্ছ আমাদের। আমরা ছেলে কিন্তু খারাপ না। চলো, ঘরে চলো। এখানে ভয়ানক গরম।'

রবিনের দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর আর মুসা।

ওদের দিকে তাকিয়ে মনিকা ভাবছে, আসলে কি ওরা খারাপ?

ভয় দেখানোর চেষ্টা করল জাস্টিন, 'দেখো, আমাদের কুত্তা আছে। আইরিশ উলফহাউন্ড। বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর।'

'তাই নাকি!' চোখ বড় বড় করে ফেলল রবিন। 'বাবাগো! মরে যাচ্ছি ভয়ে! ইঁদুরের গর্ত খুঁজব নাকি?'

'ডাকলে গর্ত খোঁজার সময়ও পাবে না।'

'তাই নাকি? তাহলে তো দেখাই দরকার। কষ্ট করে আর ডাকার দরকার নেই। চলো, তোমাদের বাড়িতে গিয়েই দেখে আসি। বাড়িটাও দেখা হবে···এক ঢিলে দুই পাখি।' এক এক করে নিকি, অ্যাঞ্জেলা আর মনিকার দিকে তাকাল রবিন। 'তোমরা কি বলো? যাব?'

'না না, প্লীজ!' সুযোগ পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল মনিকা। 'তোমরা এখন গেলেই ভাল হয়। আমরা এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরতে চাই না। সাঁতার কাটতে বেরিয়েছি।'

জাস্টিনের দিকে তাকাল রবিন, 'সত্যি চলে যাব?'

জবাব দিল না জাস্টিন। পারলে চোখের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলত।

ঠাস করে চড় মারল রবিন।

চিৎকার করে উঠল মনিকা।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা।

কিশোরও চমকে গেল।

বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে রবিন। এতটা করতে বলা হয়নি ওকে। অভিনয়ের নেশায় পাগল হয়ে গেল নাকি?

নয়

কিন্তু রবিনের হাসি মুছল না। জাস্টিনের কাঁধের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা পোকা। কামড়ে দিলে বুঝতে মজা। ঘোড়াই এর কামড় খেলে অস্থির হয়ে যায়। এই দেখো।'

সত্যি সত্যি একটা বড় পোকা দেখা গেল রবিনের হাতে। মরা পোকাটা বালিতে ফেলে দিল সে।

'কিন্তু...' নরম হয়ে এল জাস্টিন।

'চড়টা একটু জোরেই মেরে ফেলেছি। তোমাকে ব্যথা দেয়ার জন্যে দুঃখিত।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মনিকা। ওর পেছনে হাসতে শুনল নিকি আর অ্যাঞ্জেলাকে।

নিচু হয়ে সার্ফবোর্ডটা তুলে নিল কিশোর। 'রবিন, চলো যাওয়া যাক। আজ আর ওদের বাড়িতে ঢোকার দরকার নেই।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন নিজের সার্ফবোর্ডটা তুলে নিল রবিন। 'আমার কিন্তু খুব দেখতে ইচ্ছে করছিল। ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ...' জাস্টিনের দিকে ফিরল সে। 'লাঞ্চ খাওয়ানোর জন্যে ধন্যবাদ।'

সার্ফবোর্ড বগলে চেপে হাঁটতে শুরু করল তিন গোয়েন্দা। পানির কিনার ধরে এগিয়ে চলল।

কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থেকে জাস্টিন বলল, 'চলো, আমরাও চলে যাই। এখানে ভীষণ গরম।'

'জাস্টিন, ছেলেগুলোর সঙ্গে এমন ব্যবহার করলে কেন?' জানতে চাইল মনিকা।

চাদরটা তুলে নিয়ে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে জাস্টিন বলল, 'আব্বা-আম্মা আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে গেছে।'

'কি কথা?'

'ছেলেদের সঙ্গে না মিশতে। যদি শোনে মিশেছি, সাংঘাতিক শাস্তি দেবে। হয়তো পুরো ছুটিটা আর বাড়ি থেকেই বেরোতে দেবে না।'

'কিন্তু তার জন্যে ওদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করতে হবে কেন? ভালমত বলে দিলেই হত। আমার কাছে একটুও খারাপ মনে হয়নি ছেলেগুলোকে। ভাল করে বললে ওরা শুনত।'

'আমি কোন ঝামেলা চাই না এখানে,' চাদর ভাঁজ করতে করতে জবাব দিল জাস্টিন।

ছেলেগুলোর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করলে ঝামেলাটা কি হত বুঝতে পারল না মনিকা। বরং খারাপ ব্যবহারই গণ্ডগোল বাধায় বেশি। ছেলেগুলোকে কোন কারণে এড়িয়ে যেতে চাইল না তো জাস্টিন?

★

সেদিন বিকেলে মনিকার ঘরে আড্ডা মারতে ঢুকল নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। মনিকা তখন খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। পেছনের লনে শেষ বিকেলের ছায়া।

'অ্যাই, তোমাদের কারও কি মনে হয়েছে উদ্ভট আচরণ করছে জাস্টিন?' ঢুকেই জিজ্ঞেস করল নিকি। 'হাত তোলো।'

সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল অ্যাঞ্জেলা।

'ও সর্বক্ষণ অমন উত্তেজিত হয়ে থাকে কেন বলো তো?' বিশাল বিছানাটায় ঝপাৎ করে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। বুকে বালিশ চাপা দিয়ে উপুড় হলো।

'আজ দুপুরের ব্যাপারটার জন্যে বলছ তো? ছেলেদের ব্যাপারে ও সব সময়ই একটু লাজুক,' মনিকা বলল। 'গত বছর ক্যাম্পে দেখোনি?'

'লাজুক ছিল, কিন্তু এরকম উত্তেজিত হয়ে থাকত না। সারাক্ষণই মেজাজ খারাপ,' নিকি বলল। 'ক্যাম্পে মোটেও এমন ছিল না।'

'এক বছরে দুনিয়ার কত পরিবর্তন হয়েছে,' দার্শনিক ভঙ্গিতে বলে বিছানায় এসে বসল মনিকা। অ্যাঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন লাগছে তোমার?'

'মাথাটা কেমন হালকা হয়ে আছে। আর কোন অসুবিধে নেই।'

'দুই দিন হলো এখানে এসেছি। তেমন ভাল কাটল না কিন্তু। কাল মরতে মরতে বাঁচলাম আমি। আজ তুমি। অথচ এখানে মজা করতে এসেছিলাম আমরা...'

'আমাকে বাদ দিচ্ছ কেন?' নিকি বলল। 'আমিও কি কম ভুগেছি! কয়েক চামচ সালাদ খেয়ে ফেলেছি। কেঁচোর রস পেটে...' শিউরে উঠল সে। ওয়াক ওয়াক শুরু করল।

'আরে দূর, মনে কোরো না আর ওসব কথা! জলদি বাথরুমে যাও!' চেঁচিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলা।

বাথরুমে যাওয়া লাগল না। সামলে নিল নিকি। চোখে পানি এসে গেছে। হাত দিয়ে মুছল।

'হ্যাঁ, তোমার ভোগান্তিটা আমাদের চেয়ে কম না।' মনিকার দিকে ফিরল অ্যাঞ্জেলা। 'মনিকা, একটা কথা আগেই বলা উচিত ছিল তোমাকে, সুযোগ পাইনি।'

'কি কথা?' বিছানার মসৃণ চাদরে হাতের তালু ডলছে মনিকা।

দ্বিধা করতে লাগল অ্যাঞ্জেলা। নিকির দিকে তাকাল। আবার ফিরল মনিকার দিকে। 'কথাটা কেমন শোনাবে জানি না। কাল বিকেলে তোমাকে বালির নিচ থেকে তুলে আনতে যেতে চেয়েছিলাম আমি আর নিকি। জাস্টিন যেতে দেয়নি।'

ডলা থেমে গেল মনিকার। অ্যাঞ্জেলার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন কি বলেছে বুঝতে পারছে না।

'বার্ড স্যাংচুয়ারি দেখে ফেরার পথে আমি তোমাকে তুলে আনার কথা বললাম,' দরজার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠস্বর খাদে নামাল অ্যাঞ্জেলা। 'জাস্টিন বার বার বলতে লাগল, তুমি বাড়ি ফিরে গেছ। তুলতে তো গেলই না, এমনকি যে পথে গেলে তোমাকে দেখা যেত সেপথেও গেল না। উল্টো দিকের পথ ধরে বাড়ি ফিরে এল। আমি আর অ্যাঞ্জেলা কতবার করে বলেছি, তুমি আছ কিনা দেখে গেলে ক্ষতিটা কি? কানেই তুলল না ও।'

অ্যাঞ্জেলার কথা সমর্থন করল নিকি। 'বুঝতেই পারছিলাম এত বালি ঠেলে সরিয়ে বেরোনোর সাধ্য তোমার হবে না।'

নিকি থামতেই অ্যাঞ্জেলা বলল। 'জাস্টিন বলল, বেরোনো কিছু না।'

'শুকনো বালি হলে হয়তো বেরোতে পারতাম,' নিচের ঠোঁট কামড়াল মনিকা। 'কিন্তু ভেজা বালি ভীষণ ভারী।' গালের পোড়া জায়গাগুলোতে হাত বোলাতে শুরু করল সে। ড্রেসারের কাছে উঠে গেল আরও অ্যালো লোশন লাগানোর জন্যে। বলল, 'জাস্টিন বোধহয় কল্পনাই করতে পারেনি আমি ঘুমিয়ে পড়ব। এত গরমে যে কেউ পারে, এটা ওর মাথাতেই আসেনি। ওর জায়গায় আমি হলে আমারও আসত না। দোষটা আসলে অ্যালার্জির ওষুধের, অ্যান্টিহিস্টামিন, তাড়াতাড়ি সারানোর জন্যে বেশি পরিমাণে খেয়ে ফেলেছিলাম...'

'কিন্তু যা-ই বলো, জাস্টিন স্বাভাবিক আচরণ করছে না,' নিকি বলল। 'এমন হতে পারে গত বছর শারমিনের অ্যাক্সিডেন্টের পর ওর মাথায় গোলমাল হয়ে গেছে। বোনের মৃত্যুর শকটা সহ্য করতে পারেনি সে। উল্টোপাল্টা আচরণ করছে তাই...'

'এটা অবশ্য হতে পারে,' একমত হলো অ্যাঞ্জেলা। 'দেখছ না, একবারও বোনের কথা তুলছে না। ওই আলোচনাতেই যেতে চায় না। ভাবতে গেলেই খারাপ লাগে বোধহয়...'

'হাজার হোক, বোন তো। বেচারি শারমিন।'

লোশনের কৌটা খুলতে খুলতে বলল মনিকা। 'ও আমাকে স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছে, শারমিনের ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় না।'

'তাহলেই বোঝো। খারাপ লাগে।' মনিকার দিকে তাকাল নিকি। 'তুমি

শারমিনের কথা তুলেছিলে নাকি?'

'হ্যা। আজ সকালে।' খানিকটা লোশন নিয়ে কপালে ডলল মনিকা। বেশ ঠাণ্ডা লাগল জায়গাটা। 'টেনিস খেলতে গিয়েছিলাম। তোমরা তখনও ওঠোনি। শারমিনের কথা বলতেই খেঁকিয়ে উঠল জাস্টিন। সাফ বলে দিল, ওর ব্যাপারে আলোচনা করতে চায় না।'

'হুঁ!' মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা।

'আলোচনা না করাই ভাল,' মনিকা বলল। 'ভাবলে আমাদেরই খারাপ লাগে, আর ওর তো বোন···আমিও আর ভাবতে চাই না। আনন্দ করতে এসেছি, সেটাই করব। ওসব দুঃখের কথা ভেবে মন খারাপ করার কোন মানে···'

★

সন্ধ্যায় বড় ডাইনিং রুমটায় আবার ডিনার খেতে বসল ওরা। মন ভাল এখন সবারই। হাসির গল্প বলছে নিকি। সেই সঙ্গে খাওয়া চলছে।

জাস্টিনও একটা গল্প বলল। তার বাবার মুখে শোনা। কোন এক দেশে গিয়ে নাকি জরুরী মীটিঙে বসে তার বাবা দেখলেন, সবাই ইটালিয়ান ভাষায় কথা বলছে। অথচ দেশটা ইটালি নয়। অবাক হয়েছিলেন তিনি।

খাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসন সরিয়ে নিতে এল হিউগি।

বান্ধবীদের দিকে তাকাল জাস্টিন, 'মোটে তো সন্ধ্যা। কাটাবে কি করে?'

'তুমিই বলো?' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'সিনেমা দেখতে যাওয়া যায়। কয়েক মাইল দূরে সী-সাইড কোভে পুরানো একটা হল আছে। তবে ছবি দেখায় নতুন। কিংবা বোর্ডওয়াকে যেতে পারি।'

'ওটা আবার কি?' জানতে চাইল নিকি। 'কোন ধরনের বিনোদনের জায়গা?'

মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন। 'হ্যা।'

'অ্যামিউজমেন্ট পার্ক?'

আবার মাথা ঝাঁকাল জাস্টিন।

'ও! তাহলে তো খুব মজা! চলো ওখানেই যাই। অ্যামিউজমেন্ট পার্ক আমার খুব ভাল লাগে। সময় কাটে চমৎকার।'

'আমারও ভাল লাগে। তবে একা হলে না,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'বাম্পার কারে চড়ব। হাউজ অভ মিরর দেখব। আয়নায় নিজের শরীরটা অদ্ভুতভাবে সরু আর লম্বা হয়ে ওঠে, দেখতে খুব মজা লাগে আমার।'

মনিকার দিকে তাকাল জাস্টিন, 'তুমি কিছু বলছ না?'

'ঘরে বসে থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল। আমি ফেরিস হুইলে চড়ব।'

'না না, বাবা, আমি ওসব হুইল-ফুইলের মধ্যে নেই,' হাত নাড়ল নিকি। 'গত বছরের অ্যাক্সিডেন্টের পর উঁচু জায়গা দেখলেই আমার ভয় লাগে। ওপরে উঠতে পারব না···'

জাস্টিনের মুখ কালো হয়ে যেতে দেখে তাড়াতাড়ি বাধা দিল অ্যাঞ্জেলা, 'আহ্, থামো না, নিকি! কোন কথার মধ্যে কোন কথা!'

থমকে গেল নিকি। 'সরি, জাস্টিন! আমার মনে ছিল না...'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' ভোঁতা, শুকনো, বিরস গলায় বলল জাস্টিন। চোখে শূন্য দৃষ্টি। 'আমি কিছু মনে করিনি।'

★

কিছুক্ষণ পর সেজেগুজে মার্সিডিজে এসে উঠল ওরা। ড্রাইভিং সীটে বসল জাস্টিন। সী-সাইড কোভে রওনা হলো। পথে কোথাও আর কোন বাড়িঘর চোখে পড়ল না। গ্রীষ্মাবাসের জন্যে অতিরিক্ত নির্জন জায়গা বেছে নিয়েছেন মিস্টার ফিলিপ। হতে পারে সারা বছর মানুষের সঙ্গে অতিরিক্ত মেলামেশা করে, কথা বলতে বলতে বিরক্ত হয়ে নির্জনে, নির্বাক হয়ে কিছুদিন কাটিয়ে শান্তি পেতে চান।

বিশ মিনিট পর সী-সাইড কোভে পৌঁছে পার্কের কিনারে গাড়ি রাখল জাস্টিন। গাড়ি থেকে নামল সবাই।

সী-সাইড কোভকে সৈকতের ধারের একটা খুদে উপশহর বলা যেতে পারে। সৈকত বলতে এক চিলতে বালিতে ঢাকা জমি। পাহাড় নেই, টিলা নেই, এমনকি একটা বালির ঢিবিও নেই এখানে। ঢেউও যেন অনেক বেশি নিরীহ। ঢেউয়ের মৃদু শব্দ আর থেকে থেকে ডেকে ওঠা সী-গালের তীক্ষ্ণ চিৎকারকে ঢেকে দেয় মানুষের কোলাহল আর যান্ত্রিক শব্দ।

জনতার ভিড়ে সামিল হলো ওরা। চতুর্দিকে নিয়ন আলোর চমক। বাতাসে পপকর্ন, হট ডগ আর কটন ক্যান্ডির সুগন্ধ। সেই সঙ্গে মানুষের কলরব হঠাৎ করে যেন নির্জনতা থেকে এক অদ্ভুত কোলাহলের জগতে নিয়ে এসে ফেলেছে ওদের।

ভাল লাগছে মনিকার। সামান্য সময়ের জন্যে নির্জনতা আর নীরবতা ভাল লাগলেও দীর্ঘদিন সেটা সহ্য করতে পারে না মানুষ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে লাগল।

প্রথমে মিরর হাউজে ঢুকল ওরা। আয়নায় নিজের শরীরকে সরু বানিয়ে দেখে মজা পেল অ্যাঞ্জেলা। নিকি আর মনিকারও খারাপ লাগল না। নিজের দেহটাকে আট ফুট লম্বা হয়ে যেতে দেখে জাস্টিনও হাসল।

সিজলারে চড়ল ওরা।

বাম্পার কারের কাছে ভিড় বেশি। চড়ার জন্যে লাইনে দাঁড়িয়ে বিশ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো।

বাম্পার কার থেকে নেমে একটা ফুড স্ট্যান্ডে কটন ক্যান্ডি কিনতে দাঁড়িয়েছে মনিকা, এই সময় পেছন থেকে বলে উঠল কেউ, 'মিষ্টি খুব পছন্দ নাকি তোমার?'

ফিরে তাকাল মনিকা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রবিন। গায়ে টকটকে লাল শার্ট। পরনে জিনস। নিয়নের আলোয় ধূসর লাগছে ওর বাদামী চুল।

মুসাকে এগিয়ে আসতে দেখল মনিকা।

কই, আমার কথার জবাব দিলে না?' হাসিমুখে আবার বলল রবিন।
হাসল মনিকা। 'হ্যাঁ। মিষ্টি আমার ভাল লাগে। তোমার জন্যে নেব?'
'না, আমার অত ভাল লাগে না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'থ্যাঙ্কিউ।'
'পয়সা বেশি থাকলে আমার জন্যে একটা কিনতে পারো,' হেসে এগিয়ে এল মুসা।
তাড়াতাড়ি বলে উঠল রবিন, 'মুসার ফাঁদে পা দিয়ো না, মনিকা। ও একটা রাক্ষস। মুহূর্তে ফতুর করে দেবে তোমাকে। ফকির হয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বাড়ি ফিরতে হবে শেষে।'
এগিয়ে এল জাস্টিন। কড়া চোখে তিন গোয়েন্দাকে দেখতে দেখতে ধমকে উঠল আচমকা, 'তোমাদের এখানে কি?'
'কেন, এজায়গাটাও কি প্রাইভেট? কিনে নিয়েছ?'
'থাক থাক, রবিন,' ঝগড়ার ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলল মুসা, 'ওকে চটানোর দরকার নেই।'
'আমি চটাব কি? ও তো চটেই আছে। দেখছ না কথার কি ধার?'
জাস্টিনের রাগ কমানোর জন্যে খোশালাপ করতে গেল মুসা, 'হাওয়া খেতে বেরিয়েছ বুঝি?'
জবাব দিল না জাস্টিন। কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গটগট করে হাঁটতে শুরু করল।
কাঁধ ঝাঁকাল মুসা, 'বাপরে বাপ! প্রিন্সেস বটে! বাড়ির লোকে ওকে সহ্য করে কি করে?'
জাস্টিনকে ডাকতে ডাকতে ওর পিছু নিল মনিকা। নিকি আর অ্যাঞ্জেলা দাঁড়িয়ে রইল। দুই গোয়েন্দার সঙ্গ ওদের ভাল লাগছে।
ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল জাস্টিন, বুঝতে পারল না মনিকা। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল সৈকতের ধারে। সাগর এত কাছে হওয়া সত্ত্বেও ঢেউয়ের শব্দ কানে আসছে না। অতিরিক্ত কোলাহল।
ভিড় থেকে আরও সরে যেতে শুরু করল মনিকা। এসেছেই যখন রাতের বেলা এখানে সাগর কেমন লাগে না দেখে যাবে না। ক্যান্ডি শেষ করে কাগজটা ফেলে দিল একটা ট্র্যাশ বাস্কেটে।
মিষ্টি আঠা আঙুলে লেগে গেছে। চেটে পরিষ্কার করতে করতে মুখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। অনেক বড় লাগছে চাঁদটাকে। কিন্তু রঙ ফ্যাকাসে। ধোঁয়াটে মেঘের হালকা স্তর ছুটে আসছে চারদিক থেকে। চাঁদ ছোঁয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে যেন।
সাগরের দিকে তাকাল মনিকা। চাঁদের আলোয় খুব আহামরি কিছু লাগছে না। তার একটা বড় কারণ, ঢেউ বেশি না থাকা। সাগরের সঙ্গে মস্ত ঢেউয়ের কোথায় যেন একটা যোগাযোগ রয়েছে। ঢেউ বড় না হলে সাগরকে মানায় না।
জায়গাটা নির্জন। নিয়ন আলোও নেই। এদিকে আসেনি জাস্টিন। ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

সেই ছেলেটা!
কালো কোঁকড়া চুল। কালো চোখ। দীঘল শরীর। চাঁদের আলো এসে পড়েছে গালে। ফ্যাকাসে চামড়া বিষণ্ন করে তুলেছে চেহারাটাকে।
'অলিভার! তুমি?' ফিসফিস করে বলল মনিকা।

দশ

'কি নাম বললে?' জানতে চাইল অলিভার।
'না না, কিছু না!'
'আমাকে ভূত মনে করেছ নাকি?'
মনিকার একটা হাত ধরল ছেলেটা। বরফের মত ঠাণ্ডা। শিউরে উঠল মনিকা। গতকাল দুপুরে রোদের মধ্যেও এরকমই ঠাণ্ডা লেগেছিল। অথচ আজ দুপুরে যখন কিশোর পাশার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, গরম লেগেছিল হাতটা। তারমানে দুজনের চেহারা এক হলেও এক ব্যক্তি নয়!
'অ্যাঁ!···না!' হাতটা ছাড়িয়ে নিল মনিকা। 'ভূত ভাবব কেন? ভূতে কি আর মানুষকে স্পর্শ করতে পারে?'
'কেন পারবে না?' বিষণ্ন হাসি হাসল অলিভার।
'কারণ ভূতেরা রক্তমাংসের তৈরি নয়। শুধু ছায়া। ছায়ার স্পর্শ করার ক্ষমতা থাকে না।'
'তাহলে রাত দুপুরে ঘাড় মটকায় কি করে?'
জবাব দিতে পারল না মনিকা। অন্য প্রসঙ্গে এল, 'কাল আমাকে পৌঁছে দিয়ে পালিয়েছিলে কেন?'
এড়িয়ে গেল অলিভার। ডেনিম শর্টসের পকেটে হাত ঢোকাল। সাদা একটা গ্যাপ টি-শার্ট গায়ে। একটা ধূসর সোয়েটশার্ট পেঁচিয়ে বেঁধে রেখেছে কোমরে। একশো বছর আগের স্টাইল। 'তোমার নাম মনিকা, তাই না?'
দেখছে মনিকা। পোশাকের কি নমুনা! তবে পুরানো হলেও খারাপ লাগছে না অলিভারকে। ভাল মানিয়েছে। সুন্দর মানুষকে সব কিছুই মানায়। সুন্দর মানুষ, না সুন্দর ভূত?
'হ্যাঁ, আমি মনিকা হাওয়ার্ড।'
'পোড়া দাগগুলো সেরেছে তোমার?' মনিকার কপালের দিকে তাকাল অলিভার। 'তোমার বন্ধুরা সচরাচর এই কাণ্ডই করে নাকি? খুন করার জন্যে বালির নিচে চাপা দিয়ে ফেলে রেখে যায় দুপুর রোদে?'
'ওরা বুঝতে পারেনি। এই রোদের মধ্যে যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব কল্পনাও করেনি। ভেবেছে গরম লাগতে বেরিয়ে আমি বাড়ি ফিরে গেছি।'
'কাণ্ডজ্ঞানহীনের ভাবনা!' রহস্যময় কণ্ঠে বলল অলিভার।
'বললাম তো, ইচ্ছে করে করেনি। পুরো ব্যাপারটাই ছিল একটা ভুল

ধারণা। দোষটা আমারই। ঘুমিয়ে পড়লাম কেন?'

'তা তো বটেই,' আগের মতই রহস্যময় কণ্ঠে বলল অলিভার, 'মরে গেলে কেউ খুন বলত না। ভাবত, অ্যাক্সিডেন্ট।...এসো, হাঁটি।'

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে লাগল ওরা। বকবক করে যাচ্ছে মনিকা। জাস্টিনের দাওয়াত পেয়ে এখানে বেড়াতে এসেছে ওরা তিন বান্ধবী, জানাল সেকথা। কখন যে গত রেড হিল ক্যাম্পের কথায় চলে এল, বলতেও পারবে না।

মনোযোগ দিয়ে শুনছে অলিভার। মাঝে মাঝে ছোটখাট প্রশ্ন করছে।

আবার ভিড়ের মধ্যে ফিরে এসেছে দুজনে। ফেরিস হুইলের কাছে। বিরাট একটা গোল চাকা ঘুরছে অনবরত। কাঠের ছোট ছোট বাক্সগুলো ওপরে উঠছে, নিচে নামছে। তারাজ্বলা আকাশের পটভূমিতে ওপর দিকে তাকিয়ে বিশাল নাগরদোলাটাকে একটা দৈত্যের মত লাগছে মনিকার।

'চলো, উঠি,' আচমকা প্রস্তাব দিয়ে বসল অলিভার।

সাগরের নোনা পানি ছুঁয়ে বয়ে এল ফুরফুরে বাতাস। মনিকার চুল উড়িয়ে দিয়ে গেল। অলিভারের দিকে তাকাল সে। 'উঠবে!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল অলিভার। 'ফেরিস হুইল তোমার পছন্দ?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা।

মনিকার চোখে চোখ রেখে হাসল অলিভার। হাত ধরে টানল, 'এসো। উঠব।'

'তোমার হাত এত ঠাণ্ডা কেন?' জিজ্ঞেস না করে আর পারল না মনিকা।

'ভূত যে, তাই!'

দুটো টিকেট কিনে মনিকাকে নিয়ে একটা খালি বাক্সে উঠল অলিভার। পাশাপাশি বসল। সামনের সেফটি বারটা তুলে দিয়ে গেল চালক।

চালু হলো ফেরিস হুইল। এক ঝটকায় কয়েক ফুট ওপরে উঠে গেল ওদের বাক্সটা। তারপর মসৃণ গতিতে উঠে চলল।

প্লাস্টিকের সীটে হেলান দিল মনিকা। যতই উঠছে, বেশি করে বাতাস লাগছে। কোমল বাতাস জুড়িয়ে দিয়ে গেল গাল আর কপালের পোড়া চামড়া। আকাশের দিকে তাকাল সে। 'রাতটা খুব সুন্দর। স্বপ্নের মত। ওপর থেকে সব দেখা যাবে।'

হাসল অলিভার। 'চাঁদটাও কি সুন্দর, দেখো। অদ্ভুত ফ্যাকাসে।'

'ফ্যাকাসে চাঁদ তো ভাল লাগে ভূতের। মায়ানেকড়ে কিংবা ড্রাকুলা হয়ে গলায় দাঁত ফোটাবে না তো আবার?'

নেকড়ের মত গরগর করল অলিভার। 'মায়ানেকড়ের পাশে বসতে ভয় লাগছে না?'

'সত্যি বলব?' হাসল মনিকা। 'না। লাগছে না। বরং আশ্চর্য একটা অনুভূতি হচ্ছে—তোমার সঙ্গে আমি নরকেও নিরাপদ।'

'ভূতের ওপর এতটা আস্থা রাখা ভাল না।'

'আমার কথা তো সবই শুনলে। তোমার কথা বলো। এই শহরেই থাকো?'

'না।'

'তাহলে কোথায় থাকো?'

'সবখানেই থাকি। যখন যেখানে প্রয়োজন।'

'আমি ঠাট্টা করছি না।'

'আমিও করছি না।'

হতাশ হলো মনিকা। কিছুতেই তার কথার সরাসরি জবাব দিচ্ছে না অলিভার। সত্যি কথাই বলছে হয়তো, কিন্তু ঘুরিয়ে। কিছু বোঝার উপায় নেই। সাগরের দিকে তাকাল। 'দেখো, সাগরটা কি সুন্দর লাগছে! নিচ থেকে কিন্তু একটুও লাগেনি।'

'ওপর থেকে অনেক কিছুই সুন্দর লাগে। অবাস্তব মনে হয়।'

'সেজন্যেই লাগে বুঝি?'

'হবে হয়তো।'

যতই ওপরে উঠছে নিচের সব কিছু আরও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বিশেষ করে সাগর। চাঁদের আলোয় বিছিয়ে থাকা রুপালী চাদরের মত লাগছে।

অলিভারের পেট থেকে কথা বের করার অন্য ফন্দি ধরল মনিকা। বলল, 'তুমি তো এখানে বহুকাল ধরে আছ। আশেপাশে কি কি আছে বলো না শুনি? ওই লাল আলোটা কিসের?'

'ওটা কিসের, জানি আমি। তবে একটা ভুল করছ। বহুকাল ধরে আমি এখানে থাকছি না। বললাম না, এখানে বাস করি না আমি...'

ঝটকা দিয়ে থেমে গেল হুইল। অনেক ওপরে উঠেছে ওদের বাক্স। সবচেয়ে ওপরে উঠতে হলে আরও তিনটে বাক্স সরতে হবে।

'থামল কেন?' নিচে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে মনিকা।

হাসল অলিভার। 'তুমি কি ভেবেছ অলৌকিক শক্তিবলে আমি থামিয়ে দিয়েছি? তোমার রক্ত খাওয়ার জন্যে? ভয় নেই, এখন খাব না।' নিচের দিকে হাত তুলে দেখাল, 'খালি বাক্সগুলোতে লোক তুলছে। সেজন্যেই থেমেছে।'

উঠে দাঁড়াল অলিভার। হাত টান টান করতে গেল।

চেঁচিয়ে উঠল মনিকা, 'বসো, বসো! পড়ে যাবে!'

'উঁচু জায়গাকে মনে হয় ভয় পাও তুমি?' মনিকার ভয়কে গুরুত্বই দিল না অলিভার। 'আমার জন্যে উঁচু-নিচু সব সমান।'

নড়ে উঠল বাক্স। ঝাঁকি দিয়ে চলতে শুরু করল। কাত হয়ে গেল বাক্স। বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে অলিভারও কাত হলো। চেপে ধরল সেফটি বার। নাড়া লেগে আরও কাত হয়ে গেল বাক্স। ঝটকা দিয়ে সামনে ঝুঁকে গেল অলিভারের দেহ। বেরিয়ে যাচ্ছে নাকি বাক্সের বাইরে!

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল মনিকা। চোখের পলকে ভয়ানক আরেকটা দুর্ঘটনার দৃশ্য খেলে গেল মনের পর্দায়। পতনের দৃশ্য।

এগারো

বাংকে চিত হয়ে হাত-পা টানটান করল মনিকা। দুপুরের ভয়াবহ আঠা আঠা গরমে যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। গায়ে বসে বিরক্ত করছে মাছি। চাপড় মারল একটাকে।

লাঞ্চ হয়ে গেছে খানিক আগে। এখন 'ফ্রী টাইম'। বাড়িতে চিঠি লেখার কথা। কিন্তু ভাগ্য ভাল, ওদের কাউন্সেলর ক্যাথারিন ভীষণ ঘুম কাতুরে। যত গরমই হোক, ওর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। পড়ে পড়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমায় সে। সুতরাং কারোরই আর ওই সময় বাধ্যতামূলক চিঠিটা লিখতে হয় না।

চিঠি লেখা বাদ দিয়ে আড্ডা দিচ্ছে মনিকা, জাস্টিন, নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। কাগজে লিখে লিখে চোর-ডাকাত খেলছে। হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিনের যমজ বোন শারমিন। কয়েক মিনিটের ছোট। দুজনের চেহারায় অনেক মিল।

তাড়াতাড়ি কাগজগুলো লুকিয়ে ফেলল অ্যাঞ্জেলা।

'কি করছ তোমরা?' জিজ্ঞেস করল শারমিন।

'সেটা তোমার জানার দরকার নেই,' নিকি জবাব দিল।

'যা, ভাগ এখান থেকে,' ধমক লাগাল জাস্টিন।

শারমিনের স্বভাবের জন্যে ক্যাম্পের কেউ পছন্দ করে না তাকে। অন্যদের তো বটেই, নিজের বোনের পেছনে পর্যন্ত লেগে থাকে। আড়ি পাতে। কাউন্সেলরের কাছে উল্টোপাল্টা লাগিয়ে বকা খাওয়ায়। শাস্তি দেয়ায়।

জাস্টিনের বিছানায় ধপ করে বসে পড়ল শারমিন। 'আমিও খেলব।'

'আমরা খেলছি কে বলল তোমাকে?' ভুরু নাচাল নিকি।

মাথা দোলাতে দোলাতে শারমিন বলল, 'আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না। চোর-ডাকাত খেলছ তোমরা।'

মনিকা বলল, 'চারজন হয়ে গেছি আমরা। আরেকজন নিতে গেলে বাড়তি হয়ে যাবে। কাকে বাদ দেব?'

'এই, তুই যা তো এখান থেকে!' আবার ধমক দিল জাস্টিন। 'বিরক্ত করিস না!'

'চিঠি লেখা বাদ দিয়ে খেলছ!' হুমকি দিল শারমিন, 'আমি কাউন্সেলরকে বলে দেব।'

'যা যা, দিস! ভাগ এখন!'

লাফ দিয়ে উঠে রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে গেল শারমিন। ও যে একটা কিছু করবে, কোন সন্দেহ নেই তাতে।

কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল জাস্টিন, 'দূর! মেজাজটাই দিল খারাপ করে!'

খেলা বন্ধ। কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকার পর নিকি বলল, 'আজ রাতে কি করা যায়, বলো তো?'

প্রায় রাতেই সবাই ঘুমিয়ে পড়লে বেরিয়ে পড়ে ওরা চার বান্ধবী। পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে আর নদীর ধারে ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে চাঁদনী রাতে ঘুরতে ওদের খুব ভাল লাগে। ক্যাম্পের কঠোর আইনের কারণে চুরি করে বেরোতে হয়। কাউন্সেলর জানলে আর রক্ষা থাকবে না।

'আজ তো পূর্ণিমা,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'চলো, আজ ডিয়ার ক্রীকে যাই। চাঁদের আলো বেশি থাকলে নাকি খুব সুন্দর লাগে ঝর্নাটা।'

বাকি তিনজন একবাক্যে রাজি।

মনিকা বলল, 'ঠিক বলেছ। ডিয়ার ক্রীকেই যাব...'

এই সময় সরে গেল পর্দাটা। হাসিমুখে আবার ঘরে ঢুকল শারমিন। 'ডিয়ার ক্রীকে যাবে, না? আমাকে না নিলে কাউন্সেলরকে বলে দেব।'

রাগে চড় মারতে উঠল জাস্টিন। ধরে ফেলল ওকে মনিকা। 'থাক থাক, মারামারির দরকার নেই। এক কাজ করি বরং, আজ ওকেও নিয়ে যাই?'

'না!' খেঁকিয়ে উঠল জাস্টিন। 'কোন দরকার নেই! ওকে আমি নেব না! শয়তানি করার আর জায়গা পায়নি! বাড়িতে হাড় কালি করে! এখানে এসেও শান্তি নেই! ও মরলে বাঁচতাম...'

'বেশ, যাও তোমরা। আমি কাউন্সেলরের কাছে যাচ্ছি...'

'অ্যাই, শোনো, শারমিন। অ্যাই শারমিন।' ডাক দিল মনিকা। জাস্টিনের দিকে ফিরে বলল, 'দেখো, ওকে না নিলে আমাদের যাওয়াটাও পণ্ড হবে। তারচেয়ে নিয়েই নিই।'

রাগে ফুঁসছে জাস্টিন। শেষে বলল, 'বেশ, নিতে পারি এক শর্তে। ডিয়ার ক্রীক পেরোতে হবে ওকে।'

জ্বলন্ত চোখে বোনের দিকে তাকাল শারমিন। মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। সবাই জানে ওরা, উঁচু জায়গায় উঠতে ভয় পায় ও। ডিয়ার ক্রীকে পাহাড়ের একটা ফাটলের অনেক নিচ দিয়ে বয়ে যায় পানির স্রোত। ফাটলটা পেরোনোর জন্যে ডালপালা ছেঁটে একটা আস্ত গাছ ফেলে রাখা হয়েছে। দিনের বেলাতেই ওই ফাটল পেরোতে ভয় লাগে। আর রাতের বেলা শারমিনের মত মেয়েদের তো আতঙ্ক হওয়ারই কথা। কিন্তু ভীষণ জেদী আর গোঁয়ার সে। রাগের মাথায় এমন সব কাণ্ড করে বসে, দুই দুইবার তাকে হাসপাতালে রেখে মানসিক রোগের চিকিৎসা করিয়ে আনতে বাধ্য হয়েছেন তাঁর বাবা-মা। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত বোনের চোখে যেন আটকে রইল তার নীল চোখের দৃষ্টি। মাথা দোলাল অবশেষে, 'বেশ, আমি রাজি! তাই করব!'

'কি বলছ তুমি, শারমিন?' চিৎকার করে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'ওকাজ করতে গেলে মারা পড়বে তুমি! আত্মহত্যা করতে চাও?'

ওর কথা কানেই তুলল না শারমিন। বোনের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কটার সময় যেতে হবে?'

সমান তেজে জবাব দিল জাস্টিন, 'রাত দশটায়। সব আলো নিভে গেলে।'

'ঠিক আছে, ডিয়ার ক্রীকেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে আমার আজ রাতে।'

রাত দশটা বাজলে ক্যাথারিন যখন ঘুমিয়ে পড়ল, পা টিপে টিপে নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ওরা চার বান্ধবী। দিনের তুলনায় রাতের বাতাস অনেক ঠাণ্ডা। বিশাল চাঁদটা ভেসে রয়েছে যেন আকাশের অনেক নিচুতে। হলুদ আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। ঝিঁঝি ডাকছে। গাছের পাতায় দীর্ঘশ্বাসের শব্দ তুলে বইছে মৃদু বাতাস।

বনের ভেতর গভীর খাঁড়িটার দিকে চলে গেছে একটা পায়েচলা পথ। আগে আগে হাঁটছে জাস্টিন। কিছুটা পেছনে পড়ে গেছে অন্য তিনজন। হঠাৎ গাছের আড়াল থেকে জ্বলে উঠল টর্চ। আলো পড়ল জাস্টিনের গায়ে। গর্জে উঠল ক্যাথারিনের কর্কশ কণ্ঠ, 'থামো, জাস্টিন! বাকি তিনটে শয়তান কোথায়?'

চোখের পলকে ঝোপঝাড়ের ভেতর আর গাছের আড়ালে যে যেখানে পারল লুকিয়ে পড়ল মনিকা, নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিন জবাব দিল না। একা খোঁজাখুঁজি করে বিশেষ সুবিধে করতে পারল না ক্যাথারিন। আর কাউকে পেল না। শেষে জাস্টিনকে নিয়েই ফিরে গেল।

আড়াল থেকে বেরিয়ে এক জায়গায় জড়ো হলো আবার মনিকারা তিনজন।

'কি করব? ফিরে যাব?' অ্যাঞ্জেলার প্রশ্ন।

'মাথা খারাপ!' মনিকা বলল। 'আমাদের কেবিনের সামনে গিয়ে বসে থাকবে এখন ক্যাথারিন। গেলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

'সকালেও ধরবে। তখন?'

'সকালে রাগ কমে যেতে পারে।'

'এখানে বসে থেকে লাভ কি আর তাহলে? চলো যেখানে যাচ্ছিলাম সেখানেই যাই।'

'জাস্টিনকে বাদ দিয়ে?'

'আর কি করব?'

'শারমিনটা যে এভাবে ফাঁসিয়ে দেবে ভাবতেই পারিনি।'

'না ভাবাটাই গাধামি হয়েছে আমাদের। ওর যা স্বভাব, এরকম কিছুই তো করার কথা। বুঝলাম না কেন?'

কিন্তু ক্রীকে পৌঁছে অবাক হয়ে গেল ওরা। শারমিন বসে আছে। ওদের দেখে জানতে চাইল, 'জাস্টিন কোথায়?'

মুখ বাঁকিয়ে নিকি বলল, 'ন্যাকা! জানো না কোথায়?'

'আমি জানব কি করে? আমি তো কথামত কখন এসে বসে আছি।'

'ক্যাথারিন ধরে নিয়ে গেছে।'

সব শুনে শারমিন বলল, রাতে বেরোনোর কথা ও কাউন্সেলরকে বলেনি। নিশ্চয় অন্য কোনভাবে সন্দেহ করে বনের মধ্যে লুকিয়ে ছিল ক্যাথারিন।

'যাই হোক,' উঠে দাঁড়াল শারমিন, 'এসেছি যখন, কাজটা আমি করেই ছাড়ব। তোমরা তিনজন সাক্ষী। আমার বোনকে গিয়ে বলবে ওর চ্যালেঞ্জ আমি মোকাবিলা করেছি।'

'দেখো, শারমিন, পাগলামি কোরো না,' বাধা দিল মনিকা। 'ক্যাম্পে ফিরে যাও। তোমাকে নিশ্চয় খুঁজবে না ক্যাথারিন।'

'হ্যাঁ, যাই, আর কাল গিয়ে সারা ক্যাম্পে হাসির ধুম পড়িয়ে দাও,' জিনসের প্যান্টে দুই হাত ঢুকিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল শারমিন। 'আমি পেরোবই!'

তিনজনে মিলে অনেক চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারল না ওকে।

গাছটার ওপর উঠে গেল শারমিন। দাঁড়িয়ে দেখছে অন্য তিনজন।

এগিয়ে যাচ্ছে শারমিন। মাঝামাঝি গিয়ে নিচের দিকে তাকিয়েই এক চিৎকার দিয়ে উঠল। ভয় পেয়ে গেছে। এগোতেও সাহস করছে না, পিছাতেও না। ঠিক এই সময় হই-চই শোনা গেল বনের ভেতর। অনেকগুলো টর্চের আলো।

মনিকা ভাবল, নিশ্চয় ক্যাম্পে গিয়ে জাস্টিনকে কড়া ধমক দিয়ে, ভয় দেখিয়ে ওর মুখ থেকে কথা আদায় করে নিয়েছে ক্যাথারিন। অন্য কাউন্সেলরদের সঙ্গে নিয়ে ওদের ধরতে আসছে।

পরে জেনেছে, জাস্টিন সব বলে দিতে বাধ্য হয়েছে ঠিকই, তবে ধরার জন্যে আসেনি কাউন্সেলর। শারমিন কোন মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসতে পারে এই ভয়ে ওর ক্রীক পেরোনো বন্ধ করতে ছুটে এসেছিল।

কাউন্সেলরের গলা শুনেই এদিক ওদিক ছুটে পালাল মনিকারা। একটা ঝোপের ভেতরে বসে কানে এল শারমিনের তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'বাঁচাও! বাঁচাও...'

★

কাঁধে হাত পড়তে চমকে বাস্তবে ফিরে এল মনিকা। বাক্সে দাঁড়িয়ে আছে অলিভার। বাইরে পড়েনি।

তোতলাতে শুরু করল মনিকা, 'তু-তু-তুমি পড়ে যাওনি!'

'না,' হাসল অলিভার, 'ভূতেরা কখনও পড়ে না। বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে।' মনিকার পাশে বসে পড়ল আবার সে।

খানিক পরে প্ল্যাটফর্মে থামল বাক্স। নেমে এল ওরা।

'কেমন লাগল?' জিজ্ঞেস করল অলিভার।

'অ্যাঁ!...খুব ভাল! দারুণ!' এখনও অন্যমনস্ক হয়ে আছে মনিকা।

কয়েক মিনিট নীরবে পাশাপাশি হাঁটল ওরা। তারপর মনিকা বলল, 'জাস্টিনকে খুঁজে বের করতে হবে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?'

জবাব না পেয়ে পাশে তাকিয়ে দেখে অলিভার নেই। তাড়াতাড়ি অন্যপাশে দেখল। নেই। পেছনেও নেই।

চলে গেছে।
আবার উধাও!
ঘটনাটা কি? সত্যিই কি ভূত?
অনিশ্চিত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল মনিকা। একটা গেম-বুদের কাছে আসতে ওর নাম ধরে ডাক শুনতে পেল। ফিরে তাকিয়ে দেখে নিকি ডাকছে। হাতে একটা খেলনা ভালুক। পাশে দাঁড়িয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন। রবিনরা নেই। এগিয়ে গেল মনিকা।
'কোথায় চলে গিয়েছিল?' জানতে চাইল জাস্টিন।
পাল্টা প্রশ্ন করল মনিকা, 'তুমি কোথায় গিয়েছিল? তোমাকে খুঁজতেই তো গেলাম।'
'আমি তো সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এসেছি।'
'ও।'
ভালুকটা দেখিয়ে নিকি বলল, 'দেখো কি পেয়েছি।'
'ডার্ট খেলে জিতলে নাকি?'
'মুসা জিতেছে। দিয়ে দিয়েছে আমাকে।'
জাস্টিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। 'থাকবে আরও? না বাড়ি যাবে এবার?'
'চলো,' গাড়ির দিকে পা বাড়াল জাস্টিন।

বারো

গভীর রাতে চিৎকার শুনে লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল মনিকা। নিকির ঘর থেকে আসছে। বিছানা থেকে নেমে দৌড় দিল সেদিকে।
ভেজানো দরজা। ঠেলা মেরে খুলে ভেতরে ঢুকল মনিকা। লাইট সুইচের জন্যে দেয়াল হাতড়াতে লাগল।
চিৎকার করেই চলেছে নিকি, 'খেয়ে ফেলল! মরে গেলাম!'
আলো জ্বেলে দিল মনিকা।
বিছানায় বসে আছে নিকি। পরনে হাতাকাটা পাতলা কাপড়ের নাইটড্রেস। এলোমেলো জট পাকানো চুল। হাত-পা ছুঁড়ছে। মনিকাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'মনিকা! আমাকে বাঁচাও!'
হুড়মুড় করে ঘরে এসে ঢুকল অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন।
'নিকি!' চিৎকার করে উঠল অ্যাঞ্জেলা, 'তোমার গায়ে ওগুলো কি?'
'বাঁচাও!' গুঙিয়ে উঠল নিকি। 'খেয়ে ফেলল আমাকে!'
বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মনিকা। আঁতকে উঠল। 'জোঁক!'
বড় বড় তিনটে জোঁক নিকির ডান কাঁধের নিচে আর বগলের চামড়া কামড়ে ধরে ঝুলছে। রক্ত খেয়ে টুপটুপে। গোঙাচ্ছে নিকি, 'জলদি সরাও!

জলাদ সরাও! মরে গেলাম!'
'নিকি, থামো! শান্ত হও! সরাচ্ছি!' মনিকা বলল।
'এল কি করে ওগুলো?' অ্যাঞ্জেলার চোখেও নিকির মতই আতঙ্ক।
'নোড়ো না,' নিকির কাঁধ চেপে ধরল মনিকা। 'টেনে খুলে আনতে হবে।'
'উফ্, মাগো!'
'এত নোড়ো না!' ধমকে উঠল মনিকা। 'ধরব কি করে?'
জাস্টিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। 'ওর বিছানায় জোঁক এল কি করে?'
অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জাস্টিন, 'আমি জানব কি করে?' এগিয়ে গিয়ে নিকির ডান হাতটা চেপে ধরল যাতে ছোঁড়াছুঁড়ি করতে না পারে।
কাপড় দিয়ে চেপে ধরে একটা জোঁককে টেনে খুলে আনল মনিকা। মুখ বিকৃত করে ফেলেছে। ছুঁড়ে ফেলল ওয়েস্টবাস্কেটে। এক এক করে বাকি দুটোকেও খুলে এনে একই জায়গায় ফেলল।
'রক্ত বন্ধ হচ্ছে না তো! মরে গেলাম!' চিৎকার থামছে না নিকির।
'আহ্, থামো না! রক্ত আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যাবে,' চেঁচিয়ে বলল মনিকা।
আতঙ্কে থরথর করে কাঁপছে নিকি। থেকে থেকে হাত-পা ঝাঁকি দিচ্ছে মৃগী রোগীর মত। দুগাল বেয়ে পানি ঝরছে।
'জোঁকের রাশি তোমার!' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'সেবার ক্যাম্পের লেকে নেমে গোসল করার সময়ও পায়ে ধরল। আর কাউকে ধরল না, শুধু তোমাকে...'
'থামো! থামো!' দুহাতে মুখ ঢাকল নিকি, 'আর মনে করিয়ো না!'
সেবার ওকে শান্ত করতে পুরো দিনটা লেগেছিল, মনে পড়ল মনিকার। 'কিন্তু এল কি করে ওগুলো এখানে?' ওয়েস্টবাস্কেটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'ওটা নাহয় লেক ছিল...লেকের পানিতে জোঁক থাকে...কিন্তু দোতলার বেডরুম? শুকনো দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠেছে জোঁক? ইমপসিবল!'
'কেউ ঘরে ঢুকে গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে!' ফোঁপাতে শুরু করল নিকি।
'কে?' ভুরু কুঁচকে ফেলল জাস্টিন।
'তা কি করে বলব? দরজার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। একটা ছায়ামূর্তিকে ছুটে পালাতে দেখলাম। তারপরই কাঁধে...উফ্, মাগো!' চোখ উল্টে দিল নিকি। বেহুঁশ হয়ে যাবে যেন।
ঝট করে ওকে ধরে ফেলল মনিকা। মোলায়েম কণ্ঠে বলল, 'নিকি, শান্ত হও। শান্ত হও।...ছায়ামূর্তিটাকে চিনেছ?'
'অন্ধকার ছিল!' গুঙিয়ে উঠল নিকি।
'থাক। শান্ত হও। ফেলে দিয়েছি। আর কোন ভয় নেই।'
'কেউ একজন জানে,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'নিকি পোকামাকড়কে ভয় পায়।'

'কে জানবে?' জানালার কাছে এগিয়ে গেল জাস্টিন। নিচে তাকাল। যেন দেখতে পাবে ছায়ামূর্তিটাকে। 'এ বাড়িতে রাতের বেলা কেউ ঢুকতে পারে না।'

'তাহলে কে রেখে গেল জোঁকগুলো?'

ফিরে তাকাল জাস্টিন। মাথা নাড়ল। ঝাঁকি খেল ওর সোনালি চুল। চুলের গোছা আঙুলে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে লাগল। তারপর বলল, 'গ্রীষ্মকালে অবশ্য এ বাড়িটাতে পোকামাড়কের উৎসব লেগে যায়। আম্মা এত বিরক্ত হয়, পালিয়ে বাঁচতে চায়। ইঁদুরও আসে। কিন্তু জোঁক…নাহ্, কখনও দেখিনি। তা ছাড়া সাগরের নোনা পানিতে জোঁক বাস করে না।'

'বললামই তো আমার গায়ের ওপর ফেলে দিয়ে গেছে কেউ,' কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে নিকি।

'হুঁ!' হঠাৎ রেগে গেল জাস্টিন। 'যাচ্ছি এখনই। হিউগিকে জিজ্ঞেস করব।' বেরিয়ে গেল সে।

জাস্টিনের পদশব্দ মিলিয়ে যাওয়ার পর মনিকা বলল, 'এ তো এক বিরাট রহস্য দেখা যাচ্ছে! নিকি, এখন কিছুটা ভাল লাগছে?'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে নিকি বলল, 'আমার কি মনে হচ্ছে জানো? জাস্টিন আমাদের দাওয়াত করে এনেছে অত্যাচার করার জন্যে।'

'কি যে বলো! তা কেন করবে?'

'ও একটা স্যাডিস্ট! ওর চোখের দিকে তাকিয়েছ? লক্ষ করোনি মাঝে মাঝে কেমন হয়ে ওঠে? উন্মাদের দৃষ্টি! ও আমাদের অত্যাচার করে শারমিনের জন্যে।'

'দূর!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিল মনিকা। 'শারমিনের মৃত্যুর জন্যে আমাদের দায়ী করবে কেন? আমরা কি করেছি? দোষ দিলে বরং ওকেই দিতে হয়। ও-ই ডিয়ার ক্রীক পেরোবার জন্যে খেপিয়ে তুলেছিল বোনকে।'

'তাতে কি? নিজের দোষটা এখন আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাইছে। মনিকা, ও ইচ্ছে করেই তোমাকে সৈকতে বালি চাপা দিয়ে রেখে এসেছিল খুন করার জন্যে। গেটের বিদ্যুতের সুইচ অন করে রেখে অ্যাঞ্জেলাকে মারতে চেয়েছিল। আমাকে…'

'শ্‌শ্‌!' ঠোঁটে আঙুল রেখে চুপ করতে ইশারা করল মনিকা।

পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঘরে ঢুকল জাস্টিন। এলোমেলো চুলগুলো ঠিক করেছে। একটা নাইটশার্ট পরে এসেছে। বলল, 'হিউগিও আমাদের মতই অবাক। ও কিছু জানে না।'

'ও জানবে কি করে? ও কি আর ফেলেছে নাকি?' বলতে গিয়েও বলল না নিকি।

চুপ করে আছে সবাই। খোলা জানালা দিয়ে বাইরে থেকে আসছে ঝিঁঝির ডাক। থমথমে পরিবেশ। ভাল লাগছে না মনিকার।

বড় করে হাই তুলল অ্যাঞ্জেলা।

কাঁপুনি বন্ধ হয়েছে নিকির। চিত হয়ে শুয়ে গলা পর্যন্ত চাদর টেনে দিল।

'চলো,' অন্য দুজনের দিকে ফিরে বলল মনিকা। 'সকালে এ নিয়ে আলোচনা করব।'

★

নিজের ঘরে ফিরে এল মনিকা। শীত শীত লাগছে। বড় জানালাটা বন্ধ করে দিল। শুতে গিয়ে মনে হলো গলাটা বেশি শুকনো। পানি খাওয়া দরকার। রান্নাঘরের রিফ্রিজারেটর থেকে পানি বের করে খাওয়ার জন্যে আবার বেরিয়ে এল বাইরে।

সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নিচে নামল, যাতে অন্য কারও ডিসটার্ব না হয়। এত রাতে পায়ের শব্দ শুনলে আবার কে কোন্ কাণ্ড ঘটিয়ে বসে কে জানে।

রান্নাঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে গেল সে। মৃদু আলো জ্বলছে লম্বা কাউন্টারের ওপর। চোখের কোণ দিয়ে একটা ছায়া নড়তে দেখল। ফিরে তাকিয়ে আর কিছু দেখতে পেল না। ডাক দিল, 'কে? জাস্টিন?'

সাড়া নেই।

পরক্ষণে দেখতে পেল আবার। দেয়ালের ছায়ায় চট করে মিশে গেল লম্বা একটা ছায়া।

মুহূর্তের জন্যে দেখেছে। তবে চেনার জন্যে যথেষ্ট। চিৎকার করে উঠল, 'অলিভার! তুমি!'

তেরো

সাড়া দিল না অলিভার। দেখাও দিল না আর। ছায়ায় মিশে গেছে যেন।

বাতাসে নড়ে উঠল পেছনের খোলা পাল্লাটা। দড়াম করে বন্ধ হলো।

দুরুদুরু করছে মনিকার বুক। আর ডাকতে সাহস পেল না। ইলেকট্রিফায়েড তারের বেড়া আর ধাতব গেট পেরিয়ে এ বাড়িতে ঢুকল কি করে অলিভার? জ্যান্ত কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ভূত হলেই কেবল...

'মনিকা? এত রাতে?' পেছন থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ।

ধড়াস করে এক লাফ মারল মনিকার হৃৎপিণ্ড। ফিরে তাকাল। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে হিউগি।

'পা-পানি খেতে এসেছি!' কোনমতে বলে ঢোক গিলল মনিকা।

মাথা ঝাঁকাল হিউগি। 'দাঁড়াও। দিচ্ছি।'

রিফ্রিজারেটর থেকে পানির বোতল বের করে গ্লাসে ঢেলে দিল হিউগি। নিজেও নিল এক গ্লাস। 'আমিও পানি খেতে এসে তোমার চিৎকার শুনলাম। কি হয়েছিল?'

'অলিভার...কাকে যেন বেরিয়ে যেতে দেখলাম।'

'মানে?' মাঝপথে থেমে গেল হিউগির গ্লাস ধরা হাত।

'একটা ছেলে। আমাকে দেখেই বেরিয়ে গেল। পেছনের দরজা খোলা।

মনে হয় ওদিক দিয়েই বেরিয়েছে। বুঝতে পারছি না বাড়িতে ঢুকল কি করে...'

'তুমি শিওর?' হিউগির চোখে সন্দেহ।

'হ্যাঁ,' কাউন্টারে কনুইয়ের ভর দিয়ে দাঁড়াল মনিকা। 'চিনতেও পেরেছি...'

'কে?'

'অলিভার নামে একটা ছেলে। আজ সন্ধ্যায়ও বোর্ডওয়াকে দেখা হয়েছে আমাদের। ফেরিস হুইলে চড়েছি। অথচ এখানে আমাকে দেখামাত্র পালিয়ে গেল।'

'অসম্ভব!' ঢকঢক করে গ্লাসের পানি শেষ করে কাউন্টারে নামিয়ে রাখল হিউগি। 'রাতের বেলা আমাকে না বলে এ বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারবে না।'

'কেউ না?'

'কেউ না।'

'অন্য কেউ থাকে না তো এখানে?'

'না,' মাথা নাড়ল হিউগি।

'গেস্ট হাউজে কে থাকে তাহলে? কাল রাতে জানালায় আলো দেখেছি।'

'আলো?' টাকে হাত বোলাতে লাগল হিউগি। 'তুমি ভুল দেখেছ, মনিকা। আজ সকালেও আমি গেস্ট হাউজ পরিষ্কার করেছি। প্রতি সপ্তায় একবার করে করি। ওটা খালি। একেবারেই খালি। বহু বছর কেউ বাস করে না ওখানে।'

'কিন্তু সত্যি বলছি, কাল রাতে জানালায় আলো দেখেছি আমি। চোখের ভুল নয়।'

'কিন্তু কে আলো জ্বালবে গেস্ট হাউজে?' মাথায় হাত বোলাতে বোলাতেই জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল হিউগি। উঁকি দিল বাইরে। 'রাতে আপনাআপনি চালু হয়ে যায় বেড়া আর গেটের ইলেকট্রিক সিসটেম। কুকুর পাহারা দেয়। আজ বিকেলে অ্যালার্ম সিসটেমের কোডও বদলে দিয়েছে জাস্টিন। শুধু আমাকে বলেছে। আর কারও পক্ষে এই কোড জানা সম্ভব নয়।'

'বদলে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ। কেউ কোড না জানলে গেট খুলবে কি করে?'

'তাই তো!' চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা সজোরে ছাড়ল মনিকা।

আরেক গ্লাস পানি ঢেলে দিল ওকে হিউগি। চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। কিছু কি লুকাচ্ছে? মিথ্যে বলছে?

ভূতের ব্যাপারটা শেকড় গাড়তে শুরু করল তার মনে। রহস্যময় যা যা ঘটেছে এখানে আসার পর, সেগুলো ঘটানো কেবল ভূতের পক্ষেই সম্ভব। রাত দুপুরে ইলেকট্রিফায়েড বেড়া ডিঙিয়ে, কুকুরের চোখকে ফাঁকি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করা...

আর ভেতরে প্রবেশই বা প্রয়োজন পড়বে কেন? সে তো থাকেই এখানে। গেস্ট হাউজে বাস করে!

কিন্তু ভূতটা বড় বিচিত্র! সালাদে কেঁচো রেখে দেয়, রাত দুপুরে গায়ে জোঁক ফেলে যায়…এ কোন ধরনের ভূত?

আর যদি মানুষ হয়ে থাকে, তাহলে আবার সেই প্রশ্ন—ঢুকল কি করে?

কোন প্রশ্নেরই জবাব পেল না মনিকা। ভাবতে ভাবতে ফিরে এল নিজের ঘরে।

★

রাতে ভাল ঘুম হলো না মনিকার। পরদিন সকালে উঠেই তাড়াহুড়া করে কাপড় পরে নিচে নামল। ভূত দেখার কথা বলার জন্যে তর সইছে না।

নাস্তার টেবিলে বসে আছে সবাই।

মনিকার কথা শুনে হেসে উঠল অ্যাঞ্জেলা, 'শেষমেষ ভূতের খপ্পরে পড়লে?'

'হেসো না, অ্যাঞ্জেলা, আমি সত্যি দেখেছি!'

চুপ হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলা।

নিকি বলল, 'কিছু একটা আছেই এ বাড়িতে। নইলে রাত দুপুরে জোঁক ফেলতে আসবে কে?' রাতের কথা কল্পনা করে কেঁপে উঠল সে। 'হয়তো ওই ছেলেটারই কাজ…'

'কিন্তু ওকে আমার ভাল বলেই মনে হয়েছে…'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল জাস্টিন। 'অনেক হয়েছে! থামো এবার! ওসব ভূতফুত আমি কিচ্ছু বিশ্বাস করি না! থাকলে কোন জ্যান্ত ছেলেই লুকিয়ে আছে এখানে। খুঁজে বের করতে হবে ওকে। এখনই গিয়ে হিউগিকে বলছি। দরকার হয় পুলিশে ফোন করুক। ওরা এসে খুঁজে দেখুক সারা বাড়ি। আমরা এখন ওয়াটার-স্কি করতে বেরোব। এই সুযোগে আমাদের বিরক্ত না করে খুঁজতে পারবে।'

হিউগির নাম ধরে ডাকতে ডাকতে রান্নাঘরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

★

ওয়াটার-স্কি করার ব্যাপারটা বেশ রোমাঞ্চকর মনে হলো মনিকার কাছে। গায়ে চড়া রোদ লাগবে। কিন্তু তাই বলে না গিয়েও থাকতে পারবে না। মুখ আর অন্যান্য জায়গার পোড়া চামড়ার পরিচর্যা করতে বসল সে। প্রচুর পরিমাণে মলম মেখে বেরোবে।

স্কি করার জন্যে তৈরি হয়ে জাস্টিনদের ব্যক্তিগত ডকে নামল নিকি, অ্যাঞ্জেলা আর জাস্টিন। নিরাপত্তার জন্যে সবার কোমরে উজ্জ্বল কমলা রঙের ফ্লোটেশন বেল্ট। পানিতে ভাসিয়ে রাখবে।

বোটে উঠে জাস্টিন বসল ড্রাইভিং হুইলে। নিকি পেছনের সীটে। একপাশে বসে পানিতে হাত ঝুলিয়ে দিয়েছে অ্যাঞ্জেলা। পানি ঘাঁটতে ভাল লাগছে তার।

মনিকার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল ওরা।

অবশেষে ডকে নামল মনিকা। ওর দিকে তাকিয়ে জাস্টিন বলল, 'রোদ সত্যি সহ্য করতে পারবে তো? যা গরমের গরম, গলে না যাও।'

হাসল মনিকা, 'কেন, মোমের তৈরি মনে করেছ নাকি আমাকে? এত রোদে পড়ে রইলাম বালির নিচে, গললাম কই?'

টি-শার্টের ওপরে একটা ফ্লোটেশন বেল্ট পরল সে-ও। বাতাস মোটামুটি ঠাণ্ডা। তবে রোদের তেজ কমেনি। হাসি মুখে ব্যঙ্গ করতে করতে গালে এসে চড় মারছে যেন। ছলাৎ-ছল শব্দে ডকের গায়ে বাড়ি মারছে ঢেউ। মৃদু মৃদু দুলছে বোট।

'আগে কে স্কি করতে চাও?' জিজ্ঞেস করল জাস্টিন।

'আমি,' হাত তুলল অ্যাঞ্জেলা। যেন স্কুলে টীচারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

জাস্টিন আর নিকি দুজনেই অবাক হলো।

নিকি বলল, 'তুমি আবার ওয়াটার-স্কি পছন্দ শুরু করলে কবে থেকে?'

'পানিই তো পছন্দ ছিল না ওর!' জাস্টিন বলল।

'এখন করি,' জবাব দিল অ্যাঞ্জেলা। 'পানিতে নামতে আর ভয় পাই না। ভালমত সাঁতার শিখেছি।'

'বেশ, দেখব কেমন শিখেছ। কোনখান থেকে শুরু করতে চাও? ডক থেকে? না খোলা পানিতে গিয়ে?'

'খোলা জায়গায়ই চলো।'

'ঠিক আছে। একটা কথা মনে রেখো। কোন কারণে যদি ডুবে যাও, ডান হাতটা উঁচু করে ধরবে যাতে বুঝতে পারি ভাল আছ।'

'আচ্ছা। তবে ভয় নেই, ডুবব না।'

বোট থেকে নেমে গেল অ্যাঞ্জেলা। ডকের কিনারে বসে লম্বা স্কি দুটো পায়ে লাগাতে বসল। তাকে সাহায্য করল মনিকা। টেনেটুনে দেখল ঠিকমত লেগেছে কিনা।

লাফ দিয়ে পানিতে পড়ল অ্যাঞ্জেলা। রোদ চড়া হলেও পানি ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা পানি পছন্দ নয় তার। 'হাউফ' করে এক চিৎকার দিল।

ডকে বাঁধা বোটের শেকলটা খুলে দিল মনিকা। লাফ দিয়ে বোটে উঠল।

এঞ্জিন স্টার্ট দিল জাস্টিন। সরিয়ে নিতে শুরু করল ডকের কাছ থেকে।

অ্যাঞ্জেলার দিকে টো লাইন ছুঁড়ে দিল নিকি।

ধরে ফেলল অ্যাঞ্জেলা।

বোট যতই সরে যাচ্ছে, টানটান হতে লাগল দড়ি। স্কি-তে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। টো লাইন শক্ত করে ধরে হাঁটু সামান্য বাঁকা করে রেখেছে। নিখুঁত ভঙ্গি। কোন গণ্ডগোল নেই। কোন রকম ভুল করেনি। পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে মনিকা।

'রেডি?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল জাস্টিন। 'টান দিলাম?'

নিকির দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা। জাস্টিনকে সেটা জানাল নিকি।

মুহূর্তে গতি বেড়ে গেল বোটের। তীব্র গতিতে ছুটে চলল সবুজ ঢেউ কেটে।

অ্যাঞ্জেলার ওপর স্থির হয়ে আছে মনিকার দৃষ্টি। পানির ওপর দিয়ে মসৃণ গতিতে পিছলে যাচ্ছে ওর স্কি।

এঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে নিকি বলল, 'ভাল প্র্যাকটিস করেছে ও।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো মনিকা।

কিছুদূর সোজা এগিয়ে চক্কর মারার জন্যে বোটের নাক ঘোরাল জাস্টিন।

বিরাট এক চক্র তৈরি করে বোটের সঙ্গে সঙ্গে অ্যাঞ্জেলাও ঘুরে যাচ্ছে পেছনে। হা-হা করে হাসছে। চুল উড়ছে বাতাসে। তাকে দেখে মনিকারও স্কি করার জন্যে আইঢাই করে উঠল মন।

যেন মনিকার মনের কথা পড়তে পেরেই জিজ্ঞেস করল জাস্টিন, 'এরপর কে যাবে? তুমি?'

মাথা ঝাঁকাল মনিকা। বেজবল ক্যাপটা খুলে রাখল। দ্রুতহাতে ফ্লোটেশন বেল্ট খুলতে শুরু করল। এটা না খুললে নিচের টি-শার্ট আর প্যান্ট খুলতে অসুবিধে হবে।

শার্ট-প্যান্ট খুলে রেখে আবার ফ্লোটেশন বেল্টের দিকে হাত বাড়িয়েছে এই সময় কানে এল নিকির চিৎকার, 'জাস্টিন, থামো! অ্যাঞ্জেলা ডুবে যাচ্ছে!'

ঝট করে ফিরে তাকাল মনিকা। স্কি করতে গেলে পানিতে উল্টে গিয়ে কিংবা অন্য কোন কারণে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকেই। তারমানে এই নয় সেটা বিপদ। ঢেউয়ের মধ্যে অ্যাঞ্জেলার ডান হাতটা খুঁজতে লাগল সে।

নেই।

ভাল থাকার কোন রকম সঙ্কেত দিচ্ছে না অ্যাঞ্জেলা।

কপালে হাত রেখে চোখ বাঁচিয়ে রোদের মধ্যে খুঁজতে লাগল মনিকা। ঢেউয়ের মধ্যে কি যেন দেখতে পেল। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে। একবার ডুবছে একবার ভাসছে।

অ্যাঞ্জেলা?

না, জিনিসটা একটা স্কি। গলার কাছে দম আটকে এল যেন মনিকার।

'অ্যাঞ্জেলা কই?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল নিকি।

'ওই যে!' হাত তুলে দেখাল মনিকা। অ্যাঞ্জেলার মাথা ভেসে উঠেছে পানির ওপরে।

ও হাত তুলে রাখতে রাখতেই আবার ডুবে গেল অ্যাঞ্জেলা। আবার ভাসল। মরিয়া হয়ে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল।

'জাস্টিন, বোট ঘোরাও!' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা। 'নিশ্চয় বিপদে পড়েছে অ্যাঞ্জেলা। স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছে।'

'সর্বনাশ! একটানে সাগরের মধ্যিখানে নিয়ে চলে যাবে!' আতঙ্কে চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসবে যেন নিকির।

আচমকা নীরব হয়ে গেল যেন সব কিছু। মনিকার মুখ থেকে অস্ফুট একটা শব্দ বেরোল নিজের অজান্তে।

গতি কমে এল বোটের। তারপর ভেসে রইল। ঢেউয়ে দুলছে।

শক্তিশালী স্রোত থেকে বেরিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করছে অ্যাঞ্জেলা।

'জাস্টিন! দেরি করছ কেন? জলদি যাও!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মনিকার কণ্ঠ।

'পারছি না তো!' কন্ট্রোল প্যানেলে দ্রুত নড়াচড়া করছে জাস্টিনের আঙুল। 'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে! কিছুতেই চালু হচ্ছে না!'

চোদ্দ

'অ্যাঞ্জেলা ডুবে যাচ্ছে!' বোটের কিনারে ঝুঁকে রয়েছে নিকি। রোদের জন্যে তাকাতে পারছে না। মনিকার মতই কপালে হাত তুলে দিয়েছে। 'কিছু একটা করো! জলদি!'

'কিন্তু শয়তান এঞ্জিনটাই তো স্টার্ট হচ্ছে না!' কন্ট্রোল প্যানেলে থাবা মারল জাস্টিন। কপালে হাত রাখল। 'কি করব?…উফ্…'

অসহায় ভঙ্গিতে ভেসে থেকে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে বোট।

তাকিয়ে দেখছে মনিকা। বোটের চেয়ে অনেক বেশি অসহায় অ্যাঞ্জেলা। পানিতে খামচি মেরে ভেসে থাকার চেষ্টা করতে করতে স্রোতের টানে সরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ।

কি করতে যাচ্ছে একটিবারের জন্যেও চিন্তা না করে পানিতে ডাইভ দিয়ে পড়ল মনিকা। পানি ভয়ানক ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা কল্পনা করতে পারেনি। ভুস করে মাথা তুলল পানির ওপর।

এই সময় মনে পড়ল ফ্লোটেশন বেল্টটা পরা হয়নি। বোটেই রয়ে গেছে ওটা। চারপাশে ঢেউগুলো রোদে যেন জ্বলছে। ঘুরে তাকিয়ে অ্যাঞ্জেলা কোথায় দেখার চেষ্টা করল।

অবশেষে চোখ পড়ল ওর ওপর। ক্রমাগত ওপর দিকে হাত ছুঁড়ছে অ্যাঞ্জেলা।

লম্বা একটা দম নিয়ে সেদিকে সাঁতরাতে শুরু করল মনিকা। ভাল সাঁতারু সে। স্রোত থেকে বাঁচতে হলে কি করতে হবে জানা আছে তার। স্রোতের সমান্তরালে পাশাপাশি থেকে সাঁতরাতে হবে।

হঠাৎ তলিয়ে যেতে দেখল অ্যাঞ্জেলার মাথা। চট করে একটা চিন্তাই মাথায় এল—হাঙর না তো! এখানকার পানিতে প্রচুর হাঙর আছে, জানে সে। ভয় পেয়ে গেল। জোর করে তাড়াল চিন্তাটা। মনে ভয় ঢুকে গেলে অ্যাঞ্জেলাকে বাঁচানো তো দূরের কথা, সে নিজেও ডুবে মরবে।

আবার ভেসে উঠল অ্যাঞ্জেলার মাথা। রোদে চকচক করছে ভেজা চুল।

'অ্যাঞ্জেলা! ভেসে থাকো! আমি আসছি!' চিৎকার করে বলল মনিকা। 'অ্যাঞ্জেলা!'

আরও দ্রুত এগোতে চাইল সে। কিন্তু ঢেউ এগোতে দিচ্ছে না। সামনে

থেকে তো বাধা দিচ্ছেই, মনে হচ্ছে পা-ও টেনে ধরে রাখছে।

'জাস্টিন!' আবার চিৎকার করে বলল সে, 'কি করছ তুমি? এঞ্জিনটা চালু করছ না কেন? জাস্টিন...'

কান পেতে রইল এঞ্জিনের শব্দের আশায়। আশা করল, এই চালু হচ্ছে, এই চালু হচ্ছে। কিন্তু কানে এল শুধু ঢেউয়ের একটানা বিচিত্র হুসহুস আর নিজের ভারী দম নেয়ার শব্দ।

কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকাল সে। আগের জায়গাতেই ভাসছে বোটটা। এঞ্জিন চালু হওয়ার কোন লক্ষণই নেই।

'জাস্টিন! প্লীজ!'

বুঝতে পারল না, হঠাৎ করে একটা এঞ্জিন ওরকম বন্ধ হয়ে যায় কি করে!

কাঁধ ব্যথা শুরু হলো। খিঁচ ধরতে লাগল ডান পায়ের পেশীতে। সাঁতারুর জন্যে মারাত্মক বিপদ! শান্ত না থাকার কারণ এগুলো। বোকার মত তাড়াহুড়ো করার ফল।

নোনা পানিতে চোখ জ্বালা করছে। মাথা উঁচু করে চোখ মিটমিট করতে করতে খুঁজতে লাগল অ্যাঞ্জেলাকে। ওই যে, আছে। সামনে।

শান্ত হও। ভেসে থাকো চুপচাপ। পেশীর খিঁচ বন্ধ করার চেষ্টা করো। নইলে তুমিও মরবে—নিজেকে বোঝাল মনিকা।

ধীরে ধীরে কেটে গেল খিঁচ। সাঁতরাতে শুরু করল সে। মনে মনে বলল, অ্যাঞ্জেলা, ভেসে থাকো। আর একটু। আমি আসছি।

হঠাৎ আবিষ্কার করল সে, দ্রুত সাঁতরাতে পারছে। কষ্ট হচ্ছে না। পানির ওপর দিয়ে যেন উড়ে চলেছে।

স্রোত!

আতঙ্কে অবশ হয়ে আসতে চাইল হাত-পা।

তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আরও একটা মারাত্মক বোকামি করে ফেলেছে। স্রোতের পাশাপাশি না চলে সোজা এসে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে।

অ্যাঞ্জেলার মতই অসহায় অবস্থা হবে এখন তারও। বারসাগরে নিয়ে গিয়ে ফেলবে ওদেরকে স্রোত। ভয়াবহ কোন ঘূর্ণিপাকের মধ্যে। বেঁচে আর ফিরে আসা হবে না তাহলে কোনদিন!

পনেরো

জাস্টিন বোট নিয়ে আসছে কিনা মাথা তুলে দেখতে গেল মনিকা।

বিরাট এক ঢেউ এসে আছড়ে পড়ল তার ওপর। ডুবে গেল। নাকমুখ দিয়ে পানি ঢুকে গেল। হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে উঠল আবার। হাঁসফাঁস করে কোনমতে শ্বাস নিতে নিতে চারপাশে তাকিয়ে দেখল অ্যাঞ্জেলা কোথায়

আছে।

দেখতে পেল না ওকে। মনে মনে বলল, 'আমি দুঃখিত, অ্যাঞ্জেলা। চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারলাম না তোমাকে বাঁচাতে।'

স্রোত থেকে বেরোনোর চেষ্টা করতে লাগল সে। দুপায়ের পেশীতেই খিঁচ ধরতে আরম্ভ করেছে আবার। ডান কাঁধে তীক্ষ্ণ ব্যথা।

আবার একটা ঢেউ ডুবিয়ে দিল ওকে। মুখ দিয়ে নোনা পানি ঢুকে গেল গলায়। কোনমতে ভেসে উঠল। সাঁতরানোর চেষ্টা করল।

দুর্বল হয়ে আসছে ক্রমেই। সর্বনাশ করছে পায়ের খিঁচ। পা নাড়াতে দিচ্ছে না।

মাথার মধ্যে কিসের গর্জন! ঢেউয়ের? নাকি মৃত্যুর?

এঞ্জিনের শব্দ কানে এল মনে হলো ওর। ডুবে গেল। ভাসল আবার। ঘোরের মধ্যে যেন ওর কাঁধ চেপে ধরল লোহার মত শক্ত কয়েকটা আঙুল। টেনে তুলল ওকে।

আস্তে চোখ মেলে ফিরে তাকাল মনিকা। অ্যাঞ্জেলার ফ্যাকাসে মুখের ওপর চোখ পড়ল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চোখ বুজল আবার। শেষ পর্যন্ত তাহলে এঞ্জিন চালু করতে পেরেছে জাস্টিন। সে আর নিকি এসে উদ্ধার করেছে ওদের।

'কেমন লাগছে এখন?' কানের কাছে পুরুষকণ্ঠ শুনে চমকে চোখ মেলে তাকাল মনিকা। চোখ পড়ল কালো একটা উদ্বিগ্ন মুখে। ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে মুসা আমান।

তাজ্জব হয়ে গেল মনিকা। ড্রাইভিং সীটের দিকে তাকাল। হুইল ধরে আছে রবিন।

জাস্টিন নয়! মুসা আর রবিন এসে ওদের পানি থেকে টেনে তুলেছে!

ফিরে তাকাল মনিকা, 'অ্যাঞ্জেলা, ভাল আছ তুমি?'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল অ্যাঞ্জেলা, 'হ্যাঁ। তবে শরীরের কাঁপুনি বন্ধ হচ্ছে না কোনমতে।'

'বেঁচেছ যে এই বেশি!' বিড়বিড় করে বলল মনিকা।

'কোথায় যাব?' জানতে চাইল রবিন।

'ফিলিপদের ডকে,' মুসা বলল। 'ওদের নামিয়ে দিই।'

লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ফাইবারগ্লাসের তৈরি ছোট মোটরবোটটা। শক্তিশালী এঞ্জিন।

চারপাশে তাকিয়ে জাস্টিনের বোটটা খুঁজল মনিকা। কোথাও চোখে পড়ল না। অ্যাঞ্জেলাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছিল? অমন করে পানিতে পড়ে গেলে কেন?'

'কি জানি, বুঝলাম না!' রোদের মধ্যেও শীতে কেঁপে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'হঠাৎ ঢিল হয়ে গেল দড়ি। পানিতে পড়ে গেলাম। টো বার ছাড়িনি। তখনও ধরাই ছিল হাতে। দড়িটা ছিঁড়ে গেল মনে হলো। কোনমতে যখন ভাসলাম, দেখি স্রোতের মধ্যে পড়ে গেছি…'

কেঁপে উঠল অ্যাঞ্জেলা। কথা বন্ধ হয়ে গেল।

জড়িয়ে ধরে তাকে গরম করার চেষ্টা করল মনিকা।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল অ্যাঞ্জেলা। হেসে বলল, 'আমাদের কাছে হিরো হয়ে গেলে তোমরা।'

'ওরকম হিরো আমরা অনেকের কাছেই হয়েছি,' হেসে জবাব দিল মুসা।

'কেন, এসব উদ্ধারকর্মই করে বেড়াও নাকি তোমরা?'

'তা করে বেড়াই না। তবে চোখের সামনে কেউ মরে যাচ্ছে দেখলে বাঁচানোর চেষ্টা তো করতেই হয়...'

আরেকটা বোটের শব্দ কানে আসতে ফিরে তাকাল সবাই। জাস্টিনের বোটটা আসছে। ওদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছে জাস্টিন আর নিকি।

আগে বোট ভেড়াল রবিন। মুসা নেমে গিয়ে মনিকা আর অ্যাঞ্জেলাকে নামতে সাহায্য করল। তারপর বোটের শেকল আটকে দিল ডকের একটা হুকে। এঞ্জিন বন্ধ করে রবিনও নেমে এল।

ডকে বোট ভেড়াল জাস্টিন। লাফ দিয়ে নেমে এসে অ্যাঞ্জেলাকে জড়িয়ে ধরল নিকি।

জাস্টিনও বোট থেকে নেমে তাড়াতাড়ি শেকলটা আটকাল। ছুটে এল ওদের দিকে। চিৎকার করে বলল, 'উফ্, কি যে ভাল লাগছে! আরেকটু হলেই সর্বনাশ হয়ে যেত আজ!...আর রাখব না আমি ওই পচা এঞ্জিন। নিশ্চয় কারবুরেটরে তেল বেশি চলে আসে। কালই নতুন আরেকটা কিনে আনতে পাঠাব হিউগিকে।'

এতটাই খুশি হলো জাস্টিন, বান্ধবীদের বাঁচানোর জন্যে মুসাকেও ধন্যবাদ দিয়ে ফেলল। যাকে দুচোখে দেখতে পারে না, সেই রবিনকেও ধন্যবাদ দিতে গিয়ে দেখে সে নেই। কোথায় গেল?

রবিন তখন জাস্টিনের বোটে বাঁধা দড়িটার শেষ মাথা পরীক্ষা করছে। যেটা ধরে স্কি করছিল অ্যাঞ্জেলা। হাত তুলে ডাকল মুসাকে, 'দেখে যাও।'

এগিয়ে গেল মুসা।

কৌতূহল ঠেকাতে না পেরে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল মনিকা।

'কি?' কাছে এসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'দেখো,' দড়ির মাথাটা তুলে দেখাল রবিন। 'কাটা।'

'কাটাই তো হবে,' মুসা বলল। 'নইলে ও পানিতে পড়বে কেন?'

'আপনাআপনি ছেঁড়েনি। অনেকখানি কেটে রাখা হয়েছে, যাতে বেশি টান লাগলে ছিঁড়ে যায়। অ্যাঞ্জেলা স্রোতের মধ্যে গিয়ে পড়ার পর টান বেশি লেগেছিল। পট করে ছিঁড়ে গেছে। এর মানেটা কি বুঝতে পারছ?'

হাঁ করে একটা মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে থেকে মুসা বলল, 'ওকে খুন করতে চেয়েছিল কেউ।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দড়িটা ছেড়ে দিয়ে উঠে এল রবিন। 'চলো, আমাদের কাজ শেষ। বোটটা রেখে আসি।'

রবিনের সামনে এসে দাঁড়াল জাস্টিন। 'দাঁড়াও! গত হপ্তায়ও আমি আর

আব্বা স্কি করেছি। স্রোতের মধ্যেও নিয়ে গিয়েছিল আমাকে আব্বা। দড়ি ছেঁড়েনি। তুমি বলছ, কেটে রাখা হয়েছে। কে কাটল?'

'সেটা তুমি জানো। তোমাদের বোট···এসো, মুসা।'

কোনদিকে না তাকিয়ে মুসাকে নিয়ে গিয়ে বোটে উঠল রবিন। স্টার্ট দিয়ে চলে গেল।

ঢেউয়ের মাথায় ছোট হয়ে আসছে বোটটা। সেদিকে তাকিয়ে আপনমনেই বিড়বিড় করল জাস্টিন, 'সেই ছেলেটা কাটেনি তো? অলিভার?'

'সে কেন কাটবে?' শীতল কণ্ঠে প্রশ্ন করল নিকি।

ফিরে তাকাল জাস্টিন। 'শত্রুতা করে?'

'ও আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে যাবে কেন?'

'তাহলে মুসা আর রবিনই কেটে রেখেছিল। পানিতে পড়লে উদ্ধার করে আমাদের চোখে হিরো হওয়ার জন্যে। বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল আমাদের কোন একজন পানিতে পড়ার জন্যে। নইলে সময়মত বোট নিয়ে হাজির হলো কিভাবে ওরা?'

'কিন্তু ওদেরকে ওরকম খারাপ ছেলে বলে মনে হয় না আমার,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল মনিকা। 'তা ছাড়া জানবে কিভাবে আমরা কোনদিন, কখন স্কি করতে যাব?···নাহ্, ওরা একাজ করেনি। অন্য কেউ পেছনে লেগেছে আমাদের।'

'কে!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল যেন জাস্টিনের তীক্ষ্ণ কণ্ঠ। 'কাকে সন্দেহ হয় তোমাদের, বলো। আস্ত রাখব না তাকে আমি!'

ষোলো

'জাস্টিনই করেছে এই কাজ!' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করল নিকি। 'অন্য কেউ না। আমি এখন শিওর।'

লাঞ্চের পর সিটিং রুমে বসে কথা বলছে তিন বান্ধবী জাস্টিন গেছে কয়েকটা জরুরী ফোন কল সারতে। ঘরের অন্যপ্রান্তে লাল ইঁটে তৈরি ফায়ারপ্লেসের ওপর দেয়ালে বসানো মৃত হরিণের মাথাটা থেকে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে একজোড়া নিষ্প্রাণ, বিষণ্ণ চোখ।

সেদিকে তাকিয়ে অকারণেই গায়ে কাঁটা দিল অ্যাঞ্জেলার 'কি বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি,' সোফায় পিঠ সোজা করল নিকি সামনে ঝুঁকল 'ও ছাড়া আর কেউ না। আগেই বলেছি, এখনও বলছি। বোনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে আমাদের ডেকে এনেছে···'

'দূর, কি যে বলো না!' হাত নেড়ে উড়িয়ে দিতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'আমারও এখন জাস্টিনকেই সন্দেহ হচ্ছে, অ্যাঞ্জেলা,' মনিকা বলল।

'রবিন ঠিক বলেছে। ইচ্ছে করেই দড়ি কেটে রেখেছিল তোমাকে স্রোতের মধ্যে নিয়ে গিয়ে খুন করার জন্যে। ওখানে গিয়ে বোটের এঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা কাকতালীয় হতে পারে না। গত সপ্তাহে স্কি করতে গিয়ে দেখে এসেছে ওখানে কিরকম স্রোত আর টান। তাই এত জায়গা থাকতে তোমাকে ওদিকে নিয়ে গেছে। দড়ি ছিঁড়ে তুমি পড়ে যাওয়ার পর এঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে চালু না হওয়ার ভান করেছে।'

একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল অ্যাঞ্জেলা। তারপর বলল, 'কিন্তু শারমিনকে তো আমরা মারিনি!'

'জাস্টিনের ধারণা, ইচ্ছে করলে ওকে বাঁচাতে পারতাম আমরা। কিন্তু তা না করে কাউন্সেলরের ভয়ে পালিয়ে গেছি।'

'আসলেই কি সেটা করেছি আমরা? চেষ্টা করলেই কি বাঁচাতে পারতাম?'

মাথা নাড়ল নিকি, 'মনে হয় না। ও তখন গাছটার মাঝখানে। যত তাড়াতাড়িই করতাম না কেন, সময়মত ওখানে পৌঁছতেই পারতাম না আমরা। তোমরা কতখানি দেখেছ জানি না, আমি ফিরে তাকিয়েছিলাম। বাঁচাও বাঁচাও করে চিৎকারটা যখন করেছে ও, টলে পড়ে যাচ্ছে তখন।'

চুপ হয়ে গেল তিনজনে। ভাবছে সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটার কথা। পরদিন সকালে অনেক খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। শারমিনের লাশও পাওয়া যায়নি। স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, কে জানে।

খুব মুষড়ে পড়েছিল জাস্টিন। মনমরা হয়ে গিয়েছিল। ক্যাম্পে যতক্ষণ ছিল, কথাবার্তা বিশেষ বলেনি আর ওদের সঙ্গে। ওর অবস্থা দেখে ক্যাম্পিং শেষ হওয়ার আগেই লোক দিয়ে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল ক্যাথারিন···

'তো, এখন কি করব?' প্রথম মুখ খুলল অ্যাঞ্জেলা। 'একজন খুনীর সঙ্গে তো আর এবাড়িতে থাকা যায় না।'

'থাকব না। চলে যাব,' মনিকা বলল।

'চলে যাব বললেই যাওয়া যাবে না,' নিকি বলল। 'জাস্টিন আমাদের যেতে দেবে না। আটকে রাখতে চাইবে।'

'তাহলে পালাব আমরা। ওকে না বলে চলে যাব।'

'কবে?'

'দেখি, আরেকটা দিন দেখব। সাবধানে থাকব। কোন স্পোর্টস-টোর্টসের মধ্যে আর নেই। এমন কিছু করব না যেটাতে অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকে···'

দরজার দিকে চোখ পড়তে থতমত খেয়ে গেল নিকি।

চৌকাঠে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে জাস্টিন। শুনে ফেলল নাকি সব! কতখানি শুনেছে?

জাস্টিনের চেহারা দেখে কিছু বোঝা গেল না। ঘরে ঢুকল সে। হাতে একটা সোনালি রঙের চকলেটের বাক্স। ডালা খুলে সবার সামনে টেবিলে

রাখল। 'নাও। খুব ভাল জিনিস।'

চকলেট নিতেও দ্বিধা করল অ্যাঞ্জেলা, এতটাই ঘাবড়ে গেছে। মনে হলো, যদি বিষ দিয়ে দেয়?

সতেরো

আকাশের দিকে তাকাল মনিকা। ঝকঝক করছে। এত উজ্জ্বল, তাকানো যায় না। আলো ঠিকরে এসে লাগে চোখে। পরনের গোলাপী সুইমস্যুটটা টেনেটুনে ঠিক করল সে। পিঠ থেকে বালি ঝাড়ল। তাকাল মাখনসাদা সৈকতের দিকে।

বেশ খানিকটা দৌড়াতে হবে আজ, মনে মনে ঠিক করল সে।

সকালের অঘটনের পর উত্তেজনা কাটাতে টেনিস খেলেছে নিকি আর অ্যাঞ্জেলা। মাথা ধরেছে বলে গিয়ে শুয়ে পড়েছে জাস্টিন।

লাঞ্চের পর হিউগির সঙ্গে শহরে চলে গেছে নিকি। অ্যাঞ্জেলা বলেছে, সে-ও ঘুমাতে যাচ্ছে। কাউকেই সঙ্গী না পেয়ে একাকী সৈকতে নেমে এসেছে মনিকা। দৌড়ে সময় কাটাবে। তাতে শরীরও অনেক ঝরঝরে হবে।

খালিপায়ে দৌড়ানো শুরু করল সে। দক্ষিণে এগোল। শহরটা যেদিকে। পানির কাছাকাছি রইল, যেখানে বালি ভেজা আর শক্ত হয়ে লেগে আছে। ওপরের শুকনো আলগা বালিতে দৌড়ানো খুব কঠিন। ওখানে অল্পক্ষণেই পায়ের পেশীতে খিঁচ ধরে যায়।

ঠাণ্ডা, লবণাক্ত ঢেউ এসে পা ছুঁয়ে যাচ্ছে তার। জোয়ারের সময় এখন।

দৌড়াতে দৌড়াতেই মুখ তুলে তাকাচ্ছে সে। ধূসর-সাদা আকাশে উড়ছে সী-গাল। ওই পাখি, ঢেউয়ের শব্দ, পা ছুঁয়ে যাওয়া পানি। সব মিলিয়ে সময়ের হিসেব হারিয়ে ফেলল সে।

বুড়ো আঙুলের খোঁচায় খানিকটা বালি উঠে এল। বাধা পড়ায় বাস্তবে ফিরে এল সে। ফিরে তাকাল। বার্ড স্যাংটিউরির কাছে চলে এসেছে। গালে লাগছে কড়া রোদ। তিক্ত হয়ে গেল মন। আরেকবার এখানকার গ্রীষ্মকালের রোদকে ছোট করে দেখে বোকামি করল সে।

মেঘের ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। তারপরেও গায়ের চামড়া যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। নিজের বোকামির জন্যে আফসোস করা ছাড়া উপায় নেই। সঙ্গে করে পানির বোতল আনেনি। ওয়ান-পীস বেদিং স্যুট পরে আসাটাও ঠিক হয়নি কোনমতেই। রোদ ঠেকাতে পারে এমন কিছু পরা উচিত ছিল।

ফিরে যাওয়ার কথা ভাবল। লাভ নেই। অনেক সময় লাগবে তাতে। চামড়া যা পোড়ার ততক্ষণে পুড়ে যাবে। তারচেয়ে বরং ছায়ার খোঁজ করা যাক।

সামনে একটা কালো পাথরের চাঁই পানি থেকে মাথা তুলে রেখেছে।

ছায়া আছে।
ওটার দিকে চোখ রেখে দৌড়ে চলল সে। বিচিত্র অনুভূতি হলো মনে। কি যেন একটা গোলমাল হয়েছে। কানে আসছে নিজের পায়ের শব্দ, হাঁপানোর ফোঁস ফোঁস আর ঢেউয়ের একটানা আওয়াজ।
আশপাশটা এমন চুপচাপ হয়ে গেল কেন হঠাৎ? নাকি সব তার কল্পনা?
দাঁড়িয়ে গেল সে।
ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে: বিপদ!
পরিবেশটা এমন অদ্ভুত লাগছে কেন?
কেন লাগছে, বুঝতে কিছুটা সময় লাগল।
গাল, স্যান্ডপাইপার আর অন্যান্য পাখিদের কোলাহল নেই।
কান পেতে আছে সে।
সব নীরব।
এটা তো বার্ড স্যাংচুয়ারি, তাই না?
তাহলে পাখিগুলো কোথায়?
চোখ মিটমিট করে দূরে তাকাল সে। অবাক হয়ে দেখল আরেকটা মেয়ে পানির কিনারে দৌড়াচ্ছে। জাস্টিনের মত লাগল। তেমনি সোনালি লম্বা চুল। ছিপছিপে গড়ন।
মুখের কাছে হাত এনে চিৎকার করে ডাকল মনিকা, 'জাস্টিন!'
থামল না মেয়েটা। ফিরেও তাকাল না।
অন্য কেউ হবে, ভাবল মনিকা।
মেয়েটার কথা ভুলে গিয়ে পাখির খোঁজে কিছুদূরের গাছপালাগুলোর দিকে তাকাল সে।
একটাও নেই।
কিচিমিচি বন্ধ। শিস দিচ্ছে না। সেজন্যেই এত নীরব লাগছে। আগেরবার যখন এসেছিল ওগুলোর চিৎকারে মুখর ছিল এলাকাটা।
হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেল কেন পাখিগুলো?
কি হয়েছে?
মন থেকে একটা জবাবই পেল। জবাবটা এত গরমের মধ্যেও শীতল শিহরণ বইয়ে দিল তার মেরুদণ্ডে।
ভয় দেখিয়ে পাখিগুলোকে তাড়ানো হয়েছে!
হিংস্র কোন প্রাণী?
তাই হবে। এবং কাছাকাছি রয়েছে প্রাণীটা।
কয়েক সেকেন্ড পরেই তার ধারণা সত্য প্রমাণিত হলো। ঠিক পেছন থেকে এল চাপা গর্জন।
ফিরে তাকাল সে। বিশাল একটা সাদা আইরিশ উলফ-হাউন্ড। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। লম্বা, চোখা নাকটা নিচের দিকে নামানো। ঘাড়ের ঘন, তারের মত লোমগুলো খাড়া হয়ে উঠেছে।
ভয়ঙ্কর চোখে তাকিয়ে আছে কুকুরটা। মুখ খিঁচিয়ে রেখেছে। বেরিয়ে

পড়েছে লম্বা, চোখা, মারাত্মক দাতগুলো।
'অ্যাই, শান্ত হ!' নিচু, কাঁপা গলায় বলল মনিকা। 'যা, বাড়ি যা! লক্ষ্মী ছেলে!'
জবাবে ভারী ঘড়ঘড় শব্দ বেরিয়ে এল কুকুরটার গলার গভীর থেকে।
'লক্ষ্মী ছেলে!' মরিয়া হয়ে কুকুরটাকে শান্ত করার চেষ্টা করল মনিকা। বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করছে হৃৎপিণ্ড। 'কত্তো ভাল কুকুর তুই! যা, বাড়ি যা!'
কুকুরটার মুখ থেকে লালা গড়াতে লাগল। ঘড়ঘড়ানি রূপ নিল চাপা গর্জনে।
মতলব ভাল না ওটার। পিছাতে শুরু করল মনিকা।
লাফ দিয়ে সামনে এগোল কুকুরটা।
আর দেরি করল না মনিকা। ঘুরেই দিল দৌড়। ভেজা বালিতে লাথি লেগে বালির দলা ছিটকে উঠতে লাগল।
ফিরে তাকিয়ে দেখল কুকুরটা কি করছে। ছুটে আসছে পেছনে। দাঁত বেরিয়ে পড়েছে।
নিজের ছুটন্ত পায়ের শব্দ শুনতে শুনতে উলফ-হাউন্ডদের ব্যাপারে যা যা জানে সব চকিতে মনের পর্দায় খেলে গেল তার। গ্রেট ডেনিস জাতের নামকরা শিকারী কুকুরের চেয়েও বড় হয় এরা, সাংঘাতিক দ্রুত ছুটতে পারে, শিকার করার জন্যেই যেন জন্ম।
নেকড়েকেও নাকি দাঁতে টেনে ছিঁড়ে ফেলতে পারে।
এগিয়ে আসছে কুকুরটা।
কাছে।
আরও কাছে।
খটাস করে ওটার দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগার শব্দ কানে এল। গরম নিঃশ্বাস লাগল পায়ে।
কি করব?
কি করব আমি?
পানিতে নামা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।
মরিয়া হয়ে এক চিৎকার দিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল সে। লম্বা দম নিয়ে চলে গেল ঢেউয়ের তলায়।
ভেসে উঠে তাড়াতাড়ি সাঁতরে সরে যেতে চাইল তীরের কাছ থেকে।
সরো! সরে যাও! নিজেকে তাগাদা দিল সে।
পায়ে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাগতে চিৎকার করে উঠল।
হাত-পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফিরে তাকাল। গোড়ালিতে বসে গেছে কুকুরটার দাঁত।

আঠারো

আবার চিৎকার করে উঠল মনিকা।

লাথি মেরে সরানোর চেষ্টা করল কুকুরটাকে।

ছাড়ল না ওটা। চাপ লেগে মাথাটা কেবল সামান্য ডুবে গেল পানিতে।

মরিয়া হয়ে পা ছুঁড়তে লাগল মনিকা। বেশিক্ষণ কামড়ে ধরে রাখতে পারল না আর কুকুরটা।

প্রচণ্ড ব্যথা পা থেকে উঠে এসে শরীরের একপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

সামনে ঝাঁপিয়ে এসে আবার ওকে ধরার চেষ্টা করল কুকুরটা। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জন করছে।

'বাঁচাও, বাঁচাও!' চিৎকার করে উঠল মনিকা। ঢেউ এসে থামিয়ে দিল চিৎকার। নাকে-মুখে পানি ঢুকে গেছে। দম নেয়ার জন্যে আকুলি-বিকুলি করতে করতে লাথি মারল গজরাতে থাকা জানোয়ারটাকে।

পানিতে রক্ত দেখা গেল। ওর নিজের রক্ত। গোড়ালিতে তীব্র যন্ত্রণা।

বেহুঁশ হয়ে যাব!

এই ব্যথা আর সহ্য করতে পারছি না!

'বাঁচাও আমাকে! এই, কেউ আছ! বাঁচাও!'

সৈকতে ছড়িয়ে গেল ওর চিৎকার। শূন্য সৈকত।

আবার পায়ের কাছে খটাস করে উঠল কুকুরটার দাঁত। শেষ মুহূর্তে সরিয়ে নিল মনিকা। নড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ ব্যথা লাফ দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল যেন শরীরে।

পানিতে ডুবে গেল মাথা। বাতাসের জন্যে অস্থির হয়ে গেল ফুসফুস। ভেসে ওঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল সে।

মাথা তুলে আবার চিৎকার করল, 'কে আছ! বাঁচাও!' উঁচু হয়ে এগিয়ে আসছে ঢেউ। পানি ঢোকার ভয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলল তাড়াতাড়ি।

একটা হাত কাছাকাছি পেয়ে কামড়ে ধরতে চাইল কুকুরটা। ব্যর্থ হলো। খানিকটা এগিয়ে আবার কামড়াতে এল।

সরে যেতে হবে। বাঁচতে হলে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোন পথ নেই।

বুকের ভেতর ধুপ ধুপ করে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ডটা। প্রতিটি নিঃশ্বাসের সঙ্গে গোঙানি মেশানো ফোঁপানি বেরোচ্ছে ওর মুখ থেকে।

লম্বা দম নিয়ে ডুব দিল সে। ডুব-সাঁতার দিয়ে এগিয়ে চলল। সরে যেতে লাগল তীর থেকে দূরে। কুকুরটার মারাত্মক দাঁতের আওতার বাইরে।

দম ফুরিয়ে গিয়ে যখন ফেটে যাওয়ার উপক্রম হলো ফুসফুসটা, মাথা তুলল সে। ক্ষুধার্তের মত হাঁ করে বাতাস টানতে শুরু করল।

নোনা পানি যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে পায়ের ক্ষতে।

আরেকবার দম নিয়ে ফিরে তাকাল সে। দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে আসছে কুকুরটা। কালো চোখের দৃষ্টি যেন আঠার মত আটকে গেছে ওর ওপর।

সরে যেতে হবে। আরও দূরে। যতক্ষণ না হাল ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে যায় ওটা।

খোলা সাগরের দিকে ফিরে আবার ডুব দিল মনিকা।

আহত পা'টাকে টানতে টানতে সাঁতরে চলল সামনের দিকে। সাঁতরে ওকে পেছনে ফেলতে চাইছে। পারবে; সে-আত্মবিশ্বাস আছে ওর। আশা করল অনেক বেশি সরে যেতে পারলে ফিরে যাবে কুকুরটা। কিন্তু উলফ-হাউন্ডকে চেনে না সে। জানে না, একবার কোন শিকারের পেছনে লাগলে ওটাকে না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত দেয় না ওরা।

কালো পানির মধ্যে দিয়ে যতটা দ্রুত সম্ভব এগিয়ে চলল সে।

বাতাসের অভাবে বেশিক্ষণ ডুবে থাকা গেল না। কয়েক মুহূর্ত পরেই ভেসে উঠতে হলো। দম নিতে নিতে ফিরে তাকাল। চোখের ওপর থেকে পানি সরে গিয়ে দৃষ্টি স্বচ্ছ হতে দপ করে নিভে গেল সব আশা।

নীলচে-ধূসর একটা ত্রিকোণ পাখনা মসৃণ গতিতে পানি কেটে এগিয়ে আসছে। বাঁয়ে কিংবা ডানে, কোনদিকে সরার লক্ষণ নেই। তীরবেগে সোজা এগোচ্ছে ওর দিকে।

হাঙর!

উনিশ

গলা ফাটিয়ে বুনো চিৎকার করে উঠল মনিকা।

দামাল ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে গেল ওর চিৎকার।

এগিয়ে আসা পাখনাটা আতঙ্কিত করে দিয়েছে ওকে।

সাঁতার কাটার চেষ্টা করল। সাড়া দিল না বাহু। নাকে-মুখে নোনা পানি ঢুকে গিয়ে দম আটকে দিচ্ছে।

কাশতে শুরু করল। দম নেয়ার চেষ্টা করল। এই সময় টের পেল নিচে থেকে টানছে কিসে যেন।

স্রোত!

সর্বনাশ! একবার ওই স্রোতের আওতায় পড়ে গেলে কুকুর কিংবা হাঙরের আক্রমণ ছাড়াই পরপারে পৌঁছে যেতে দেরি হবে না।

মুখে ঢুকে যাওয়া পানি ছুঁড়ে ফেলে হাত-পা ছুঁড়ে ভেসে থাকতে চাইল সে। পানি ঢুকে জ্বালা করে উঠল নাক আর গলার ভেতরটা। পায়ের ক্ষত থেকে আগুনে-পোড়ার মত জ্বলুনী উঠে এসে ঢুকতে লাগল যেন মগজে।

ভাবো।

মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবো।

লম্বা দম নিয়ে আতঙ্ক তাড়ানোর চেষ্টা করল সে।

ভাবো! ভাবো! কি করলে হাঙরের কবল থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

সে পড়েছে, অতিরিক্ত নড়াচড়া বেশি পরিমাণে আকৃষ্ট করে হাঙরকে। তারমানে চুপ করে থাকতে হবে।

না নড়লেও এখন হাঙরটা তার কাছে আসবেই। কারণ পা থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। রক্তের গন্ধেই এসেছে ওটা। ধরবে ওকে জানা কথা। তবে নড়াচড়া কম করলে মৃত্যুটা খানিকক্ষণ দীর্ঘায়িত হবে।

যতটা সম্ভব কম নড়াচড়া করে ব্রেস্টস্ট্রোক দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল মনিকা। মনে পড়ল রেড হিল ক্যাম্পের সাঁতারের শিক্ষক বলেছিলেন, 'ব্রেস্টস্ট্রোকের সময় তোমার হাত আর পা এত কম নড়ে, পানিকে প্রায় আন্দোলিতই করে না।'

পানিকে আন্দোলিত না করার ওপরই এখন নির্ভর করছে তাঁর বেঁচে থাকা না থাকা।

বুকের মধ্যে বাড়ি মারছে হৃৎপিণ্ড। মাথায় চাপ দিচ্ছে রক্ত। গোড়ালিতে ভয়াবহ যন্ত্রণা। ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। সব কিছুকে উপেক্ষা করে এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে সাঁতরাতে হবে। কতক্ষণ পারবে?

একেকটা হাতকে মনে হচ্ছে হাজার মন ভারী।

নাহ্, পারবে না! আর সাঁতরাতে পারবে না! হাঙরটাই জিতল…

সাঁতরানো দূরের কথা, ভেসে থাকতেই কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে ভাসিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাল সে।

সহজ হয়ে গেল ভেসে থাকা।

কি হলো?

পানির টানে আপনাআপনি সরে যেতে শুরু করল সে।

বুঝতে খুব একটা সময় লাগল না। হতাশার একটা তিক্ত হাসি শব্দ করে ছেড়ে গেল ওর ঠোঁট।

সরতে গিয়ে বরং সোজা এসে ঢুকেছে ভয়াল স্রোতের মধ্যে।

হাঙরটার কাছ থেকে দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছে তাকে স্রোত।

কিন্তু হাঙর কি স্রোতের পরোয়া করে?

ঘন ঘন দম নিতে লাগল মনিকা। পেছনে ফিরে তাকানোর সাহস হলো না। একমাত্র চিন্তা এখন স্রোতের কবল থেকে কি করে বাঁচবে। হাঙরের কাছ থেকে সরিয়ে আনায় এখন কৃতজ্ঞ হলো স্রোতের কাছে।

যন্ত্রণাকাতর তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার কানে আসতে হাত-পা নড়ানো থামিয়ে দিল সে।

'কি হলো?' প্রশ্ন করল নিজেকে।

ফিরে না তাকিয়ে আর পারল না। কুকুরটার সাদা, লম্বা নাকটা হাবুডুবু খাচ্ছে পানিতে। সামনের পা দুটো উঁচু হয়ে গেছে পানির ওপর।

আতঙ্কের একটা তরল স্রোত খেলে গেল মনিকার শরীরে।

আবার চিৎকার করে উঠল কুকুরটা।
কিসের আক্রমণে এমন করছে বুঝতে অসুবিধে হলো না মনিকার।
নিচ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসে লাল করে দিল কুকুরটার আশপাশের পানি। ঢেউয়ের মাথার সাদা ফেনাগুলো লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্তের আঁশটে গন্ধ এসে নাকে লাগল মনিকার।
গুলিয়ে উঠল পেট। বমি ঠেলে আসতে শুরু করল।
দুর্বল কণ্ঠে শেষবারের মত কুঁই কুঁই করে উঠল কুকুরটা।
চোখ বন্ধ করে ফেলল মনিকা।
কিন্তু মেলতে বাধ্য হলো আবার যখন তার গায়ে ঘষা দিয়ে চলে গেল সিরিশ কাগজের মত খসখসে একটা জিনিস।
হাঙরের চামড়া খসখসে হয়!
চিৎকার করে উঠতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। হাঙর নয়। কুকুরটার প্রায় অর্ধেকটা শরীর। সাংঘাতিক খসখসে লোম। পানিতেও নরম হয়নি।
চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল সে।
চারপাশে তাকিয়ে হাঙরটার কোন চিহ্ন দেখতে পেল না।
আচমকা চিৎকার যেন ফেটে বেরোতে শুরু করল ওর মুখ থেকে। গত বিশটা মিনিট ধরে যে আতঙ্ক চেপে রাখতে বাধ্য হয়েছে তার শরীর, ছেড়ে দিল হঠাৎ করে। পরিশ্রম সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। ভেসে থাকার শক্তিও নেই আর। ডুবতে শুরু করল। বুঝতে পারছে তীরে পৌছানোর ক্ষমতা তার নেই। হাঙরটা যদি এসে তাকে ছিঁড়ে না-ও খায় এখন, স্রোত ওকে চুবিয়ে মারবে।
সাঁতরাতে হবে! সাঁতরাতে হবে! তাগাদা দিতে লাগল মগজ।
হাঙরটা কি চলে গেছে?
কুকুরের মাংস খেয়ে পেট ভরেছে?
বায়োলজি স্যারের লেকচার কানে ভাসতে লাগল: দাঁতের আওতায় পড়ে গেলে হাঙরের মুখ থেকে বেঁচে যাওয়ার সাধ্য নেই কোন শিকারের। হাঙরের মত এত নিখুঁত হত্যাকারী আজ পর্যন্ত আর সৃষ্টি হয়নি।
হয়নি যে সেটা খানিক আগেই নিজের চোখে দেখেছে মনিকা। ভয়ঙ্কর কুকুরটাকে কি সহজেই না ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। তাকেও কি হত্যা করতে আসছে পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম শিকারী?
কালো ঢেউয়ের মাথার ওপরে একটা ত্রিকোণ পাখনা খুঁজতে লাগল মনিকার চোখ।
সাঁতরাতে থাকো। মসৃণ গতিতে। বেশি নড়াচড়া কোরো না।
কিন্তু কিভাবে সাঁতরাবে? শরীরে তো আর একবিন্দু শক্তি অবশিষ্ট নেই। হাতই তুলতে পারছে না। তারপরেও জোর করে হাত-পাগুলোকে নড়তে বাধ্য করল সে।
কিন্তু কয়েক ফুটের বেশি এগোতে পারল না। শরীরের সমস্ত পেশীতে

ব্যথা। অবশ হয়ে গেছে পা। বুকে এত চাপ, মনে হচ্ছে ফেটে যাবে।
মাথার ওপর দিয়ে ঢেউ বয়ে গেল।
সৈকত! সৈকতটা কোথায়?
দেখতে পাচ্ছি না কেন?
ঘুরতে গেল।
ঘাড়টা সামান্য ঘুরলেও হাত আর নড়ছে না। কথা শোনাতে পারল না ওগুলোকে। সৈকতটা কোথায় দেখল না।
স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চলল ওকে।
সব লাল হয়ে যাচ্ছে। রক্তের মত লাল।
তারপর কালো।
কালো হয়ে যাওয়ার আগের মুহূর্তে মনে হলো আবছামত ডাঙা চোখে পড়েছে।

বিশ

'মনিকা! মনিকা!'
শক্ত হাত ঠেলা দিতে লাগল মনিকার কাঁধে।
'মনিকা? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?'
ঘোরের মধ্যে বুঝতে পারল উপুড় হয়ে পড়ে আছে মনিকা। মাথা তোলার চেষ্টা করল। কপালে, চোখের ওপর এসে পড়া চুলের ফাঁক দিয়ে তাকাতে চাইল।
'মনিকা, তুমি ঠিক আছ তো?' জিজ্ঞেস করল আবার কণ্ঠটা।
গুঙিয়ে উঠল মনিকা। মাথা তোলার চেষ্টা করল আরেকবার।
'মনিকা?'
'আমি কি বেঁচে আছি?' দুর্বল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে শরীরটা গড়িয়ে চিত হয়ে শুলো মনিকা।
কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে চোখ মিটমিট করে তাকিয়ে দেখল একটা অস্পষ্ট চেহারা। 'জাস্টিন!'
হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে আছে জাস্টিন। ভয়ে বিকৃত হয়ে গেছে চেহারা। 'মনিকা? তুমি ঠিক আছ?'
'জাস্টিন, তুমি এখানে কি করছ?' জিজ্ঞেস করল মনিকা। টেনেটুনে বেদিং স্যুটের ওপরটা ঠিক করল। কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য। শেষ বিকেলের আকাশ ছাই রঙে পরিণত হয়েছে। সৈকতে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।
কেঁপে উঠল সে। ছুরির খোঁচার মত তীক্ষ্ণ ব্যথা টের পেল গোড়ালিতে।
'আমি…আমি তোমাকে পড়ে থাকতে দেখলাম,' জাস্টিন বলল। গরম

একটা হাত রাখল মনিকার ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া কাঁধে। 'যতটা জোরে পারি দৌড়ে এসেছি। স্রোত তোমাকে ভাসিয়ে এনে ফেলেছে সৈকতে। আমি ভাবলাম...' কথা হারিয়ে ফেলল সে। 'জোয়ার বলেই বাঁচলে। গভীর সাগরে টেনে নেয়ার বদলে তীরে এনে ফেলে গেছে...'

'উফ্, আমার পা,' জোর করে শরীরটা টেনে তুলল মনিকা। উঠে বসল। পায়ের ক্ষতটা দেখল। যতটা ভেবেছিল ততটা কাটেনি। নোনা পানি যন্ত্রণাটা বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে নোনা পানি একটা উপকারও করেছে, রক্ত পড়া বন্ধ করে দিয়েছে।

'তোমার ভাগ্য ভাল আমি এসেছিলাম,' জাস্টিন বলল। 'সাঁতার কাটতে ইচ্ছে করল। এসে দেখি তুমি পড়ে আছ...'

উঠে দাঁড়াতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল মনিকা। পড়ে যাচ্ছিল। ধরে ফেলল জাস্টিন। 'হাঁটতে পারবে?'

আহত পা'টায় ভর দিয়ে দেখল মনিকা। 'মনে হয় পারব।' চোখের সামনে দুলে উঠল বালির সৈকত। লম্বা নীল নীল ছায়া ছুটে আসছে ওর দিকে। 'উফ্, মাথা ঘুরছে!'

আরও শক্ত করে ধরল ওকে জাস্টিন। 'আস্তে।...সামান্যই কেটেছে। বাড়ি গিয়ে হিউগিকে বলব ওষুধ লাগিয়ে দিতে। ঠিক হয়ে যাবে।' পরক্ষণেই ভুরু কুঁচকাল জাস্টিন। 'এহ্হে, আজকে তো হিউগিরও ছুটি। চলে গেছে। আর আসবে না। ঠিক আছে, আমিই লাগিয়ে দেব।'

ধরে ধরে মনিকাকে সিঁড়ির দিকে নিয়ে চলল জাস্টিন।

ওর কাঁধে ভর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল মনিকা। কালো মেঘে ছেয়ে ফেলছে। এর সঙ্গে যেন পাল্লা দিয়ে নানা রকম কালো ভাবনা ভিড় করে আসছে তার মনে।

কাকতালীয়ভাবে সৈকতে এসে পড়েনি জাস্টিন। ওকেই তখন দৌড়ে সরে যেতে দেখেছিল মনিকা। কুকুরটা ওদেরই। মনিকার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছিল সে।

তারের বেড়া দেয়া একটা ঘরে আটকে রাখা হয় কুকুরটাকে। রাতে ছাড়া দিনে কখনোই বের করে না হিউগি। আজ ও চলে যাওয়ার পর সুযোগ বুঝে বের করে নিয়ে গিয়েছিল জাস্টিন।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে কাঁটা দিল মনিকার গা। সাগরের ওপরের আকাশে গুড়ুগুড়ু করে উঠল মেঘ।

'ঝড় আসবে মনে হচ্ছে ভালমতই,' আনমনে বিড়বিড় করল জাস্টিন।

কান দিল না মনিকা। সে তার নিজের ভাবনা ভাবছে। কুকুরটাকে বের করে এনে ওর পেছনে ছেড়ে দিয়েছিল জাস্টিন, ওকে খুন করার জন্যে।

গেটের কাছে এসে নিচু হয়ে ঝোপের ভেতরে লুকানো ধাতব বাক্সে রাখা কীপ্যাড টিপল জাস্টিন। খুলে গেল পাল্লা।

ওর কাঁধে ভর দিয়ে দিয়ে চলল মনিকা। সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট পার

হয়ে বাড়ির দিকে এগোল।

গেস্ট হাউজের কাছ থেকে সামান্য দূরে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ইকটু দাঁড়াও। দম নিয়ে নিই।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ করছে জাস্টিন। 'ইস্, একেবারে শেষ হয়ে গেছ তুমি!'

আরেকবার মেঘ ডাকল সাগরের ওপর। আগের বারের চেয়ে কাছে।

'একা যেতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল জাস্টিন। 'আমি গিয়ে তাড়াতাড়ি কিছু অ্যান্টিসেপটিক ক্রীম আর ব্যান্ডেজ বের করে ফেলি।'

'পারব। যাও।' বলেই পা ফেলতে গিয়ে মুখ বিকৃত করে ফেলল মনিকা। প্রচণ্ড ব্যথা। খ্যাচ করে লাগে।

আঙিনা পার হয়ে পেছনের দরজা দিয়ে জাস্টিনকে দৌড়ে ঢুকে যেতে দেখল সে।

ঘুরে দাঁড়াল মনিকা। বাড়ির দিকে না গিয়ে কুকুর রাখার ঘরটার দিকে চলল। তারের খাঁচার কয়েক ফুট দূরে এসে দাঁড়িয়ে গেল।

যা ভেবেছিল। নেই কুকুরটা। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে। হুড়কোটা ঝুলছে।

তার সন্দেহই ঠিক। দরজা ভেঙে বেরোয়নি কুকুরটা। দরজা খুলে ওটাকে বের করে নেয়া হয়েছে।

'ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা!' আনমনে নিজেকে শোনাল মনিকা। খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ির দিকে এগোল আবার।

বড় ফ্রেঞ্চ ডোর দিয়ে বাড়িতে ঢুকতে যাবে সে, আরেকবার মেঘ ডাকল আকাশে। কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়ল ওর খোলা কাঁধে।

আর অপেক্ষা করা যাবে না। চলে যেতে হবে এখান থেকে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

ঘরে পা রাখল সে। হাঁপাচ্ছে। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে জাস্টিনকে খুঁজল। দেখতে পেল না ওকে।

পেছনের হলঘর দিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল। সিঁড়িতে উঠে থামল। রেলিঙে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিল কয়েক সেকেন্ড। এক পা এক পা করে উঠতে শুরু করল।

নিকি আর অ্যাঞ্জেলা কোথায়?

দোতলায় উঠে সবার আগে অ্যাঞ্জেলার ঘরটা পড়ে, হাতের ডানে। দরজায় টোকা দিয়ে নিচুস্বরে জিজ্ঞেস করল মনিকা, 'অ্যাঞ্জেলা, আছ?'

আরেকবার টোকা দেয়ার আগেই দরজা খুলে দিল অ্যাঞ্জেলা। ওর দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল, 'কি হয়েছে তোমার?'

'পরো শুনো। ঢুকতে দাও আগে।' অ্যাঞ্জেলাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মনিকা। দরজাটা লাগিয়ে দিয়ে বলল, 'জলদি করো! ব্যাগ গুছিয়ে নাও। বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

'তার মানে?' ঝুলে পড়ল অ্যাঞ্জেলার চোয়াল।

'বললাম তো, ব্যাগ গোছাও। জলদি! নিকি কোথায়?'
'নেই।'

একুশ

'নেই মানে?' প্রায় চিৎকার করে উঠল মনিকা।

হাঁ করে ওর দিকে তাকিয়ে আছে অ্যাঞ্জেলা। চশমার ওপাশে বড় বড় হয়ে গেছে চোখ দুটো।

জানালায় আঘাত হানছে বৃষ্টির ফোঁটা। কালো আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের ঝিলিক।

'শহর থেকে ফেরেনি এখনও। হিউগির সঙ্গে যে গেছে...'

'ফেরেনি! কখন আসবে বলেছে?'

'ডিনারের আগে।'

'জলদি ব্যাগ গোছাও।'

ভ্রূকুটি করল অ্যাঞ্জেলা। 'কিছু বুঝতে পারছি না! কি হয়েছে?'

মনিকা জবাব দেয়ার আগেই দরজা খুলে গেল। ওষুধ আর ব্যান্ডেজ নিয়ে ঘরে ঢুকল জাস্টিন। 'তুমি এখানে। আর আমি নিচের সমস্ত ঘরে খুঁজে মরছি।' অ্যাঞ্জেলার বিছানাটা দেখিয়ে বলল, 'বসো। পা'টা উঁচু করে ধরে রাখতে হবে।'

নির্বিবাদে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল মনিকা। বুঝতে পারছে তার ওপর অ্যাঞ্জেলার প্রশ্নবোধক দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে। কিন্তু এখন আর বলার সুযোগ নেই।

আর থাকবে না। জাস্টিনকে বিশ্বাস নেই। বার বার খুনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। নেহাত কপালগুণে কয়েকবার মরতে মরতে বেঁচেছে ওরা। এরপর আর বাঁচবে কিনা জানে না।

নিকি ফিরলেই ওদেরকে গাড়িতে করে বাস স্টেশনে দিয়ে আসতে অনুরোধ করবে জাস্টিনকে। জাস্টিন যদি রাজি না হয়...

হ্যাঁ, রাজি না হলে হেঁটেই যাবে ওরা শহরে। ঝড় আসুক বা না আসুক। কিংবা পুলিশকে ফোন করবে।

গত কয়েক দিনে ঘটে যাওয়া 'দুর্ঘটনা'র মত করে সাজানো খুনের প্রচেষ্টাগুলোর কথা ভাবতে ভাবতে জাস্টিনের সেবা নিতে লাগল মনিকা। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে জখম ধুয়ে, ওষুধ মাখিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে জাস্টিন। আফসোস আর সমবেদনার ভঙ্গিতে চুক-চুক করছে। কিন্তু একবারও জিজ্ঞেস করছে না কিসে করেছে জখমটা। করবে কি? জানেই তো।

দমকা বাতাস ঝাপটা দিয়ে এনে জানালার কাঁচে ফেলছে বৃষ্টির পানি।

লোক দেখানো আফসোস এসব! খুব বুঝি! তেতো হয়ে গেল মনিকার

মন।

বিদ্যুৎ চমকাল। নানা রকম ছায়া লাফ দিয়ে উঠল ঘরের মধ্যে।

নিকি এখনও আসছে না কেন? অস্থির হয়ে যাচ্ছে মনিকা। বৃষ্টিতে আটকা পড়েছে? নাকি ওকেও…বাজ পড়ার বিকট শব্দ চমকে দিল।

'যাও, হয়েছে,' মনিকার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বলল জাস্টিন। 'কেমন লাগছে এখন?'

'ভাল,' অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দিল মনিকা।

ঘড়ি দেখল জাস্টিন। 'ডিনারের সময় হয়ে গেছে। নিশ্চয় খাবার তৈরি করে রেখে গেছে হিউগি। ফ্রিজ খুঁজলেই পাওয়া যাবে। এই, গ্যাজেবোতে গিয়ে খেলে কেমন হয়?'

'এই বৃষ্টির মধ্যে!' অ্যাঞ্জেলা বলল।

'বৃষ্টিতেই তো ভাল। উঁচু জায়গা। ওপরে ছাউনি আছে। চারদিক কাঁচে ঘেরা। বৃষ্টি পড়বে না। বাতাস লাগবে না। ভেতরে বসে বসে মোমের আলোয় খাব আর জানালা দিয়ে সাগরে ঝড় দেখব। মজা হবে না?' দরজার দিকে এগিয়ে গেল জাস্টিন। বেরোনোর আগে ফিরে তাকাল, 'আমি খাবার নিয়ে যাচ্ছি। নিকি এলেই ওকে নিয়ে চলে এসো। ঠিক ছটায়।'

★

ছয়টা বাজার কয়েক মিনিট আগে হুড়মুড় করে অ্যাঞ্জেলার ঘরে ঢুকল নিকি। মাথায় লেপ্টে রয়েছে ভেজা চুল। হলুদ সানড্রেসটা চুপচুপে। দুজনের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার? কি হয়েছে?'

'গেছিলাম আজকে আরেকটু হলেই,' নিচু স্বরে বলে ইঙ্গিতে পায়ের ব্যান্ডেজটা দেখাল মনিকা।

দম আটকে ফেলল নিকি। 'জাস্টিন…'

'ব্যাগ গুছিয়ে নাও। জলদি! তোমার সন্দেহই ঠিক।' উঠে দাঁড়াল মনিকা। 'আজ বিকেলে ও আমার ওপর কুত্তা লেলিয়ে দিয়েছিল।'

'বলো কি!' চিৎকার করে উঠল নিকি। হাত উঠে গেল মুখের কাছে।

'সৈকতে ওকে দৌড়ে পালাতে দেখেছি আমি। আমি যে দেখে ফেলেছি ও জানে না। ঠিকই বলেছিলে তুমি—ও আমাদের খুন করতে চায়।'

কেঁপে উঠল নিকি। 'দাঁড়াও, কাপড়টা বদলে নিই।'

'তোমার জন্যেই বসে আছি। বদলাও। ব্যাগ গোছাও। তারপর জাস্টিনকে গিয়ে বলব আমাদের বাস স্টেশনে দিয়ে আসতে।'

'যদি মানা করে দেয়? যদি আমাদের আটকানোর চেষ্টা করে?' অ্যাঞ্জেলা বলে উঠল, 'যদি…'

'তিনজনের বিরুদ্ধে একজন,' নিকি বলল। 'পারবে না।'

বিদ্যুৎ চমকাল। আলোকিত করে দিল ঘরটা। আড়ি পেতে যদি জাস্টিন শুনে ফেলে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি দরজা লাগিয়ে দিতে গেল সে।

'যদি বলে বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালাতে পারব না,' মনিকা বলল, 'তাহলে হেঁটে চলে যাব আমরা…'

বজ্রের কানফাটা শব্দ কথা আটকে দিল তার।

★

সামনের হলঘরে ঢুকে সুটকেসগুলো নামিয়ে রাখল তিনজনে। আলমারি থেকে তিনটে ছাতা বের করে নিল।

হলওয়ে ধরে বাড়ির পেছন দিকে এগোনোর সময় মিটমিট শুরু করল আলো।

'মা-গো!' চিৎকার করতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল অ্যাঞ্জেলা, 'কারেন্ট না চলে যায়!'

'জাস্টিন কি সত্যি গ্যাজেবোতে আছে? ব্যাপারটা কেমন অদ্ভুত না?' ফিসফিস করে বলল নিকি।

আবার মিটমিট করল বাতি। তবে নিভে গেল না।

নিকির কথার জবাবে মনিকা বলল, 'জাস্টিন বলেছে ওখানে বসে সাগরের ঝড় দেখা যায়।'

'নাকি ওখানে নিয়ে গিয়ে আমাদের মারার আবার কোন নতুন প্ল্যান করেছে?' শুকনো গলায় বলল নিকি।

'বিশ্বাস কি?' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'আমার ধারণা, কোনমতেই আমাদের বেরোতে দেবে না সে।'

একটা দরজা খুলল মনিকা। পেছনের আঙিনা আলোকিত করে জ্বলছে সার্চলাইট। এ বাড়ির আরও অনেক যন্ত্রপাতির মত স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে এই আলোগুলোও। অন্ধকার হলে আপনাআপনি জ্বলে ওঠে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। উজ্জ্বল আলোয় অদ্ভুতভাবে কাঁপছে আর চকচক করছে বৃষ্টির ফোঁটা।

আঙিনায় বেরিয়ে ছাতা মেলল ওরা। জায়গায় জায়গায় পানি জমে গেছে। বাতাসে টান মেরে আরেকটু হলেই মনিকার হাতের ছাতাটা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

আকাশ চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুতের ঝিলিক। পরমুহূর্তে শোনা গেল বজ্রের গর্জন। মিটমিট করে উঠল সার্চলাইট। নিভল না এবারেও।

'আছে তো গ্যাজেবোতে?' অন্য দুজনের পেছনে হাঁটতে হাঁটতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল অ্যাঞ্জেলা।

'কি করে বুঝব? বৃষ্টির মধ্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না,' মনিকা বলল।

'গ্যাজেবোতে একটা আলো দেখলাম মনে হলো,' নিকি বলল। দুহাতে চেপে ধরেছে ছাতার হাতল।

'দেখো কেমন ঘুরে ঘুরে বাতাস বইছে!' অ্যাঞ্জেলাও শক্ত করে ছাতা ধরে রেখেছে। 'ভিজিয়ে দিল একেবারে!'

ভেজা ঘাসে ফ্চুত ফ্চুত আওয়াজ তুলছে ওদের স্নীকার। গেস্ট হাউজের দিকে এগোচ্ছে ওরা। টেনিস কোর্ট, সুইমিং পুল আর অন্যান্য জায়গাগুলো সার্চলাইটের আলোয় দিনের মতই স্পষ্ট।

লনের পেছনে বেড়ার ধার ঘেঁষে রয়েছে গ্যাজেবো। আলো দেখা যাচ্ছে

ভেতরে।

বৃষ্টির শব্দ ঢেকে দিয়েছে ঢেউয়ের শব্দকে।

লনের কিনারে একটা সাদা রঙ করা ছাউনির কাছে এসে দ্বিধা করল মনিকা। নাক কুঁচকে বাতাস টানতে টানতে বলল, 'গন্ধ কিসের?'

এত বৃষ্টির মধ্যেও পচা মাংস কিংবা ডিমের মত দুর্গন্ধ থেকে থেকে এসে নাকে লাগছে।

'উহ্, আমিও পাচ্ছি!' নাকমুখ কুঁচকে বলে উঠল নিকি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমিও!' অ্যাঞ্জেলা বলল।

সামান্য ফাঁক হয়ে আছে ছাউনির কাঠের দরজাটা।

সেদিকে তাকিয়ে মনিকা বলল, 'অদ্ভুত তো! কে খুলল? আমি তো জানতাম সব কিছু দেখাশোনা করে হিউগি। কোন ঘর খোলা রাখে না। তালা দিয়ে রাখে।'

'সেটা ওর ব্যাপার,' অ্যাঞ্জেলা বলল। 'ও আর ওর মনিব বুঝবে। কিন্তু দুর্গন্ধ কিসের? দেখবে নাকি?'

'দরকার নেই দেখার,' নিকি বলল। 'চলো গ্যাজেবোতে যাই। জাস্টিনকে বলে পালাই এখান থেকে। আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না আমার।'

'দাঁড়াও,' হাত তুলে বাধা দিল মনিকা। 'ছাউনিতে কি আছে না দেখে আমি যাব না।'

খোলা দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল সে। পেছনে প্রায় ওর গা ঘেঁষে চলল অন্য দুজন।

যতই এগোচ্ছে, গন্ধটা বাড়ছে।

'উহ্! ভয়াবহ গন্ধ!' নিকি বলল।

এক হাতে ছাতা ধরে বাতাসের ঝাপটা থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে করতে অন্য হাতে দরজায় ঠেলা দিল মনিকা।

দরজাটা পুরো খুলে যেতে সার্চলাইটের আলো ঘরের মধ্যেও গিয়ে পড়ল। সেই আলোয় ভেতরের দৃশ্য দেখে ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল তিনজনে।

বাইশ

সবার আগে চেঁচিয়ে উঠল নিকি। গোঁ-গোঁ করে দুর্বোধ্য স্বরে কি বলল কিছুই বোঝা গেল না।

হাতে ছাতা না থাকলে দুহাতে মুখ ঢাকত মনিকা। তাকানো যায় না। ফুলে ঢোল হয়ে আছে জাস্টিন। বেগুনী হয়ে গেছে চামড়ার রঙ। চোখ দুটো কোটরের গভীরে ঢুকে গেছে। আতঙ্কিত চিৎকারের ভঙ্গিতে পুরো হাঁ হয়ে

আছে মুখ।
ভয়ঙ্কর দৃশ্য!
গোঁ গোঁ করে চোখ উল্টে পড়তে পড়তে কোনমতে নিজেকে সামলাল অ্যাঞ্জেলা।
ঘুরে দাঁড়িয়ে মনিকার কাঁধে মুখ চেপে ধরল নিকি। 'এ-কি দেখলাম! এ-কি দেখলাম!'
'মাত্র দুই ঘন্টা আগে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে,' আপনমনে বিড়বিড় করে বলল মনিকা, 'এ কি করে সম্ভব? মরল কিভাবে?'
'খুন করা হয়েছে ওকে!' কোনমতে বলল অ্যাঞ্জেলা। হাত থেকে ছাতা ছেড়ে দিয়ে দুহাতে মুখ ঢাকল। মুহূর্তে ভিজে গেল ওর খাটো চুল আর সোয়েটশার্ট।
মনিকার গায়ের ওপর থেকে সরে গেল নিকি। 'হিউগিকে বলা দরকার!'
'কোথায় পাবে ওকে?' মনে করিয়ে দিল অ্যাঞ্জেলা। 'ওর তো আজ ছুটি। ডিউটি নেই।'
'কে খুন করল জাস্টিনকে?' মনিকার কণ্ঠস্বর কাঁপছে। ঘোরের মধ্যে রয়েছে যেন। 'অলিভার?'
খুনী ধারেকাছেই কোথাও আছে কিনা দেখার জন্যে যেন এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। হলুদ শঙ্কু তৈরি করে এসে ছাউনি আর আশপাশের কিছুটা জায়গা আলোকিত করে রেখেছে একটা সার্চলাইটা। ঝমঝম বৃষ্টির মধ্যেও সব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কোন মানুষ লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই।
'এখানে আমরা ছাড়া আর কেউ নেই,' কেঁদে ফেলবে যেন অ্যাঞ্জেলা।
'তাহলে কে খুন করল জাস্টিনকে?' আবার আগের প্রশ্নটাই করল মনিকা। আতঙ্ক ঠেকিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। চেষ্টা করছে হার্টবীট কমানোর।
'পুলিশকে খবর দিতে হবে। এক্ষুণি!' নিকি বলল। আরেকবার তাকাল জাস্টিনের পড়ে থাকা দেহটার দিকে। পরক্ষণে মুখ ঘুরিয়ে নিল আবার।
'হ্যাঁ। চলো, চলো,' তাগাদা দিল অ্যাঞ্জেলা।
উত্তেজনায় পায়ের জখমটার ব্যথা বেড়ে গেল মনিকার। খোঁড়াতে খোঁড়াতে লনে জমে থাকা কাদাপানি মাড়িয়ে দুজনের পেছনে ছুটল। বাড়িতে ঢুকে দরজার একপাশে ছুঁড়ে ফেলল ছাতাটা। জোরে জোরে মাথা নেড়ে যেন ঝেড়ে ফেলতে চাইল জাস্টিনের লাশের ভয়াবহ দৃশ্য। বাতাস ঝাপটা মেরে বৃষ্টির পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে শরীর। অন্য দুজনকে ধরার জন্যে কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘরের দিকে এগোল সে।
দাঁড়িয়ে গেল রান্নাঘরের দরজায় এসে। মিটমিট করল আলো। নিভল না এবারেও।
দরজা থেকেই দেখল কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে আছে নিকি। ফোনের রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে।
'কি হলো?' পেপার টাওয়েল দিয়ে চশমার কাঁচ মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস

করল অ্যাঞ্জেলা।

'ডেড!' মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল নিকি।

'তারমানে পুলিশও ডাকতে পারব না?'

আস্তে মাথা নেড়ে রিসিভারটা ক্রেডলে নামিয়ে রাখল নিকি।

ঘরে ঢুকল মনিকা। এক এক করে দুজনের মুখের দিকে তাকাতে লাগল। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের। এক্ষুণি। জাস্টিনকে যে খুন করেছে, সে আমাদেরও ছাড়বে না। লাইনটা কেটে দিয়েছে সে, যাতে বাইরের কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারি আমরা।'

মাথার ওপরের ফ্লোরেসেন্ট লাইটের উজ্জ্বল আলোয় রক্তশূন্য দেখাচ্ছে অ্যাঞ্জেলার মুখ।

'যেভাবেই হোক শহরে পৌঁছতে হবে আমাদের,' আবার বলল মনিকা। 'পুলিশকে খবর দিতে হবে।' আতঙ্ক চেপে রাখতে পারছে না আর। গলা টিপে ধরছে যেন।

'কিন্তু মারা গেল কিভাবে জাস্টিন?' একটা উঁচু টুলের কিনার খামচে ধরল নিকি। 'খানিক আগেও দেখলাম। কি করে ঘটল এটা?'

বজ্রপাতের বিকট শব্দ চমকে দিল তিনজনকেই।

মনিকা বলল, 'হাঁটতে হবে, আর কোন উপায় নেই। আলমারিতে রেইনকোট পাওয়া যাবে নিশ্চয়।'

চুপ করে আছে অন্য দুজন।

'এ রকম রাতে লিফট পাব বলেও মনে হয় না,' বলল মনিকা।

'ওর মুখটা···এত ফুলল কি করে?' মনিকার কথায় কান নেই নিকির। জাস্টিনের কথা ভাবছে। 'এমন করে হাঁ হয়ে আছে যেন আতঙ্কে চিৎকার করতে করতে স্তব্ধ হয়ে গেছে।'

'নিকি! দোহাই তোমার, থামো!' আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার চেহারা।

'মন থেকে এখন জাস্টিনের ভাবনা দূর করো,' অ্যাঞ্জেলার সুরে সুর মেলাল মনিকা। 'এখন আমাদের একমাত্র চিন্তা হওয়া উচিত, এ বাড়ি থেকে বেরোনো। পুলিশের কাছে যাওয়া।'

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ক্ষণিকের জন্যে তীব্র আলোয় আলোকিত করে দিয়ে গেল জানালার বাইরেটা।

সামনের হলঘরে চলে এল ওরা। রেইনকোট পাওয়া গেল না। আলমারির এক তাকে একটা হলুদ স্নীকার পেল মনিকা। ওর গায়ে ছোট হবে। টেনেটুনে সেটাই পরে নিল। অন্য তাকে নিকি পেল একটা সিল্কের স্কার্ফ। আর কিছু না দেখে সেটাই মাথায় জড়িয়ে নিল। ভিজে চুপচুপে সোয়েটশার্টের ওপর হালকা নীল একটা জ্যাকেট পরল অ্যাঞ্জেলা।

'হয়েছে?' জানতে চাইল মনিকা।

'হয়েছে,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে নিকি।

'চলো,' দুই চোখে ভয়, চাপা দিতে পারছে না অ্যাঞ্জেলা।

সামনের দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিল মনিকা। ছড়ানো লন। সার্চলাইটের আলো এটাকেও আলোকিত করে রেখেছে। বৃষ্টি সামান্য কমেছে। তবে বজ্র-বিদ্যুৎ পাল্লা দিয়ে চলেছে সমান তালে।

'এসো,' পেছনে তাকিয়ে হাত নেড়ে দুই বান্ধবীকে ডাকল মনিকা।

বাইরে বেরিয়ে এল তিনজনে। বৃষ্টির মধ্যে মাথা নিচু করে দৌড় দিল। নরম ঘাসের মধ্যে পানিতে ডুবে গিয়ে পচাৎ-পচাৎ শব্দ তুলছে স্নীকার।

ঘাসের পর তারের বেড়া। অন্যপাশে সুন্দর করে ছাঁটা পাতাবাহারের বেড়া।

গেটের কাছে এসে হাতলে হাত দিতে গেল মনিকা।

'থামো!' চিৎকার করে উঠল নিকি। ঠেলা মেরে হাত সরিয়ে দিল মনিকার। মাথা থেকে ভেজা স্কার্ফটা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল গেটের ওপর। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছড়ছড় করে বিদ্যুতের স্ফুলিঙ্গ ছুটতে শুরু করল ওটার গা থেকে।

শিউরে উঠল মনিকা। 'মাগো, ভুলেই গিয়েছিলাম!' নিকির দিকে ফিরে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'থ্যাংকস!'

'এখন কি?' ককিয়ে উঠল অ্যাঞ্জেলা। 'বেরোব কি করে? ভেতর থেকে খোলা যাবে না। কন্ট্রোল বক্স কোথায় আছে তা-ও জানি না।'

'আটকাই পড়লাম,' বিড়বিড় করল নিকি।

'সকালের আগে আর বেরোতে পারব না,' ধাতব পাল্লাটার দিকে তাকিয়ে আছে মনিকা। 'সকালে বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ হবে, তারপর...'

'কিন্তু ততক্ষণ খুনী কি চুপ করে বসে থাকবে?' প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল অ্যাঞ্জেলা।

তেইশ

স্পটলাইটের ওপর রুপার কণার মত ঝরে পড়ছে যেন বৃষ্টির ফোঁটা। অনেক ওপরে আকাশের গায়ে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে।

'কন্ট্রোলটা খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের,' নিকি বলল। 'বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা নিশ্চয় আছে।'

'কিন্তু জাস্টিন বলেছিল অটোম্যাটিক, মনে নেই?' ঝাঁকি দিয়ে চশমার কাঁচ থেকে পানি ফেলল অ্যাঞ্জেলা। 'টাইমার লাগানো।'

'তাহলে টাইমারটাই খুঁজে বের করতে হবে,' বলল নিকি।

'বেসমেন্টে থাকতে পারে,' কেঁপে উঠল মনিকা।

'আর যেখানেই যেতে বলো যাব,' অ্যাঞ্জেলা বলল, 'কিন্তু আমি বেসমেন্টে নামছি না! ট্র্যাপডোর আটকে দিয়ে তারপর খুন করবে!'

একটা বুদ্ধি এল মনিকার মাথায়। 'পেছনের গেট দিয়ে বেরোতে পারি।

গেটের পাশে ওখানে একটা বক্সের মধ্যে কন্ট্রোল সুইচ আছে। জাস্টিন সো ওখান থেকেই সুইচ অফ করেছিল।'

'সাগরে নেমে যেতে বলছ?' তীক্ষ্ণ হয়ে গেল অ্যাঞ্জেলার কণ্ঠ। 'এই তুফানের মধ্যে!'

'সাগরে নামতে যাব কেন?' হলুদ স্লিকারটা দিয়ে মাথা ঢাকল মনিকা। 'পেছনের গেট দিয়ে বাইরে বেরিয়ে বেড়ার কিনার ঘেঁষে ঘেঁষে চলে আসব সামনের দিকে।'

'হ্যাঁ,' নিকি বলল, 'এটা মন্দ হয় না।'

'পেছনের গেটের বিদ্যুৎ-প্রবাহ সত্যি বন্ধ করা যাবে তো?' সন্দেহ যাচ্ছে না অ্যাঞ্জেলার।

'চেষ্টা তো করে দেখতে হবে।' ঘুরে দাঁড়াল মনিকা। পা বাড়াল।

বৃষ্টি আবার বেড়েছে। তার মধ্যে মাথা নিচু করে ছুটল ওরা। নরম কাদায় স্নীকার ডুবে গিয়ে আগের মতই শব্দ হতে লাগল। ধুড়ুস করে আছাড় খেল নিকি। তাড়াতাড়ি টেনে তুলল আবার নিজেকে।

বাড়ির পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। বাঁধানো চত্বরে শব্দ তুলে আছড়ে পড়ছে বৃষ্টির ফোঁটা। ছাত থেকে পানি পড়ার নল দিয়ে ঝর্নার মত পানি ঝরছে।

'ছাউনিটার পাশ দিয়ে যেতে হবে নাকি?' ভয়ে ভয়ে জানতে চাইল অ্যাঞ্জেলা।

'না, গেস্ট হাউজের পাশ ঘুরে যাব।' পায়ের ক্ষতটায় যেন আগুন ধরে গেছে মনিকার। প্রতিবার পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ব্যথা যেন ঝলকানি দিয়ে উঠে আসছে মগজে।

কি যেন বলল নিকি। বৃষ্টির জন্যে শোনা গেল না।

গেস্ট হাউজের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা, এই সময় আড়াল থেকে বেরিয়ে এল একটা ছায়ামূর্তি।

অস্ফুট শব্দ বেরোল মনিকার মুখ থেকে।

বরফের মত জমে গেল যেন তিনজনে।

ছায়ামূর্তির পরনে ট্রেঞ্চকোট। কোমরের কাছের ফিতেটা কষে বাঁধা। মাথার চওড়া কানাওয়ালা স্ট্র-হ্যাটে ঢাকা পড়েছে মুখ।

হাতের চকচকে জিনিসটা চিনতে অসুবিধে হলো না কারোরই।

পিস্তল!

হ্যাটের সামনের কানা ঠেলে ওপরে তুলে দিল ছায়ামূর্তি। স্পটলাইটের আলোয় ধকধক করে জ্বলছে নীল চোখ।

'জাস্টিন!' গলায় দম আটকে গেল নিকির। কোনমতে বাকি কথাটা শেষ করল, 'জাস্টিন...তুমি না মরে গিয়েছ!'

চব্বিশ

বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে অহেতুক ভিজতে চাইল না জাস্টিন। পিছিয়ে গিয়ে গেস্ট হাউজের চালার নিচে দাঁড়াতে বলল ওদের। হাতের উদ্যত পিস্তল আলোয় চকচক করছে। কোমরের কাছে তুলে ধরে রেখেছে সে। তিক্তকণ্ঠে বলল, 'অবাক হয়েছ, তাই না?'

'তোমাকে ছাউনিতে পড়ে থাকতে দেখে এলাম,' মিনমিন করে বলল মনিকা। 'আমরা ভেবেছিলাম...'

'মরে গেছি?' তিক্ত হাসি ফুটল জাস্টিনের ঠোঁটে। 'তুমি তো ভূত বিশ্বাস করো, মনিকা। ধরে নাও, আমি একটা ভূতই।'

এক পা এগোল মনিকা। পিস্তলটার দিকে চোখ। শীতল ভয় চেপে ধরতে আরম্ভ করেছে ওকে। 'ওটা সরাও...'

কানফাটা শব্দে বাজ পড়ল। পিঠে এসে ঝাপটা মারছে বাতাস।

'সবাই মনে হচ্ছে বোকা হয়ে গেছ?' হাসি খেলা করছে জাস্টিনের ঠোঁটে। বৃষ্টি-ভেজা আলোয় চকমক করছে তার নীল চোখ। 'সরানোর জন্যে এনেছি নাকি?'

'তোমাকে বেঁচে থাকতে দেখে খুব ভাল লাগছে আমার,' নিকি বলল।

'কিন্তু যাকে দেখছ ভেবে আনন্দ লাগছে সেই জাস্টিন তো বেঁচে নেই,' কঠিন গলায় বলল জাস্টিন। 'মারা গেছে। সাত দিন আগে ওকে খুন করেছি আমি। তোমরা আসার আগেই।'

'কি বলছ?' চেঁচিয়ে উঠল মনিকা।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল নিকিও। অ্যাঞ্জেলা কেবল বরফ হয়ে রইল। তার চোখ আটকে রয়েছে পিস্তলটার ওপর।

'বিশ্বাস হচ্ছে না?' জাস্টিন বলল। 'কেন, গন্ধ পাওনি? জাস্টিনের লাশ থেকে পচা দুর্গন্ধ?' এভাবে বলতেও যেন খুব মজা পাচ্ছে সে।

আচমকা দুর্বল লাগল মনিকার। পা দুটো যেন আর ধরে রাখতে পারছে না শরীরটা। মাথার মধ্যে চাপ দিচ্ছে রক্ত।

'ঠিকই বলছি আমি,' ওদের চুপ করে থাকতে দেখে বলল জাস্টিন। 'আমি জাস্টিন নই। শারমিন।' হ্যাটটা খুলে জমে থাকা পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল সে। সোনালি চুলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে মুখের ওপর। মনিকার দিকে তাকিয়ে আছে জ্বলন্ত দুই চোখের তারা। 'আমি শারমিন। মৃত্যুর জগৎ থেকে ফিরে এসেছি। এখন আমি বেঁচে আছি, জাস্টিনই মৃত। অবাক লাগছে? খুউব?'

নির্বাক হয়ে শারমিনের দিকে তাকিয়ে আছে অন্য তিনজন। কেউ নড়ছে না।

মিটমিট করে উঠল স্পটলাইট।

শক্ত করে পিস্তলটা ধরে নিকির দিকে তাক করল শারমিন।

'সবাই এমন চুপ করে আছ কেন?' বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে রাগে চিৎকার করে উঠল শারমিন। 'ক্যাম্পে তো এমন ছিলে না! বলো, কথা বলো। ছলবল করে কথা বলো। খলখল করে হাসো।'

'কিন্তু, শারমিন…' বলতে গেল মনিকা।

'অন্ধকার লাগছে? প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছ না? দাঁড়াও, তোমাদের আলোয় নিয়ে আসছি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল শারমিন। 'আমি যে বেঁচে আছি একথা জাস্টিনও জানত না। ও ভেবেছিল সেদিন ডিয়ার ক্রীকেই মারা গেছি আমি। গত সপ্তাহে এখানে এসে ওকে খুন করার আগে কল্পনাও করেনি আমি বেঁচে আছি।'

'কিন্তু কেন?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল নিকি, 'কেন ওকে খুন করলে?'

'কারণ ও আমাকে খুন করতে চেয়েছিল। ডিয়ার ক্রীকে হই-চই শুনে তোমরা যখন দৌড়ে পালালে, জাস্টিনের চেহারাটাই শেষ নজরে পড়েছে আমার। বনের কিনার থেকে আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। হাসিমুখে!'

'হাসবে কেন? তুমি মরে গেছ ভেবে ও তো পাথর হয়ে গিয়েছিল!' প্রতিবাদ করল মনিকা।

'ভুল, সব ভুল!' চিৎকার করে উঠল শারমিন, 'ওকে তোমরা চিনতে পারোনি। ঠাণ্ডা মাথায় প্ল্যান করে খুন করতে চেয়েছিল আমাকে। আমার গোঁয়ার্তুমিকে কাজে লাগিয়ে, কৌশলে। আমাকে উত্তেজিত করে ডিয়ার ক্রীকে পাঠিয়েছিল। রাতে যে আমরা যাব ওখানে একথা জানিয়ে কাউন্সেলরের টেবিলে গোপন নোট রেখে দিয়েছিল। নিচে নামটাম কিছু দেয়নি। ইচ্ছে করে বনের মধ্যে ধরা দিয়েছিল কাউন্সেলরের হাতে। আমি যখন গাছটা পেরোতে যাব, ওই সময় হই-হট্টগোলের ব্যবস্থা করেছিল, যাতে আমি তাড়াহুড়া শুরু করি। ও জানত, ঘাবড়ে গেলে আমি নিচে পড়ে যাবই। মারা পড়ব।

'খুনের কি সাংঘাতিক প্ল্যান, তাই না? কেউ বুঝতে পারবে না কিছু। সবাই ধরে নেবে অ্যাক্সিডেন্ট।…আমার দুরবস্থা দেখে তখন হাসছিল জাস্টিন! আমার জন্যে মায়া হয়নি ওর। আমার জন্যে আমাদের পরিবারের কারও কোন মাথাব্যথা নেই, মায়া নেই। আমি মরলাম কি বাঁচলাম কারও কিছু যায় আসে না।

'ঝর্নার পানিতে বহুদূর ভেসে গিয়েছিলাম সেদিন। একটা লোক মাছ ধরতে এসেছিল। দেখতে পেয়ে টেনে তুলল আমাকে। শরীরের অর্ধেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল আমার। আধমরা হয়ে গিয়েছিলাম। বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাকে বাঁচাল সে। ওর পরিবারের সবাই এত আদরযত্ন করল আমাকে, নতুন জীবনের স্বাদ পেলাম। নিজের বাড়িতে অবহেলার মধ্যে আর ফিরে আসতে ইচ্ছে করল না। বনের মধ্যে ওদের কাছেই থেকে যাব ঠিক করলাম। ভান করলাম, অ্যামনেশিয়া হয়েছে…'

'কি করলে?' অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে শারমিনের দিকে তাকিয়ে আছে নিকি।

'অ্যামনেশিয়া। স্মৃতি হারানোর ভান। ভাবলাম, তাতে করে আমার অতি জঘন্য পরিবারটার কাছে আর ফিরে যাওয়া লাগবে না। ভাবলাম, নতুন করে জীবন শুরু করার এটাই আমার সুযোগ। কোন পরিবারে আনন্দের সঙ্গে বাস করার, জীবন যাপন করার সুযোগ। সুতরাং অভিনয় করে যেতে লাগলাম। আমি কে, কি আমার নাম, কি পরিচয়, কিছুই জানি না। রয়ে গেলাম ওদের কাছে।'

'তোমার বোন তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল, সেজন্যে তাকে খুন করে প্রতিশোধ নিয়েছ, বুঝলাম। কিন্তু আমরা কি করেছি? আমাদের খুন করতে চাইছ কেন?' মনিকার প্রশ্ন।

'তোমাদেরও ঘৃণা করি আমি,' মাটিতে থুতু ফেলল শারমিন। 'গত এক বছরে তোমাদেরকে মন থেকে দূর করতে পারিনি আমি। তাড়াতে পারিনি জাস্টিনের হাসি। গাছের ওপর থেকে আমি যখন পড়ে যাচ্ছিলাম, ওর মুখে ছিল শয়তানী হাসি। ভয়ঙ্কর সে হাসি। তখনই ঠিক করে ফেলেছিলাম, ফিরে আসতে পারলে খুন করব ওকে।

'কয়েক দিন আগে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এখানে এসে ঢুকলাম। আব্বা-আম্মা নেই। জানতাম, থাকবে না। ওরা কখনও বাড়ি থাকে না। নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, দুনিয়ার আরও কারও দিকে কোন খেয়াল নেই। অমানুষ! কায়দামত পেলে ওদেরকেও ছাড়ব না আমি! বাড়িতে ঢুকে প্যানট্রিতে লুকিয়ে রইলাম। হিউগির কাছে জাস্টিনকে বলতে শুনলাম, তোমাদের দাওয়াত করেছে সে।'

শয়তানি হাসি হাসল শারমিন। 'শুনে কি যে ভাল লাগল আমার বলে বোঝাতে পারব না। ভাগ্য খুব ভাল। একেবারে সময়মত এসেছি। সব কটাকে একসঙ্গে হাতে পাব। প্রথম সুযোগেই জাস্টিনকে খুন করে ছাউনিতে লুকিয়ে রাখলাম। ওর জায়গায় আমি সেজে বসলাম জাস্টিন। বুড়ো হিউগি গাধাটা কানা, চোখেও দেখে না ঠিকমত, চিনতেই পারল না আমাকে। তারপর আর কি? হাতের মুঠোয় পেয়ে গেলাম তোমাদের। মরার আগে আর কিছু জানার ইচ্ছে আছে?'

'কেঁচো আর জোঁক ফেলাটা তাহলে তোমারই কাজ?' বিদঘুটে প্রাণীগুলোর কথা ভাবতে গিয়ে মুখ বাঁকাল নিকি।

খিকখিক করে হাসল শারমিন, 'তাতে কোন সন্দেহ আছে? তোমাকে চিৎকার করে গলা ফাটাতে দেখে কি যে ভাল লাগছিল আমার…'

'পিস্তলটা সরাও, শারমিন, প্লীজ!' অনুরোধ করল মনিকা।

'কি যে বলো!' হাসি মুছে গেল শারমিনের। পিস্তলধরা হাতটা উত্তেজনায় কাঁপছে। 'সরানোর জন্যে তুলেছি নাকি?'

'শারমিন! শোনো…'

'থামো! কিসের বিনিময়ে অনুকম্পা ভিক্ষা করছ আমার কাছে?' ভয়ানক রাগে চিৎকার করে উঠল শারমিন। 'তোমরাও তো আমাকে বাঁচাওনি।

পালিয়ে গিয়েছিলে। বদমাশ কাউন্সেলরটার ভয় ত্যাগ করে উঠে আসতে পারতে আমাকে সাহায্য করার জন্যে। কিন্তু বাঁচানোর বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করলে না। আমার জন্যে তোমাদেরও এতটুকু মায়া হয়নি।'

প্রচণ্ড আবেগে ফুঁপিয়ে উঠল শারমিন। সামলে নিয়ে পিস্তল তুলল। 'থাক, কারও কাছে করুণা ভিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই আমার আর। সেদিন ছিল তোমাদের, আজ আমার পালা। তোমাদের মরতে দেখে আমি আনন্দ পাব।' পিস্তলটা এক এক করে তাক করল সবার ওপর। চোখের পাতা সরু হয়ে এল। ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে আগে মরতে চাও? মনিকা, ক্যাম্পে সব সময় তুমি আগে থেকেছ। এখানেও তুমিই আগে যাও, কি বলো?'

মনিকার দিকে পিস্তল স্থির করল সে।

পঁচিশ

বিদ্যুৎ চমকাল। বাজ পড়ল। এত কাছে, মনে হলো টেনিস কোর্টটার ওপর পড়েছে। কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড় হলো।

বজ্রপাতের শব্দ শুনে মনিকা ভাবল, গুলি করেছে।

মাটি কাঁপিয়ে দিল ভয়াবহ শব্দ।

কিন্তু বুলেট ঢোকার ব্যথা টের পেল না মনিকা। কপালের ওপর থেকে ভেজা চুল সরিয়ে, হাত দিয়ে কপালের পানি মুছে শারমিনের পিস্তলটার দিকে তাকাল।

ঠিক এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল গেস্ট হাউজের দরজা। মাথায় হুড পরা আরেকটা ছায়ামূর্তি আলোয় বেরিয়ে এল।

চোখ মিটমিট করে চোখের পাতা থেকে বৃষ্টির পানি ফেলতে ফেলতে মনিকা দেখল, হুডটা আলাদা নয়। কালচে-নীল উইন্ডব্রেকারে লাগানো মাথা ঢাকার ঢাকনা। মূর্তির গায়ে উইন্ডব্রেকার। পরনে একই রঙের জিনসের প্যান্ট।

ঝোড়ো বাতাস প্রবল এক ঝাপটা মেরে খুলে ফেলল ওর হুড। বেরিয়ে পড়ল কালো কোঁকড়া চুল। কালো একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চোখ।

চিনতে পারল ওকে মনিকা। সেই ভূতটা!

'অলিভার!' চিৎকার করে উঠল সে।

হাঁ হয়ে গেল শারমিনের মুখ। পিস্তল ঘোরাল ভূতের দিকে। 'কে তুমি?'

জবাব দিল না ভূতটা। দৃঢ় পায়ে এগোল শারমিনের দিকে। কালো চোখের দৃষ্টি নীল চোখের তারায় স্থির।

'কে তুমি?' আবার জানতে চাইল শারমিন।

আরেক পা আগে বাড়ল ভূতটা।

'দেখতে পাচ্ছ না কে?' চেঁচিয়ে বলল মনিকা। 'ভূত! গেস্ট হাউজের ভূত! সত্যিই আছে ওটা!'

'ভূত না ছাই!' রেগে উঠল শারমিন। 'বানিয়ে বলেছি আমি। গেস্ট হাউজে কোনকালে কোন ভূত ছিল না।'

আরেক পা আগে বাড়ল অলিভার। শারমিনের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাচ্ছে না। বৃষ্টির পানি স্রোতের মত গড়িয়ে নামছে উইন্ডব্রেকার বেয়ে।

'সরো! সরে থাকো বলছি!' দ্বিধায় পড়ে গেছে শারমিন। তার রাগ আতঙ্কে রূপ নিতে দেরি হলো না। 'কাছে এসো না! গুলি মেরে দেব কিন্তু!'

শুনল না ভূতটা। সামান্যতম থমকাল না। একনাগাড়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

আবার হুমকি দিল শারমিন।

কিন্তু ভূতের কানে ঢুকল না যেন তার কথা।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে আচমকা ডাইভ দিল অলিভার। কোমর জাপটে ধরে ওকে নিয়ে পড়ল ঘাসের ওপর। ট্রিগারে চাপ লেগে গুলি বেরিয়ে গেল। কারও গায়ে লাগল না গুলিটা।

চিত হয়ে পড়ল শারমিন। তার গায়ের ওপর অলিভার। পিস্তলধরা হাতটা লম্বা হয়ে আছে একপাশে। শারমিন ওটা ঘুরিয়ে অলিভারকে তাক করার আগেই নড়ে উঠল দ্বিধাগ্রস্ত মনিকা। দৌড়ে গিয়ে শারমিনের হাত থেকে পিস্তলটা কেড়ে নিল।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল। আবার বাজ পড়ল। মিটমিট করেও আর উজ্জ্বল হলো না এবার স্পটলাইট। নিভে গেল।

গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল চতুর্দিক।

বাড়ির দিকে তাকাল মনিকা। কোথাও আলো নেই। ইলেকট্রিসিটি ফেল করেছে।

মাটিতে ধস্তাধস্তির শব্দ। কানে এল শারমিনের চিৎকার, 'ছাড়ো! ছেড়ে দাও!'

যন্ত্রপাতি রাখার ছাউনিতে ভটভট করে চালু হয়ে গেল একটা স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর। কয়েক সেকেন্ড পর আলো জ্বলে উঠল আবার। সেই আলোয় দেখা গেল, শারমিনকে কাবু করে ফেলেছে অলিভার। বুকের ওপর বসে দুই হাত চেপে ধরেছে। মনিকাদের দিকে ফিরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'একটা দড়ি নিয়ে এসো! কুইক!'

★

'আমি ভূতও নই, অলিভারও নই,' হাসিমুখে বলল ছেলেটা।

গেস্ট হাউজে ঢুকে পড়েছে সবাই। শারমিনকে বেঁধে একপাশে ফেলে রাখা হয়েছে। উন্মাদ বনবিড়ালীর দৃষ্টি ওর চোখে।

'তাহলে কে তুমি?' জানতে চাইল মনিকা।

'আমি কিশোর পাশা। গোয়েন্দা।'

চমকের পর চমক। ধাক্কার পর ধাক্কা। বিমূঢ় হয়ে গেল যেন তিন বান্ধবী।

'কে!' কিশোরের কথা শুনতেই পায়নি যেন মনিকা।

'কিশোর পাশা। চিনতে পারছ না? সৈকতে মুসা আর রবিনের সঙ্গে যাকে দেখেছ। বোর্ডওয়াকে ফেরিস হুইলে তোমার পাশে আমিই বসেছিলাম। জলজ্যান্ত একজন মানুষ।'

বিমূঢ়তা কাটতে সময় লাগল ওদের।

নিকি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এখানে এলে কি করে?'

'হিউগি আঙ্কেল নিয়ে এসেছে।'

'কেন?'

শারমিনের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'ওর তো ধারণা ছিল, বুড়ো হিউগি কানা, বোকা লোক, চোখে দেখে না, বুঝতেও পারবে না কিছু। কিন্তু এত বছর ধরে এ বাড়িতে আছে। জাস্টিনকে দেখছে। শারমিনকে দেখেছে। শারমিনের আচার-আচরণে সন্দেহ করে বসল সে। তাকে ফাঁকি দিতে পারেনি শারমিন। আমাকে চেনে হিউগি আঙ্কেল। রকি বীচে বাড়ি। ফোন করে তার সন্দেহের কথা জানাল। অনুরোধ করল, এখানে এসে রহস্যটার তদন্ত করার জন্যে। চলে এলাম আমার দুই সহকারী মুসা আর রবিনকে নিয়ে। বুঝলাম, শারমিনের ওপর নজর রাখতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাকে। হিউগি আঙ্কেলের সহায়তায় গেস্ট হাউজে লুকিয়ে থেকে শুরু করলাম তদন্ত। তোমাদেরকে ভূতের গল্প বলে আমাদের তদন্তের সুবিধে করে দিয়েছে শারমিন। কাকতালীয় ঘটনা প্রচুর ঘটে পৃথিবীতে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সুযোগটা লুফে নিলাম। ভূত সেজে মনিকার সঙ্গে দেখা করে তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করলাম। বাইরে থেকে আমাকে সাহায্য করে চলল মুসা আর রবিন। দিন-রাত প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই এ বাড়ির ওপর নজর রাখতে লাগল ওরা। ওয়াকি-টকিতে যোগাযোগ রেখেছে আমার সঙ্গে।

'আজ একটু আগে জাস্টিনের লাশটা আবিষ্কার করেছি। কুকুরটা ছিল এক মস্ত বাধা। ওটার যন্ত্রণায় রাতে বেরোতেই পারতাম না। বেরোতে পারলে আরও আগেই জাস্টিনের লাশ পেয়ে যেতাম। রাতে আটকে রাখলে শারমিনের সন্দেহ হতে পারে, এজন্যে কুকুরটাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হত হিউগি আঙ্কেল। দিনে ওটা আটকা থাকলেও চোখে পড়ার ভয়ে তল্লাসি চালানোর উপায় ছিল না আমার।...আজ ওটাকে না দেখে বেরিয়েছিলাম। দুর্গন্ধ পেয়ে এগিয়ে গেলাম ছাউনির দিকে...'

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল। কান পাতল কিশোর। কিছুক্ষণ শোনার পর বলল, 'ওই যে, পুলিশ নিয়ে আসছে মুসা আর রবিন। লাশটা পাওয়ার পর পরই ওদের চলে যেতে বলেছিলাম।'

কান পেতে মনিকাও শুনল সাইরেনের শব্দ। তারপর মাথা দুলিয়ে বলল মনিকা, 'হুঁ, সৈকতে তাহলে তুমিই আমাকে বাঁচিয়েছিলে। গা এত ঠাণ্ডা করেছিলে কিভাবে? গা ঠাণ্ডা না থাকলে ভূতের ধারণাটা ধোঁকায় ফেলত না আমাকে।'

'কেন, তোমাদের যখন স্রোত থেকে উদ্ধার করল মুসা আর রবিন, তখন তোমাদের গা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি? এমনিতেই এখানকার সাগরের পানি অতিরিক্ত ঠাণ্ডা। ঘণ্টাখানেক থাকলে বরফের মত শীতল হয়ে যায় শরীর। গরমকালে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে পানিতে নামলে মনে হয় এয়ারকুলার লাগানো ঘরে ঢুকলাম।'

ঠোঁট কামড়াল মনিকা। এক আঙুল তুলল, 'আর একটা প্রশ্ন। দুপুরবেলা পানিতে ভিজে নাহয় শরীর ঠাণ্ডা করেছিলে, বুঝলাম। বোর্ডওয়াকে হাত এত ঠাণ্ডা ছিল কেন?'

হাসল কিশোর। 'তোমাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে হাতে বরফ ঘষে নিয়েছিলাম। কারণ তুমি তখন বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছ, অলিভার নামের ভূতটা সত্যি সত্যি বাস করে জাস্টিনদের গেস্ট হাউসে।'

★ ★ ★

রাত্রি ভয়ঙ্কর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

চাঁদের আলোয় ধূসর দেখাচ্ছে বিশাল কবরফলকটা। ধারগুলো ক্ষয়া, কোণা ভাঙা। সামান্য একটু বাদে ছত্রাকে ছেয়ে আছে প্রায় পুরো পাথরটাই। একটা লাইন কেবল কোনমতে পড়া যায়–

মৃত্যু: অক্টোবর ৪, ১৮৯৮

তাড়াতাড়ি ওটার পাশ কাটিয়ে চলে যেতে চাইল মুসা। হাত টেনে ধরল কিশোর, 'দেখো, একশো বছর আগে ঠিক আজকের দিনে মারা গিয়েছিল লোকটা।'

ফলকের আরও কাছে সরে এল কিশোর। ভালমত দেখার জন্যে এক গোড়ালিতে ভর দিয়ে হাঁটু ভাঁজ করে বসল কাছে। টর্চের গোল ছায়া ছায়া হলুদ আলোয় আরও রহস্যময় লাগল ওটাকে।

নেকড়ের প্রলম্বিত ডাকের মত তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বাতাস বইছে। মুসার মনে হলো যেন প্রেতের দীর্ঘশ্বাস। শীত শীত লাগল। জ্যাকেটের চেন তুলে দিল আরও। কাছেই কোথাও খসখস করল কিসে যেন। তারপর পাথর নড়ানোর শব্দ। কফিনের ঢাকনা সরিয়ে বেরিয়ে আসছে নাকি···বাপরে! ভাবতে চাইল না আর।

ব্ল্যাকফরেস্টের এই গোরস্থান কয়েকশো বছরের পুরানো। দিনের বেলায়ও ঢুকতে চায় না কেউ। আর রাত দুপুরে সেখানে ঢুকে কবর নিয়ে রীতিমত গবেষণা করছে–ব্যাপারটা ভাবতেও কেমন লাগছে মুসার। বিশ্বাস হতে চাইছে না।

কিশোরের কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকি দিল মুসা। 'কি ভাবছ? ওঠো না!'

ফিরে তাকাল কিশোর। সরল না আগের জায়গা থেকে। ওর কালো চোখ চাঁদের আলোয় চকচক করছে। ধসে পড়া পাথরগুলোর দিকে টর্চের আলো নাচিয়ে বলল, 'ভাবছি, কারা শুয়ে আছে ওসব কবরের তলায়!'

'যারা এই এলাকায় প্রথম বসতি করতে এসেছিল, তারা,' মুসা বলল। 'বহু বছর হলো, কাউকে কবর দেয়া হয় না আর এখানে।'

এসব তথ্য কিশোরেরও জানা। তাই এ নিয়ে আর বিশেষ মন্তব্য করল না। 'গা ছমছম করে বটে, তবে জায়গাটা বেশ সুন্দরও লাগছে চাঁদের আলোয়। এই পরিবেশে মনে হওয়া স্বাভাবিক, ভয়ঙ্কর সেই গল্পগুলোর উৎপত্তি বুঝি এখান থেকেই হয়েছিল–ওই যে, কবর থেকে বেরিয়ে আসা জীবন্মৃত ভূত, জিন্দালাশের গল্প।'

'খাইছে! কিশোর, দোহাই তোমার, জলদি চলো এখান থেকে! আমার

হাত-পা জমে গেল…'

ঝাপটা দিয়ে গেল ঝোড়ো বাতাস। কেঁপে উঠল কিশোর। উঠে যাওয়া কোটের কোণা টেনে নামিয়ে দিল। আবার হাঁটতে শুরু করল দুজনে।

সারি সারি কবরফলকের পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সরু রাস্তাগুলো বড় বড় ঘাসে ঢেকে গেছে এখন। পা ফেললেই রাস্তার খোলা ইঁট অদ্ভুত শব্দ করে, যেন মটমট মটমট করে শুকনো, ক্ষয়ে যাওয়া হাড় ভাঙতে থাকে। বাতাসের ঝাপটায় মড়মড় করে ভেঙে গেল গোড়াপচা একটা ডাল। এ থেকেই বোঝা যায় কি প্রবল বেগে বইছে বাতাস।

আড়চোখে কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। ভাবল, রোমাঞ্চকর এসব শব্দ কি ঠিকমত শুনতে পাচ্ছে কিশোর? শোনার কথা নয়। এক কানে ফোঁড়া হয়ে ফেটে গিয়েছিল, কয়েক দিন বেশ ভুগিয়েছে তাকে। একটাতে কোন গণ্ডগোল হলে আরেকটাও নাকি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ডাক্তার বলে দিয়েছেন, কিছুদিন কানে কম শুনবে কিশোর। যেই অসুবিধের কথাটা শুনল, ভড়কে যাওয়া দূরে থাক, নতুন এক বুদ্ধি ঢুকল মাথায়–লিপ রীডিং শিখবে। তার কথা, 'কপালগুণে কানে কম শোনার বাধ্যতামূলক রোগটা' যখন হয়েই গেল, সুযোগটা কাজে লাগানো উচিত। যারা কানে খাটো, তাদের কি কি সুবিধে-অসুবিধে, সেটাও এই সুযোগে জেনে নেয়া যাবে। ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে ফিরেই চান্স পেয়ে মুসা আর রবিনের ওপর ভারী একখানা দার্শনিক উক্তিও ঝেড়ে দিল–সব মন্দের মাঝেই লুকিয়ে থাকে ভালর সম্ভাবনা…

'আরে, ওদিকে যাচ্ছ কেন?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

রাস্তা দিয়ে এগোলে অনেক ঘুরে যেতে হবে, তাই শর্টকাট ধরেছে কিশোর। মুসার তাতে ঘোর আপত্তি থাকলেও কিছু করতে পারল না। কিশোরের বক্তব্য, কবরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়া আর ভেতর যাওয়ার মধ্যে কোন তফাত নেই। যেভাবে গেলে তাড়াতাড়ি হয় সেটাই করা উচিত।

গোরস্থানের দেয়ালের বাইরে বনের প্রান্তে দেখা যাচ্ছে বিশাল পুরানো বাড়িটা। গ্রেভ ম্যানশন। দুই পাশে লম্বা লম্বা গাছ। দূর থেকে দেখে মনে হয় বাতাসে ডাল নড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাও বুঝি কাঁপছে। এটা অবশ্য এক ধরনের দৃষ্টিবিভ্রম, জানা আছে ওদের। তারপরেও নিজের অজান্তেই চলার গতি বেড়ে গেল মুসার।

'এহ্হে! এই, দাঁড়াও একটু…'

'কি হলো?' চমকে গেল মুসা।

'মুখোশটা কোথায় যেন পড়ে গেছে।'

'পকেটেই তো রাখলে দেখলাম…'

'হ্যাঁ, তাই তো রেখেছিলাম। পড়ল কোথায়?'

'ওই ফলকটার কাছে নয় তো? বসলে যখন…'

'ঠিক বলেছ। দাঁড়াও, দেখে আসি।'

টর্চের আলো ফেলে দেখতে দেখতে পেছনে ফিরে চলল কিশোর।

'আস্তে যাও। অত তাড়াহুড়া করলে…' বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা।

অহেতুক। শুনতে পাবে না কিশোর। শোনাতে হলে চিৎকার করতে হবে। এই কবরস্থানের মধ্যে চিৎকার করার সাহস হলো না ওর। যেন বহুশত বছর আগে মরে যাওয়া লাশগুলোর ঘুম ভেঙে যাবে তাতে।

ফলকটার কাছে গিয়ে নিচু হলো কিশোর। শরীরের বেশির ভাগটাই অদৃশ্য হয়ে গেল ফলকের আড়ালে। চিৎকার করে জানাল, 'পেয়েছি।'

ওর কাছে যেতে অস্বস্তি বোধ করছে মুসা। এই কবরস্থানে কোন কিছুরই কোন বিশ্বাস নেই। বেশিক্ষণ ওই ফলকের আড়ালে থাকলে কিশোরও যে ভূত হয়ে যাবে না, কে নিশ্চয়তা দেবে! অতএব ঝুঁকি নেয়া যায় না। সাবধান থাকা দরকার। ফলকটার দিকে চোখ রেখে এগোতে গিয়ে শ্যাওলায় ঢাকা আরেকটা পিচ্ছিল ফলকে পা দিয়ে ফেলল। গেল পিছলে। সোজা হতে না হতেই তীক্ষ্ণ এক চিৎকারে প্রায় মূর্ছা যাবার জোগাড় হলো ওর।

'কিশোর!' বলে দিল এক চিৎকার। কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড়। লাফ দিয়ে গিয়ে পড়ল ফলকের অন্যপাশে।

কালো সিল্কের মুখোশ থেকে তখন বালি আর কুটো ঝাড়ছে কিশোর। মুসার অবস্থা দেখে অবাক। 'কি হয়েছে?'

'একটা চিৎকার শুনলাম···' বলেই থেমে গেল মুসা। আবার শোনা গেল চিৎকারটা। 'ও-ও-ওই তো! শুনলে!'

'কি শুনলে?'

'আরে এই ধ্যান্দাকে নিয়ে হয়েছে আরেক জ্বালা! কানেও শোনে না···' কি শুনেছে কিশোরকে বোঝানোর জন্যে চিৎকার করতেই হলো মুসাকে। কোন লাশের ঘুম ভাঙল কিনা তাতে, বুঝতে পারল না।

'কোন্ দিকে?' জানতে চাইল কিশোর।

হাত তুলে গেটের দিকটা দেখাল মুসা।

'চলো, দেখে আসি।'

'ওরিব্বাপরে! আমি পারব না!'

'এসো তো!' মুসার হাত ধরে টান দিল কিশোর।

টর্চ হাতে সাবধানে গেটের দিকে এগোল সে। পেছন পেছন চলল মুসা।

গেটের কাছাকাছি আসতেই ছায়া থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল কালো পোশাক পড়া লম্বা এক ছায়ামূর্তি। রাস্তা জুড়ে দাঁড়াল।

অস্ফুট একটা শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। লাফ দিয়ে তার পাশে চলে এল মুসা।

সামনে মূর্তিমান এক বিভীষিকা। কালো পোশাকটা শতচ্ছিন্ন। পচে, গলে খসে খসে পড়ছে মুখের মাংস আর চামড়া। হাতের মাংস খসে গিয়ে হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

বাস্তবে এই ঘটনা ঘটছে, নাকি দুঃস্বপ্ন! কাঁপতে আরম্ভ করেছে মুসা। আর কোন উপায় না দেখে বাড়ি মারার ভঙ্গিতে তুলে ধরল টর্চটা। যদিও বুঝতে পারছে, সাধারণ টর্চের বাড়িতে কিছুই হবে না কবর থেকে উঠে আসা ওই দানবের।

কিন্তু হয় কিনা প্রমাণ করার আগেই হাত তুলল দানবটা। একটানে খুলে ফেলল মুখোশ। বেরিয়ে পড়ল জিম গিলবার্টের হাসিমুখ।

'কি বুঝলে?' হাসতে হাসতে বলল সে। 'দেখো তো হাত দিয়ে, প্যান্টটা শুকনো আছে নাকি?'

'ইকটুও ভয় পাইনি,' স্বাভাবিক হওয়ার ভঙ্গি করলেও গলার কাঁপুনি থামাতে পারছে না মুসা। 'দেখেই বুঝেছিলাম তুমি ছাড়া আর কেউ না।'

হা-হা করে হাসল জিম। রবারের কনুই ঢাকা দস্তানাটাও খুলে নিল। বেরিয়ে পড়ল স্বাভাবিক হাত। 'সে তো বটেই, সে তো বটেই,' দস্তানা নাড়তে নাড়তে বলল সে, 'ইকটুও ভয় পাওনি, আহারে! মুখোশ খুলতে আর কয়েকটা সেকেন্ড দেরি করলেই তোমাদের হার্টফেল করানোর অপরাধে ফাঁসি হয়ে যেত আমার...'

পেছন থেকে তাগাদা দিল কিশোর, 'কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর কথা শুনছ। চলো, পার্টির দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

দুই

এই ঘটনার পনেরো দিন আগে।

স্কুলে জিনিসপত্র রাখার লকারটা খোলার জন্যে নবে জোরে জোরে মোচড় দিতে লাগল মুসা। বেকায়দাভাবে আটকে গেছে। অবাক লাগল। সকালেও তো ঠিক ছিল। কেউ খুলল নাকি? লাগাতে গিয়ে গোলমাল করে ফেলেছে?

লকারটা ছোট। কিন্তু ভেতরে জিনিস অনেক। গাদাগাদি করে রেখেছে মুসা। জ্যাকেট, বাস্কেটবল খেলার জার্সি, গোটা ছয়েক বই, আরও নানা টুকিটাকি জিনিসের মাঝে হাত ঢুকিয়ে ঠেলে একপাশে সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল সে। আনমনে বিড়বিড় করছে, 'কোথায় রাখলাম! এখানেই তো ছিল...'

'কি ছিল এখানে?' পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল রবিন।

ফিরে তাকাল মুসা, 'লাঞ্চ প্যাকেট।'

হাসল রবিন, 'দেখো, ইঁদুরে নিয়ে গেল নাকি।'

'লকারে ইঁদুর ঢুকবে কি করে?' হাতটা আরেকটু ভেতরে ঢোকাল মুসা, 'এই তো, পেয়েছি। এত ভেতরে গেল কি করে? বাইরেই তো রেখেছিলাম...শিওর, লকারে হাত দিয়েছে কেউ,' টান দিয়ে প্যাকেট বের করতে গিয়ে অনেক জিনিস বেরিয়ে চলে আসছিল। চেপেচুপে সেগুলো ভেতরে ঢুকিয়ে কিছুটা রাগের সঙ্গেই ধাক্কা মেরে লাগিয়ে দিল লকারের দরজা। লেগে যাওয়ার আগেই ভেতর থেকে পড়ল একটা খাম। পাল্লায় আলতো করে টেপ দিয়ে সাঁটা ছিল বোধহয়। খাবার খোঁজায় ব্যস্ত থাকায় এতক্ষণ খেয়াল করেনি। 'বললাম না, কেউ হাত দিয়েছে...'

'কি ওটা?' ঝুঁকে দাঁড়াল রবিন।

'কি জানি!' কালো রঙের খামটা তুলে নিল মুসা। মাঝখানে সাদার ওপরে জ্বলজ্বলে রক্তলাল রঙে লেখা রয়েছে ওর নামটা–মুসা আমান। 'দেখি, ধরো তো,' প্যাকেটটা রবিনের হাতে তুলে দিল খাম খোলার জন্যে। ভেতর থেকে বেরোল একটা হলদে রঙের কার্ড। এককোণে আঁকা একটা কালো কফিনের ছবি। নিচে লেখা: তোমার জন্যে সংরক্ষিত।

'খাইছে! কফিন!' ভুরু কুঁচকে ফেলল মুসা। 'কি রে বাবা! কবরে যাওয়ার দাওয়াত নাকি?'

'উল্টেই দেখো, কি লিখেছে।'

রবিনের কথামত উল্টে দেখল মুসা। অন্যপাশেও লেখা।

'ইভা গ্রেভের বাড়িতে হ্যালোউইন পার্টির দাওয়াত দিয়েছে নিশ্চয়,' রবিন বলল।

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমাকেও দিয়েছে। স্কুলের অনেক ছেলেমেয়েই বোধহয় পেয়েছে। সত্যি অদ্ভুত।'

'অল নাইট হ্যালোউইন কস্টিউম পার্টি,' কার্ডটা পড়ল মুসা। 'সারা রাত চলবে।…হ্যালোউইন পার্টি তো সারারাতই হয়। অদ্ভুতটা কোথায় দেখলে?'

'পড়ো না আরও, বুঝতে পারবে।'

'বিশেষ ব্যবস্থা–নাচ, খেলা…এর মধ্যে অদ্ভুতটা দেখলে কোনখানে?'

'ঠিকানাটা দেখেছ?'

আবার কার্ডের দিকে তাকাল মুসা, 'ঠিকানা: ১৩, গোস্ট লেন, ব্ল্যাকফরেস্ট। সময়: রাত্রি ১২টা, আগামী অমাবস্যা। অক্টোবর…নাহ্, কিছু বুঝলাম না।'

'বাড়িটা কোথায়, দেখো?'

'গ্রেভ ম্যানশন।'

'তাহলেই বোঝো। নামটাই কেমন ভূতুড়ে। গ্রেভ, মানে কবর। কোনখানে ওটা, জানো? ব্ল্যাকফরেস্টের পুরানো কবর-স্থানের পেছনে…'

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল মুসা। 'ওই বাড়ি! ওখানে পার্টি! বহু বছর ধরে তো ওটা খালিই পড়ে আছে জানতাম। পোড়োবাড়ি।'

'যাক, মাথায় তাহলে ঢুকল এতক্ষণে। কেন অদ্ভুত বললাম বুঝলে তো?…এখন আর খালি নয় ওটা। ইভা তার আঙ্কেলের সঙ্গে থাকে ওই বাড়িতে। মেরামত করে নিয়েছেন ওর আঙ্কেল।'

'ওখানে তো জানতাম ভূতের উপদ্রব ছিল।'

হাসল রবিন। 'এ আর নতুন কি। ব্ল্যাকফরেস্টের সবখানেই তো ভূতের উপদ্রব।…এই নাও, তোমার লাঞ্চ। খাবে কি করে? চাপ লেগে ভর্তা হয়ে গেছে।'

'ইভারই কাজ,' মুখ বাঁকাল মুসা। 'নিশ্চয় খামটা রাখার জন্যে সুবিধেমত জায়গা খুঁজছিল…'

'ইচ্ছে করেও ভেতরে ঠেলে দিতে পারে, দুষ্টুমি করে। তোমাকে

জোগানোর জন্যে।'

'হ্যাঁ, তা-ও করতে পারে। দাও,' হাত বাড়াল মুসা।

রবিনের সঙ্গে লাঞ্চরুমের দিকে হাঁটতে হাঁটতে ব্ল্যাকফরেস্টের কথা ভাবল সে। পুরানো বাড়িঘর আছে অনেক। কিছু বাড়িতে মানুষ থাকে, বাকিগুলো সব পোড়ো। লোকে বলে ওগুলোতে নানা রকম ভূতের আড্ডা। আগে নাকি ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটত ব্ল্যাকফরেস্টের গোস্ট লেনে, এখনও ঘটে-খুন, রহস্যময় সব ভূতুড়ে ঘটনা, যেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া কঠিন। ওখানকার গ্রেভ ম্যানশন হ্যালোউইন পার্টির জন্যে উপযুক্ত জায়গাই বটে!

'আমাদেরকে পার্টিতে কেন দাওয়াত করেছে ইভা, বুঝতে পারছ কিছু?' ক্যাফেটারিয়ার দরজায় এসে জিজ্ঞেস করল মুসা।

'নাহ্,' মাথা নাড়ল রবিন, 'ভালমত পরিচয়ও নেই ওর সঙ্গে।'

স্কুলের কারও সঙ্গেই ভাল পরিচয় আছে কিনা সন্দেহ। তবে চেনে ওকে সবাই। এত সুন্দরী মেয়ে চোখে না পড়ে যায় না। লম্বা, ছিপছিপে শরীর, ঝলমলে সোনালি চুল, পান্না-সবুজ চোখ। আগে অন্য কোথাও পড়ত, নতুন এসে ভর্তি হয়েছে। কোন্‌খান থেকে এসেছে অনেক চেষ্টা করেও জানতে পারেনি স্কুলের কেউ। তিন গোয়েন্দার চেয়ে বয়েসে কয়েক বছরের বড় হবে। দেরিতে লেখাপড়া শুরু করেছে বোধহয়।

আরেকটা কথা রবিনকে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, এই সময় চোখ পড়ল কিশোরের ওপর। দরজার কাছে টেবিলে বসে আছে। এগিয়ে গেল সেদিকে।

'কি খবর?' ভুরু নাচাল কিশোর, 'খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে?'

জবাবে খামটা কিশোরের দিকে বাড়িয়ে দিল মুসা।

এক পলক দেখল কিশোর। ধরল না। 'আমিও পেয়েছি।'

'সারা স্কুলের সবাই পেল নাকি?'

'মনে হয় না। বিড পায়নি। মরফি পায়নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'আমাদের দিল কেন বুঝতে পারছি না,' পাশে এসে দাঁড়ানো রবিনের দিকে একবার তাকিয়ে আবার কিশোরের দিকে চোখ ফেরাল মুসা। 'ইভার সঙ্গে পরিচয় নেই আমার। তোমার আছে? তোমার জন্যেই আমাদের দুজনকে দেয়নি তো?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'আমিও বুঝতে পারছি না। দু'একবার "হালো, কেমন আছ? ভাল" ওইটুকুই পরিচয়।'

'আমার সঙ্গে তা-ও নেই। জিমনেশিয়াম ক্লাসে দেখা হয়। কোন কথা বলে না।' খাবারের প্যাকেটটা নিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল মুসা।

রবিন বসল আরেকটা চেয়ারে।

প্যাকেট খুলেই নাকমুখ কুঁচকে ফেলল মুসা। টমেটোর রস কাগজ ফেটে বেরিয়ে পাঁউরুটির টুকরো আর মাংসের বড়া সব একাকার করে দিয়েছে। স্বাদটাদ কিছু পাওয়া যাবে না। এ জিনিস মুখে দিতেও খারাপ লাগছে।

'নাও,' নিজের বাক্সটা ঠেলে দিল কিশোর, 'আমার এখান থেকে খাও।'

আগ্রহ বোধ করল না মুসা। পীনাট বাটার, ব্যানানা স্যান্ডউইচ, শজি সেদ্ধ আর কাঁচা গাজর কাটা। ডায়েট কন্ট্রোল শুরু করেছে আবার কিশোর। ছোটবেলায় খুব মোটা ছিল। অনেক চেষ্টা করে ওজন কমিয়েছে। মোটা হওয়াকে তার ভীষণ ভয়। ওজন সামান্য বাড়তে দেখলেই খাওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কমিয়ে ফেলে।

'নাহ্, লাগবে না, ধন্যবাদ,' মাথাটা পিছিয়ে নিল মুসা। 'এ জিনিস খাওয়া সম্ভব না আমার পক্ষে। তারচেয়ে হট ডগ কিনে আনছি।'

'ওসব বিষ যে কি করে খাও! আর কিছু নাহোক, এক টুকরো গাজর অন্তত নাও।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটুকরো গাজর নিয়ে চিবাতে শুরু করল মুসা।

'কি করবে?' কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রবিন।

'কি করব মানে?' ভুরু নাচাল কিশোর।

'যাবে নাকি দাওয়াতে? কস্টিউম পার্টি। তোমার তো ভীষণ অপছন্দ...'

'এক্কেবারে পোলাপানের খেলা,' বাধা দিয়ে বলল মুসা। 'যেমন খুশি তেমন সাজো। ভাবলেও হাসি পায়। অথচ বুড়ো বুড়ো মানুষগুলো দিব্যি এসব করে আনন্দ পাচ্ছে।...না যাওয়াই ভাল। রাত দুপুরে কে যায় পাগলামি করতে। তা ছাড়া ইভার সঙ্গে খাতিরও নেই আমাদের...'

'তাতে কি?' রবিন আর মুসাকে অবাক করে দিয়ে বলে উঠল কিশোর। 'কস্টিউম পার্টি পছন্দ হোক বা না হোক, দাওয়াত যখন দিয়েছে যেতে অসুবিধে কি? পরিচয় নেই তো কি হয়েছে? গেলেই হয়ে যাবে। রাত দুপুরে ব্ল্যাকফরেস্টের পোড়োবাড়িতে পার্টি করার কথা ভাবতে আমার তো ভালই লাগছে।'

'যাওয়ার আগ্রহ আমারও হচ্ছে,' রবিন বলল, 'তবে স্রেফ কৌতূহল। কি কারণে আমাদের দাওয়াত করল ইভা, জানতে ইচ্ছে করছে।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমার করছে না?'

'সামান্য দ্বিধা করে জবাব দিল মুসা, 'করছে...তবে পাশের পুরানা গোরস্থানটা...'

'গোরস্থান তোমাকে কি খাওয়া করবে? ওটার জায়গায় ওটা আছে।' হাত নেড়ে ওর কথা উড়িয়ে দিল কিশোর। 'ইচ্ছে যখন করছে, যাওয়াই উচিত। তাহলে এটাই ঠিক হলো–আমরা যাচ্ছি।...জিমনেশিয়ামে দেখে ইভাকে কি রকম মনে হলো?'

'এই স্কুলে মেয়েদের মধ্যে সেরা অ্যাথলেট, অনেক ছেলেকেও ছাড়িয়ে যায়। শরীরটা একেবারে নিখুঁত রেখেছে। কি করে রাখল জিজ্ঞেস করেছিলাম একদিন। প্রথমে কথা বলতে চাইল না। শেষে দায়সারা জবাব দিল, ওয়েইট লিফটিং করে।'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে গিয়েও কাটল না কিশোর। 'হুঁ, একারণেই ও...' কথা শেষ না করেই থেমে গেল।

'ও কি?'

'না, বলছি, খুব শক্তি আছে গায়ে। গাড়ির চাকা কাদায় পড়েছিল। ঠেলে তুলে ফেলল।'

'অ, সেদিন যে তুলল। ও এমন কিছু না। আমিও পারি।'

'তুমি পারো। কিন্তু রবিন বা আমি পারি না। অত জোর নেই আমাদের গায়ে।'

★

বাকি দিনটা স্কুলের সবার মুখেই কেবল ইভা আর তার পার্টি ছাড়া অন্য আলোচনা নেই, যদিও দাওয়াত খুব কমজনেই পেয়েছে। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে খবরটা।

শেষ পিরিয়ড শুরুর কয়েক মিনিট আগে হলরুমে মুসাকে পাকড়াও করল এনিড ওয়াকার। স্কুল ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক এনিড। স্কুলের সমস্ত খবর তার কানে চলে আসে। খবর জানার জন্যে অন্যের ব্যাপারে নাক গলাতেও দ্বিধা করে না। ওর মতে, রিপোর্টারের জন্যে সব জায়েয। নাক না গলালে, আড়ি না পাতলে খবর জানবে কি করে?

'শুনলাম ইভার পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছ?' জিজ্ঞেস করল এনিড।

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তোমাকে দেয়নি?'

'নাহ্। সেজন্যেই অবাক লাগছে। আমি না গেলে ওর পার্টির খবর ছাপা হবে কি করে?'

'খবর ছাপা হোক এটা হয়তো চায় না সে। কেন এই পার্টির আয়োজন, জানো নাকি কিছু?'

'জানা তো দূরের কথা, আন্দাজও করতে পারছি না। একটা কারণ হতে পারে, বেশি মানুষকে দাওয়াত দিতে সঙ্কোচ বোধ করছে সে।'

খোঁড়া যুক্তি মনে হলো মুসার। তবু জানতে চাইল, 'সঙ্কোচ বোধ করবে কেন?'

'পোড়োবাড়িতে বাস করে বলে। জানো না? গ্রেভ ম্যানশনের শেষ মালিকরা বেশ কয়েক বছর আগে একটা অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি ওবাড়িতে ওদের প্রেতাত্মারা ঘুরে বেড়ায়। সেজন্যে কেউ আর কেনেওনি বাড়িটা, থাকতেও যায় না।'

'ভূতের কথা বলে আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করছ নাকি?' বাঁকা চোখে তাকাল মুসা। 'তাহলে ইভারা থাকতে গেল কেন?'

ঠোঁট ওল্টাল এনিড। 'সেইটাই তো হলো কথা। আমার এক খালার কাছে শুনলাম, গ্রেভ ম্যানশনের আসল মালিকদের দূর সর্ম্পকের আত্মীয় হয় নাকি ইভারা। উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে বাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়ে এখন সেখানে বসবাস শুরু করেছেন ইভার আঙ্কেল।'

'শুনেছি। তা এই আঙ্কেলটি কোন্ ধরনের আঙ্কেল–মামা, চাচা, খালু, জ্যাঠা–কোনটি?'

'তা বলতে পারব না। ওই ভদ্রলোক ইভার বর্তমান গার্জেন। মনে হয় ইভার বাবা-মা'র ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। মারাও গিয়ে থাকতে পারে, কে

জানে। শুনলাম, এখানে আসার আগে ইয়োরোপে ছিল ইভা আর তার আঙ্কেল। বহু দেশ ঘুরেছে।'

এত সব তথ্য দিলেও আসল জবাবটা দিতে পারল না এনিড-তিন গোয়েন্দাকে দাওয়াত করল কেন ইভা? প্রশ্নটা নিয়ে বায়োলজি ক্লাসে বসেও মাথা ঘামাচ্ছে মুসা, এই সময় এসে ওর পাশে বসে পড়ল ডারবি গ্রেগ। হাসিখুশি ছেলে। সব সময় নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় মেতে থাকে। কোন কিছুতেই সফল হতে পারেনি আজতক। ও নিজেকে খুব চালাক ভাবলেও সবাই বলে বোকা। তবে আসলেই বোকা কিনা সেটাও প্রমাণিত হয়নি।

ডারবির এলোমেলো কালো চুলে চিরুনি লাগাতে ইচ্ছে করে না। গায়ে ঢলঢলে টি-শার্ট। বুকের কাছে কমলার রস লেগে আছে। বড় বড় লাল অক্ষরে লেখা: ডোন্ট টাচ মি, আয়াম আ ভেজিটেরিয়ান। বাক্যটা ওর খুব পছন্দ, সেজন্যেই শার্ট কিংবা গেঞ্জি যা-ই কিনুক, তাতে লিখিয়ে নেয়। নিজেকে নিরামিষাশী ঘোষণা করলেও মাংসেও বিন্দুমাত্র অরুচি নেই ওর। আর এই অদ্ভুত কথাটা কেন লেখে, সেটাও কারও বোধগম্য নয়।

'আই, ডারবি, কেমন আছ?'

'ভাল।' একটা প্লাস্টিকের পোঁটলা ল্যাবরেটরির টেবিলে নামিয়ে রাখল ডারবি। 'শুনলাম ইভা তোমাকে পার্টিতে দাওয়াত দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'আমাকেও দিয়েছে।'

'তাই নাকি? সত্যি?' অবাক হলো মুসা। ওদের তিনজনকে কেন দিল সেটা ভেবেই কূলকিনারা পাচ্ছিল না, ডারবিকেও দিয়েছে শুনে তো হাঁ। উল্টোপাল্টা কাণ্ড করে বসে বলে ওকে সাধারণত কেউ দাওয়াত দিতে চায় না।

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'আর কাকে দিয়েছে, জানো?'

'রবিন আর কিশোরকে। অন্য কারও কথা জানি না।' প্রসঙ্গটা আর ভাল লাগছে না মুসার। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার বায়োলজি প্রোজেক্টের খবর কি?'

'শেষ হওয়ার পথে,' গর্বের সঙ্গে বলল ডারবি। 'সত্যি বলব? সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি।' পোঁটলাটা দেখাল সে।

অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে ওটার দিকে তাকাল মুসা। এই প্রথম লক্ষ করল, পোঁটলাটা জীবন্ত। মনে হলো প্রাণ আছে যেন ওটার। নড়ছে। হাঁ করে তাকিয়ে রইল সেদিকে। জড় বস্তুতে প্রাণ সঞ্চারের মত অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভব করে ফেলল নাকি ডারবি গ্রেগ!

ওর বিস্ময় দেখে হাসল ডারবি। পোঁটলার মুখটা খুলল। সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সবুজ ব্যাঙ। দুই লাফে চলে যাচ্ছিল টেবিলের বাইরে। শেষ মুহূর্তে শূন্য থেকে থাবা দিয়ে ধরে ফেলল ডারবি।

'এই তোমার বায়োলজি প্রোজেক্ট,' হতাশা চাপা দিতে পারল না মুসা। 'একটা ব্যাঙ।'

'এইই সব নয়,' মুসার তাচ্ছিল্য দেখে আহত স্বরে জবাব দিল ডারবি। পোঁটলা থেকে একটা কাঁচের বয়াম বের করল। ভেতরে ঘোলাটে কাদা-পানি।

'মেটামরফসিসের ওপর গবেষণা করছি আমি। এর মধ্যে আছে ব্যাঙাচি।'

ভুরু কুঁচকে বয়ামটার দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। 'মানে ব্যাঙের পোনা! কই, নড়ছে না তো?'

চোখের কাছে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ভাল করে বয়ামের ভেতরটা দেখতে লাগল ডারবি। নিরাশ ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, 'উহুহু, ভুল হয়ে গেছে। বয়ামের মুখে ফুটো করে দেয়া উচিত ছিল। তাহলে বাতাস ঢুকতে পারত। সব মরে গেছে।' পরক্ষণেই মনের দুঃখটা দূর করে দিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল, 'অবশ্য এতে মন খারাপ করার কিছু নেই, তাই না? এটাই জীবন–জন্মিলে মরিতে হয়; আজ যে চলেফিরে বেড়াচ্ছে, কাল সে মৃত, পরশু পচে গন্ধ বেরোতে শুরু করে…' হাত নেড়ে মুসাকে আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে বলল, 'ভয় নেই, ডোবাটায় প্রচুর ব্যাঙাচি আছে। গেলেই তুলে আনতে পারব।' ব্যাঙ আর বয়ামটা আবার পোঁটলায় ঢুকিয়ে মুখ বেঁধে ফেলল সে।

'দেখো আবার, তোমার প্রোজেক্টের কর্ণধার সাহেবও অক্সিজেন না পেয়ে অক্কা পায় কিনা,' সাবধান করে দিল মুসা। 'জলদি ফুটো করো পোঁটলায়।'

'ভাল কথা মনে করিয়েছ তো।' পেন্সিলের চোখা ডগা দিয়ে পোঁটলায় ফুটো করতে করতে জিজ্ঞেস করল ডারবি, 'কি, খুব ভাল সাবজেক্ট বাছিনি?'

জবাব দিল না মুসা।

আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেল ডারবি, 'পার্টিতে আর কাকে দাওয়াত করেছে ইভা?'

'রবিন আর কিশোর বাদে অন্য কারও কথা জানি না বললামই তো।'

'জিম গিলবার্টকে করেছে,' ডারবি বলল।

জিম! ফুটবল খেলে। স্কুল-টীমের সবচেয়ে ভাল লাইনব্রেকার। অনেক ভক্ত ওর। ইভারও ওকে পছন্দ করাটা স্বাভাবিক।

আরও কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল মুসা, এই সময় স্যার ঢুকলেন ক্লাসে। ঢুকেই জেনেটিকস নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। পরের চল্লিশটা মিনিট পার্টি নিয়ে কোন কথা বলার আর সুযোগ হলো না ওদের।

স্কুল ছুটির পর ক্লাস থেকে বেরিয়ে দেখে মুসা, বারান্দার সিঁড়ির গোড়ায় জটলা করছে একদল ছেলেমেয়ে। গলার রগ ফুলিয়ে তাদের উদ্দেশে বক্তৃতা দিচ্ছে এনিড। সেদিকে এগোতে যাচ্ছিল মুসা, পাশ থেকে এসে ওর কনুই চেপে ধরল কিশোর। মুসা ফিরে তাকাতে বলল, 'বিপদেই পড়লাম। প্রশ্ন করে করে জান খারাপ করে দিল সব। সবার এক কথা, আমাদের কেন দাওয়াত দিল ইভা।'

'খাইছে!' চোখ বড় বড় করে জটলাটার দিকে তাকাল মুসা। 'ওদিকে যাওয়াটা তো এখন রিস্কি। সবাই মিলে ছেঁকে ধরবে।… রবিন কই?'

'আছে কোনখানে। দেখা হয়নি। লাইব্রেরিতে থাকতে পারে…' হাত ধরে মুসাকে টেনে একটা থামের আড়ালে নিয়ে এল কিশোর। 'দাঁড়াও, ও কি বলে শুনি।'

'এত দূর থেকে…' বলতে গিয়েই মনে পড়ল মুসার, কিশোর লিপ রীডিং

প্র্যাকটিস করছে।

একদৃষ্টিতে এনিডের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বলে উঠল কিশোর, 'যারা যারা দাওয়াত পেয়েছে, সবার নাম জেনে গেছে ও। নয়জন…'

'মোটে?'

'তাই তো বলছে। তুমি, আমি, রবিন, ডারবি গ্রেগ, জিম গিলবার্ট, জুন হুফার, হেনরি কার্টারিস, টমাস ওয়ারনার এবং ভিকারেল সামার।'

'ভিকি! বাহ্, দারুণ!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'ওকেও তাহলে দিয়েছে!' বহুকাল গভীর বন্ধুত্ব ছিল দুজনের, বাস্কেটবল খেলার সুবাদে। তারপর হঠাৎ করে গতবছর থেকে ফাটল ধরল। ওই খেলা নিয়েই। কিছুদিন রেষারেষি চলল, তারপর শেষ। দোষটা অবশ্য মুসার নয়, ও মানিয়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এমনই জেদ ধরে বসল ভিকি…

'পুরো ব্যাপারটাই অদ্ভুত লাগছে আমার,' মুসার কথায় কান নেই কিশোরের। 'বাছাইটা দেখেছ? একজনের সঙ্গে একজনের স্বভাবের এত অমিল—আমাদের তিনজনের কথাই ধরো না, কারও সঙ্গে কি কারও মেলে? পুরো দলটার মধ্যে কেবল জিম আর টমাসের স্বভাবের কিছুটা মিল আছে…'

বিড়বিড় করে নিজের সঙ্গেই কথা বলতে শুরু করল যেন কিশোর, 'প্রায় সবগুলো চরিত্রই কেমন উদ্ভট। ডারবি, জুন হুফার, ভিকি…ডারবিটা একটা আধপাগল, বোকাও বটে। জুনের মাথায়ও ছিট। নইলে এত সুন্দর লাল চুলগুলোকে এমন পাগলের মত করে রাখে…ভিকিটা নিজেকে ভাবে হিরো, তার ওপর বিজ্ঞানের জাদুকর, অথচ…'

'ওসব তো আমি জানি,' বাধা দিয়ে বলল মুসা।

ফিরে তাকাল কিশোর, 'মুসা, এ সব উদ্ভট মানুষকে কেন দাওয়াত দিল, বলো তো?'

'আমরাও কি উদ্ভট?'

'তা ছাড়া আর কি? তোমার দুঃসাহসের জুড়ি নেই, ওদিকে ভূতের ভয়ে কাবু, রবিন বই পেলে দুনিয়ার আর কিছু বোঝে না, সব ভুলে বসে থাকে, অথচ গানের পার্টিতে গেলে মুখে যেন খই ফুটতে থাকে, আমাদের মুখচোরা রবিন বলেই আর চেনা যায় না তখন; আর আমি…'

'রহস্যের পাগল। নানা রকম ছিটে ভরা মগজ, স্কুলের অনেকেরই ধারণা উন্মাদ হতে আর বেশি বাকি নেই তোমার—সামনে যদিও বলে না…'

'তাহলেই বোঝো। এরকম একটা দলকে কেন পার্টির জন্যে বাছাই করল ইভা?'

'আর বেশি বোলো না! মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার!' তবে হঠাৎ করেই মনটা খুশিও হয়ে উঠল পার্টিতে ভিকি যাচ্ছে বলে।

'ওই যে,' হাত তুলল কিশোর, 'ইভা আসছে। ব্যাপারটার ব্যাখ্যা দেবে মনে হয়।'

স্কুলের সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সোজা জটলার দিকে এগিয়ে এল

ইভা। ওকে দেখে জটলাকারীরাও এগোল ওর দিকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিশোরের পিছে পিছে চলল মুসা।

'সারাদিন কোথায় ছিলে?' খাতির করার ঢঙে ইভাকে জিজ্ঞেস করল এনিড।

'হলিউডে গিয়েছিলাম। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল,' জবাব দিল ইভা। 'ফিরে এসে কোনমতে শেষ পিরিয়ডটা ধরেছি।'

'তোমার জন্যেই বসে আছি আমরা,' এনিড বলল। নোটবুক বের করল। 'তোমার পার্টি সম্পর্কে একটা ধারণা দেবে আমাদের?'

'ধারণা দেয়ার মত স্পেশাল কি হলো?' মিষ্টিকণ্ঠে বলল ইভা। 'আর দশজনের মতই সাধারণ একটা পার্টি দিচ্ছি, ব্যস।'

'কিন্তু তালিকাটা দেখে আমার কি মনে হয়েছে জানো?' জিম গিলবার্ট বলল, 'কোথায় যেন একটা উল্টোপাল্টা আছে। যাদের যাদের দাওয়াত করা হয়েছে, তাদের সবারই কোন না কোন...'

হাত নাড়ল ইভা, 'কি বলতে চাও বুঝলাম না।'

স্কিনটাইট সাদা উলের পোশাক পরেছে সে। সোনালি চুল আর চোখের দিকে তাকিয়ে, কথা বলার ভঙ্গি দেখে কিশোরের মনে হলো মডেল হলে খুব নাম করবে ইভা।

'পরিষ্কার দুটো দলে ভাগ করতে পারছি আমি মেহমানদের,' জিমের কথাটাকেই যেন শেষ করল টম, 'নম্র এবং উগ্র।'

'বাহ্, বেড়ে বলেছ তো!' ভাগাভাগিটা বেশ পছন্দ হয়েছে জিমের, 'নম্ররা ভীতু, আর উগ্ররা সাহসী; কেউ কেউ তো রীতিমত দুঃসাহসী।' মুসার দিকে তাকাল সে, 'কি মিয়া, সারারাত গিয়ে কবরস্থানের ধারে কাটানোর সাহস আছে? ভূতের ভয় করবে না?'

মুসার হয়ে একটা কড়া জবাব দিতে যাচ্ছিল কিশোর, তার আগেই বলে উঠল ইভা, 'আমি আশা করব যারা যারা কার্ড পেয়েছ, সবাই পার্টিতে আসবে।' জিমের দিকে তাকিয়ে একটা ঝলমলে হাসি উপহার দিল সে, 'জিম, আসবে তো?'

'অাঁ!...হ্যাঁ, আসব,' মুহূর্তে কেমন যেন বোকা বোকা হয়ে গেল জিম।

'আমিও যাচ্ছি,' আগ বাড়িয়ে জবাব দিল টম।

'খুশি হলাম,' ইভা বলল। 'আমি আরও আশা করব, তোমরা দুজনেই নাচবে আমার সঙ্গে। খুব ভাল একটা অডিও সেট আছে আমার। নাচের মিউজিকের দারুণ দারুণ সিডি আর টেপ জোগাড় করেছি।'

'তাই নাকি!'

'খুব ভাল, খুব ভাল!'

প্রস্তাবটা লুফে নিল জিম আর টম।

ওদের বেহায়াপনা দেখে নিজের অজান্তেই নাকমুখ কুঁচকে গেল মুসার।

'হাই, ইভা, আমিও তোমার সঙ্গে নাচতে চাই,' বলে উঠল খসখসে একটা কণ্ঠ।

ফিরে তাকাল সবাই। কোন ফাঁকে এসে হাজির হয়েছে রিচার্ড জোনস, ইভার দিকে নজর থাকায় কেউ লক্ষ করেনি। সঙ্গে তার দোসর ব্রেক হগম্যান। স্কুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছাত্র দুজনেই। এতদিনে কলেজে পড়ার কথা ওদের। বার বার ফেল করে বলে স্কুল ছেড়েই যেতে পারছে না। রিচার্ড জোনসকে সংক্ষেপে 'রিজো' বলে ডাকে স্কুলের ছেলেমেয়েরা, ওর নিজেরও এই নামটা পছন্দ। ভাল ফুটবল খেলে, তবে ভীষণ বদমেজাজী। স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে ওর সঙ্গে ব্রেক হগম্যানেরও এত মিল, বন্ধু হওয়ারই উপযুক্ত। ওর ডাকনাম হয়ে গেছে হগ, অর্থাৎ শুয়োর–আর পুরোটা, হগম্যান, মানে শুয়োরমানব; শুনতে মোটেও ভাল লাগে না ওর। কিন্তু বাপ রেখেছে এই নাম, কি আর করে। মেনে নিতেই হয়।

'তোমার সঙ্গে নাচতে পারলে বর্তে যাব, রিজো,' ঝলমলে হাসিটা উধাও হয়ে গেছে ইভার মুখ থেকে। 'আহা, নাচার কি সঙ্গী। তা একদিন অ্যায়রোবিক ক্লাসে চলে এলেই পারো। চুটিয়ে নাচা যাবেখন।'

হেসে উঠল ছেলেমেয়েরা। ওদের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি বর্ষণ করে আবার ইভার দিকে ফিরল রিজো। 'তারচেয়ে বরং তোমার পার্টিতে চলে আসব। অনেক ভাল হবে। আমাকে দাওয়াত দিতে নিশ্চয় ভুলে গিয়েছিলে?'

'উঁহু,' হাসিটা ফিরে এসেছে আবার ইভার মুখে, 'একটুও না। ভুলব কেন? ইচ্ছে করেই দিইনি।'

'তাহলে ইচ্ছেটা বদলাও তাড়াতাড়ি,' ভুরু কুঁচকে বলল রিজো। 'এরকম একটা মজার পার্টি থেকে বাদ পড়াটা মেনে নিতে পারব না আমি আর হগ।'

'আমার কিছু করার নেই, সরি,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিল ইভা। 'ছোট্ট পার্টি, আর কাউকে জায়গা দেয়া সম্ভব হবে না।'

'তাই নাকি? বেশ, দেখা যাবে!' চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে রিজোর। 'হগ্, চল্, যাই! দিক ওরা পার্টি! দেখব কেমন করে দেয়!'

গটমট করে চলে গেল দুজনে। কয়েক সেকেন্ড পরেই গর্জে উঠল মোটর সাইকেলের এঞ্জিন। দুজনকে যারা চেনে সবাই বুঝল, অত সহজে ছেড়ে দেবে না ওরা।

কিন্তু পাত্তাই দিল না ইভা। যেন কিছুই ঘটেনি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'তাহলে আসছ সবাই...' বলে, যাওয়ার জন্যে ঘুরতে যাবে এই সময় ঝটকা দিয়ে খুলে গেল একটা ক্লাসের দরজা। দড়াম করে পাল্লাটা বাড়ি খেল দেয়ালে। ভারিক্কি চালে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসতে লাগল ভিকারেল সামার। ছয় ফুট লম্বা, কুস্তিগীরদের মত পেশিবহুল শরীর। বনিবনা না থাকলেও ওর দিকে তাকিয়ে না মেনে পারল না মুসা, ভিকি সত্যি সুদর্শন। খাটো করে ছাঁটা সোনালি চুল, আত্মবিশ্বাসের হাসি, কালো চোখ। ইভার কাছাকাছি পৌঁছে হাসল। 'তোমার কার্ড পেয়েছি।'

'আসছ তো?'

'অবশ্যই। এমন দাওয়াত কি মিস করা যায়।'

'এলে খুশি হব,' বলে উপস্থিত ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে আরেকটা

ঝলমলে হাসি উপহার দিল ইভা। তারপর, 'দেখা হবে,' বলে ঘুরে পার্কিং লটের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

কিশোরের হাত ধরে টান দিল মুসা, 'চলো।' কিন্তু সিঁড়ির দুই ধাপ নামার আগেই বলে উঠল জিম, 'আই ভীতু, কোথায় যাও? এত তাড়াতাড়ি, কথা শেষ না করেই।'

'বাড়ি যাব। কেন, তোমার কি অন্য কিছু মনে হচ্ছে নাকি?'

দ্রুত কয়েক কথায় প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ভিকিকে বুঝিয়ে দিল জিম। 'নম্র আর উগ্র'র চেয়ে 'ভীতু আর সাহসী' নামটাই পছন্দ হলো ভিকির।

'মুসাকে জিজ্ঞেস করলাম,' ভিকিকে শোনাল জিম, 'সারারাত কবরের ধারে থাকতে পারবে কিনা ও।'

হেসে উঠল ভিকি। 'ভাল প্রশ্ন। কি, পারবে?'

'না না!' কৃত্রিম ভয়ে চোখ বড় বড় করে ফেলল মুসা। 'হাঁটু কাঁপা শুরু হয়ে গেছে আমার!' মুখ বাকিয়ে বলল, 'হুঁহ, কি আমার সাহসীরে একেকজন!'

ব্যঙ্গটার জবাব দিতে না পেরে সিনেমায় দেখা কাউন্ট ড্রাকুলার স্বর নকল করে বলল ভিকি, 'কাউন্ট ড্রাকুলার দুর্গে স্বাগতম।'

'স্বাগতম তো বটেই। যাব না মনে করেছ নাকি? যতই ভান করো, ভিকি, তুমি তো আমার অচেনা নও। আমি তো ঠিকই থাকব। ভাবছি দুর্গে গিয়ে তুমিই না প্যান্ট খারাপ করে ফেলো।'

কড়া একটা জবাবের জন্যে মগজ হাতড়াচ্ছে ভিকি, এই সময় চোখ পড়ল ডারবি গ্রেগের ওপর। পোঁটলা হাতে পার্কিং লটের দিকে যাচ্ছে। ডাক দিল, 'অ্যাই, ডারবি, শোনো, শোনো, শুনে যাও। তুমি তো নিশ্চয় ভীতুদের টীমে? পার্টিতে যাচ্ছ তো?'

ফিরে তাকাল ডারবি, 'যাব তো নিশ্চয়। তবে আমি যে ভীতু একথা তোমাকে কে বলল?'

একসঙ্গে হেসে উঠল জিম, টম আর ভিকি।

হাসতে হাসতে টম বলল, 'ও ভীতু নয়, বোকা। কিন্তু মেটে তো একজন, "বোকা" নামে কোন আলাদা দল বানানো যাবে না। অতএব ওকে ভীতুদের দলেই যোগ দিতে হবে।... দেখো না, হাতে কি একটা বায়োলজি প্রোজেক্ট নিয়ে ঘুরছে। কি আছে ওর মধ্যে, জানো? মরা ব্যাঙের ছাও।'

তিনজনের মধ্যে আরেক দফা হাসির ধুম। ঠাস ঠাস করে একে অন্যের পিঠ চাপড়ানো চলল কিছুক্ষণ। মুসার দিকে তাকাল আবার ভিকি। 'তোমার ভীতুর টীমে আর কে কে আছে, মুসা?' গম্ভীর হয়ে থাকা কিশোরের দিকে আড়চোখে তাকাল সে। 'টিকটিকি আর পড়ুয়াটা তো থাকবে, জানা কথা। আর কে? হেনরি নাকি? যাওয়ার সাহস আছে ওর?'

'নিজেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না।'

পার্টিটা একটা রেষারেষি আর ঝগড়ায় রূপ নিতে যাচ্ছে, স্পষ্ট বুঝতে পারছে কিশোর। গ্রূপ তৈরি হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। খোঁচাখুঁচিতে না গিয়ে ব্যাপারটা আগেভাগে স্বাভাবিক করে ফেলার জন্যে বলল সে, 'দেখো, এটা

পার্টি, কোন প্রতিযোগিতা নয়। সবাই মিলেমিশে আমরা...'

'সরি, কিশোর,' জিম বলল, 'পার্টি হলেও এখন এটাকে প্রতিযোগিতা হিসেবেই নিয়ে ফেলেছি আমরা। চ্যালেঞ্জ। ভীতুদের বিরুদ্ধে সাহসীরা–তোমার যদি ভয় লাগে, এসো না।'

'দেখো,' হাল ছাড়ল না কিশোর, বোঝানোর চেষ্টা চালাল, 'কে ভীতু আর কে সাহসী সেটা প্রমাণের জন্যে কোন পার্টিতে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। চ্যালেঞ্জ করলে এ প্রতিযোগিতাটা অন্য কোনভাবেও করা যেতে পারে...'

'পারে, তবে এরকম একটা পার্টিতে যে মজা পাওয়া যাবে, আর কোন কিছুতে যাবে না। আহা, কি পরিবেশ, কি সময়–অমাবস্যার রাত, পুরানো গোরস্থানের পাশে...সেই সঙ্গে ঝড় যদি আসত, তাহলে তো একটা কাজের কাজই হত।'

এদের বোঝানো বৃথা, ভেবে চুপ হয়ে গেল কিশোর। মুসাকে বলল, 'চলো, যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

পার্কিং লটে এসে দেখল ওদের অপেক্ষা করছে ডারবি। হাসিমুখে বলল, 'পার্টিতে তাহলে যাচ্ছিই আমরা। ভীতু বলেছে তো, দেখিয়ে দেব ওদের। কে বোকা আর কে চালাক, তা-ও বুঝিয়ে দেব।'

নাহ্, পুরোপুরিই একটা চ্যালেঞ্জের রূপ নিয়েছে ব্যাপারটা। নিরীহ ডারবি পর্যন্ত খেপে উঠেছে। পার্টির রাতে যে কি ঘটবে খোদাই জানে, ভাবল কিশোর।

তিন

নম্র, মানে জিমের 'ভীতু'রাই দেখা গেল দলে ভারী। কিভাবে 'উগ্রদের' ঠকানো যায় তা নিয়ে ডারবি আর হেনরির মধ্যে প্রায়ই আলোচনা হয়। মুসাকে ডেকে নেয় ওরা। মাঝেসাঝে রবিনও যোগ দেয় তাতে। কিন্তু কিশোর থাকে না। সে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছে এসব ফালতু দলাদলির মধ্যে নেই।

পার্টির আগেই স্কুলে নানা রকম অঘটন ঘটাতে শুরু করল দুটো দল, বিশেষ করে উগ্ররা। এক সকালে ডারবি তার লকার খুলতেই লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা সাপ। ও তো চিৎকার দিয়ে ভয়ে আধমরা। পরে দেখা গেল সাপটা প্লাস্টিকের।

কার কাজ অনুমান করে ফেলে প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে ডিকি আর জিমের জুতোর মধ্যে শেভিং ক্রীম ভরে রাখল হেনরি।

এর পরদিন লকার খুলেই নাক টিপে ধরল রবিন। ভকভক করে বেরোতে লাগল পচা গন্ধ। একগাদা পচা মাছ প্যাকেট করে ভেতরে রেখে দিয়েছে কেউ। লকার পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগল তার। তা-ও গন্ধ কি আর যেতে চায়।

পার্টির দুদিন আগে লকারের দরজা খুলে অন্যমনস্কভাবে বাস্কেটবল খেলার জার্সি বের করার জন্যে হাত ঢোকাতেই ভেজা ভেজা কি যেন হাতে লাগল মুসার। তাকিয়েই ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল। মরা মুরগীর নাড়ীভুঁড়ি। আরও আছে মুরগীর একটা কাটা মাথা। ঠোঁট দুটো ফাঁক। নিষ্প্রাণ চোখ যেন তার দিকেই তাকিয়ে আছে। সঙ্গে একটা নোট পাওয়া গেল। তাতে লেখা:

কি বুঝলে, বোকা ছাগল? পার্টিতে যাওয়ার আশা ত্যাগ করো। নইলে এরপর এমন জিনিস পাবে, কলজে ফেটে মরবে। তোমার তো মুরগীর কলজে।

নির্জন হলরুমে একা একাই দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। হিসহিস করে বলল, 'করো, করো, ভিকি, যত ইচ্ছে করে যাও। ভয় দেখিয়ে আমার পার্টিতে যাওয়া বন্ধ করতে পারবে না।'

জঘন্য জিনিসগুলোসহ নোটটা ময়লা ফেলার ঝুড়িতে ফেলে দিল সে।

পার্টির আগের বৃহস্পতিবারে ক্লাস থেকে বেরিয়ে লাইব্রেরিতে রওনা হলো মুসা। বারান্দার একটা মোড়ের কাছে আসতেই ওপাশে শোনা গেল মেয়েকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার, 'অ্যাই ছাড়ো, ছাড়ো, ব্যথা লাগছে!'

ইভার চিৎকার না!

তিন লাফে মোড়টা পার হয়ে চলে এল সে। দেখল, ইভার দুই পাশে প্রায় গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে রিজো আর হগ। রিজো ওর হাত মুচড়ে ধরেছে। খিকখিক করে হাসছে হগ। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ইভার মুখ।

'আমি পারব না!' আবার চিৎকার করে উঠল ইভা। 'কেন বুঝতে পারছ না এটা অন্য রকম পার্টি? তোমাদের দাওয়াত দেয়া সম্ভব নয়!'

'ওসব বুঝিটুঝি না,' খসখসে কণ্ঠে বলল রিজো। 'দেয়াই লাগবে। পার্টি পার্টিই। অন্য রকম আবার কি?'

হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল ইভা। 'আহ্, ব্যথা লাগছে! ...ছাড়ো না!'

'যতক্ষণ না দাওয়াত দিচ্ছ, ছাড়ব না,' গোঁয়ারের মত বলল রিজো। 'বলেছিই তো, "না" শুনতে অভ্যস্ত নই আমরা।'

এগিয়ে গেল মুসা। সামনে গিয়ে দাঁড়াল ওদের। শীতল কণ্ঠে আদেশ দিল, 'ওকে ছেড়ে দাও!'

'আরি! ভূতো যে,' মুসাকে দেখেই বলে উঠল রিজো। মুসা যে 'ভূতের ভয়ে ভীত' এজন্যেই তাকে 'ভূতো' ডেকে ব্যঙ্গ করল রিজো।

মুরগীর মত ঘাড় তেরছা করে টিটকারির সুরে হগ বলল, 'হাত ছাড়তে কে বলে হে?'

'আমি মুসা আমান বলছি!' একই রকম শীতল কণ্ঠে জবাব দিল মুসা।

'মুসা আমান কি বাঘ নাকি?' বলল রিজো। কিন্তু বাঘ না হলেও ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ইভার হাতটা ছেড়ে দিল।

হগের দিকে ফিরল মুসা।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখে তাকিয়ে থাকার পর হগ বলল রিজোকে, 'চলো।'

'হ্যাঁ, চলো। ছুঁচো পিটিয়ে হাত গন্ধ করতে ইচ্ছে করছে না এখন,' সুর মেলাল রিজো। কয়েক পা হেঁটে গিয়ে একটা দরজার কাছে থামল। ঘুরে জ্বলন্ত চোখে তাকাল ইভার দিকে। 'কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত সময় দিলাম। এর মধ্যে দাওয়াতের কার্ড চাই, নইলে...'

'আমিও যা বলার বলে দিয়েছি। পাবে না।'

'দেখা যাবে,' দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস শব্দ বেরোল হগের। মুসার দিকে তাকাল, 'তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি, ভূতো, এভাবে যদি আর কখনও আমার সামনে দাঁড়াও, চেহারা বদলে দেব। পার্টির জন্যে আর মুখোশ লাগবে না। মনে থাকে যেন।'

হলঘরে ঢুকে গেল দুই মস্তান।

সেদিকে তাকিয়ে থেকে বলল ইভা, 'বাঁদর কোথাকার!'

'নিজেদের কি ভাবে ওরা,' মুসা বলল। 'যেন দুনিয়ায় একমাত্র ওরাই আছে। এক নম্বরের কাপুরুষ। কায়দামত পেলে একদিন এমন ঠ্যাঙান ঠ্যাঙাব...'

মুসার দিকে তাকিয়ে তার ঝলমলে হাসি হাসল ইভা। 'থ্যাংক ইউ।'

চকচকে সোনালি চুলগুলোকে পেছনে টেনে নিয়ে বেনি করেছে ইভা। লেবু রঙের সোয়েটার পরেছে। যেন সেকারণেই ওর সবুজ চোখ আরও সবুজ দেখাচ্ছে।

'ওদের নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তা কোরো না,' মুসা বলল। 'তোমার একটা চুলও ছিঁড়তে পারবে না ওই দুই শয়তান।'

কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা কতখানি রাখতে পারবে, সন্দেহ আছে মুসার। ভীষণ শয়তান রিজো আর হগ। রকি বীচের সবাই জানে।

'তোমার কাছে মাপ চেয়ে নেয়া উচিত আমার।'

'আমার কাছে? কেন?' মুসা অবাক। বুঝতে পারল না কোন্ অপরাধের জন্যে মাপ চাইছে ইভা।

'এই যে দাওয়াত দিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থার মধ্যে ফেলে দিলাম তোমাদের। প্রতিযোগিতা, রেষারেষি...'

'সেটা তোমার দোষ নয়।'

'সত্যি বলছ?'

'সত্যিই তো। দাওয়াতের ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক ভাবে না নিয়ে রেষারেষির মধ্যে ঢুকলাম তো আমরাই, তাতে তোমার দোষটা কোথায়?'

'বাঁচালে! থ্যাংক ইউ। আমি চাই না কোন কারণেই পার্টিটা পণ্ড হোক। আমার বাড়িতে মেহমানদের নিয়ে খারাপ কিছু ঘটুক। বিশেষ কয়েকজনকে বেছে বেছে দাওয়াত করেছি তাদের সম্পর্কে আমার ভাল ধারণা হয়েছে বলে, তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাই। যা-ই বলো, যত গণ্ডগোলের মূল ওই এনিড।

সে-ই পুরো স্কুলটাকে খেপিয়ে তুলেছে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল ইভা। বেনিটা সোজা করল। 'এই প্রতিযোগিতার আসলে কোন প্রয়োজন ছিল না। এটা ছাড়াই প্রচুর উত্তেজনা আর রোমাঞ্চের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম আমি। ব্যাপারটা আমার মোটেও ভাল লাগছে না।'

'কিশোরও তা-ই বলছে। আমি আর রবিন যা-ও বা একআধটু আছি, ও বলে দিয়েছে এসবের মধ্যে ও একেবারেই নেই।'

'আচ্ছা,' চট করে প্রসঙ্গ বদলে ফেলল ইভা, 'শুনলাম, ও নাকি কানে শোনে না?'

'সেটা সাময়িক। কানের মধ্যে একটা ফোঁড়া হয়েছিল। ডাক্তার বলেছেন সেরে যাবে।'

'পার্টিতে আসবে তো? ওর মত বুদ্ধিমান ছেলে আমার পার্টিতে না এলে সত্যি দুঃখ পাব।'

'তা আসবে,' হেসে বলল মুসা। 'এনিড যেমন এই পার্টির মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখছে, কিশোর পেয়েছে রহস্যের গন্ধ।'

সরু হয়ে এল ইভার চোখের পাতা। 'কি রহস্য?'

'তা জানি না। সময় না হলে কোন কথাই খোলাসা করে না ও। এটা ওর স্বভাব।'

'আগাথা ক্রিস্টির এরকুল পোয়ারো,' বিড়বিড় করল ইভা। 'কিশোর পোয়ারো!'

★

স্কুল শেষে কিশোরকে পাওয়া গেল ওর লকারের সামনে।

ফিরে তাকাল কিশোর। মুসার মুখ দেখেই অনুমান করে ফেলল কিছু ঘটেছে। জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

রিজো আর হগ যা করেছে, খুলে বলল মুসা।

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কিশোর, 'সহজে ছাড়বে না ওরা, আমি জানতাম। একটা কিছু ঘটাবেই। শুরুতেই বলেছিলাম, এই প্রতিযোগিতাটা ভাল্লাগছে না আমার...'

'ইভারও লাগছে না। কি করা যায় এখন, বলো তো?'

'কি আর করবে? জিম আর ভিকিকে হাজার বুঝিয়েও ক্ষান্ত করানো যাবে না। যা করার ওরা করবেই। আমাদের সাবধান থাকতে হবে আর কি, খারাপ কিছু যাতে ঘটে না যায়।'

লকার থেকে বই বের করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল কিশোর।

'কি হলো?' জানতে চাইল মুসা। নিজের লকারের সামনে দাঁড়ানো। ফিরে তাকিয়ে দেখল গম্ভীর হয়ে গেছে কিশোর। হাতে একটুকরো কাগজ।

পাশে কাত হয়ে গলা বাড়িয়ে কাগজের লেখাটা পড়ল মুসা:

কালা তো হয়েই আছ, পার্টিতে গিয়ে গোয়েন্দাগিরি ফলানোর চেষ্টা করলে কানাও হতে হবে বলে দিলাম!

চার

'ভিকি ইবলিসটা ছাড়া আর কেউ না!' ফুঁসে উঠল মুসা। 'দেব নাকি গিয়ে ওর মাথাটা ভেঙে?'

শান্তকণ্ঠে কিশোর বলল, 'কিচ্ছু করতে যেয়ো না, মুসা। কে যে কি করছে, বোঝা যাচ্ছে না এখনও।'

অবাক হলো মুসা, 'ভিকি করেনি?'

'জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে, আড়ালে থেকে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ। সবাইকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।'

'রিজো আর হগ?'

'যে-ই করে থাকুক, কাউকে কিচ্ছু বলতে যেয়ো না। তাতে খারাপ ছাড়া ভাল হবে না।'

'রহস্যটা কোন্খানে?'

'হতে পারে এটা স্রেফ রসিকতা,' মুসার কথা যেন কানেই ঢোকেনি কিশোরের, তার নিজের কথা বলে চলল, 'না-ও হতে পারে। তবে এ রকমটা না ঘটলেই ভাল হত। তাহলে সবাইকে খুঁচিয়ে উত্তেজিত করে মজা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হত সে।'

'কে সে?'

'কি করে বলব? জানলে তো ধরে এনে সবার সামনে মুখোশটা ফাঁস করে দিতাম।' কাগজটা দলামোচড়া করে ট্র্যাশ বাস্কেটে ফেলে দিল কিশোর। 'চলো, কোন পিজা হাউজে। খিদে পেয়েছে।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুসার মুখ। 'ঠিক। চলো। রবিনকে লাইব্রেরি থেকে ডেকে নেব।'

★

স্কুলের কাছে রকি বীচের সবচেয়ে জনপ্রিয়, কিংবা আরেকটু সঠিক করে বলতে গেলে বলা যায় 'ছাত্রপ্রিয়' পিজা হাউজটায় ঢুকল তিনজনে। স্কুল আর কলেজের ছাত্র-ছাত্রীতে বোঝাই হয়ে আছে। ওদের ভাগ্য ভাল, ঢুকতেই এককোণের একটা ছোট কেবিন খালি করে বেরিয়ে গেল চারজন ছেলেমেয়ে। তাড়াতাড়ি ওটাতে ঢুকে পড়ল তিন গোয়েন্দা।

খাবারের অর্ডার দিয়ে অপেক্ষা করছে ওরা। ইভাকে কার্ডের জন্যে কিভাবে চাপাচাপি করেছে রিজো আর হগ, সেকথা রবিনকে বলছে মুসা। এত হই-চই আর চেঁচামেচির মধ্যে চিৎকার করে কথা বলতে গিয়ে মুখ ব্যথা হয়ে গেল মুসার। শেষে চুপ করে গেল। এই সময় হাত তুলে ইশারা করল কিশোর। ফোন বুদের দিকে ইঙ্গিত করে মাথা নাড়ল।

মুসা আর রবিন দুজনেই ফিরে তাকাল সেদিকে। ইভা দাঁড়িয়ে আছে

সেখানে। কাউকে ফোন করছে।

'ডাকব নাকি?' মুসা বলল, 'চেয়ার তো খালি আছে।'

'ডাকো। অসুবিধে কি...' থেমে গেল কিশোর। বদলে গেল মুখের ভাব।

'কি হলো?'

আবার ইশারা করল কিশোর। 'হয়তো কিছুই না। কিন্তু ও কি বলছে জানো?'

ইভার দিকে দীর্ঘ একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কিছু বুঝতে পারল না। এই হট্টগোলের মধ্যে মাইক লাগিয়ে যদি কথা বলে ইভা, এত দূর থেকে শুনতে পাওয়ার কথা নয় ওদের। কিন্তু কিশোর তাকিয়ে আছে ওর ঠোঁটের দিকে।

'কি বলছে?' জানতে চাইল রবিন।

'বলছে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে একপাশে মাথা কাত করল কিশোর। দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ণ করে তাকিয়ে রইল ইভার দিকে। 'বলছে, খেসারত দিতেই হবে। আমি ওদের ছাড়ব না।'

'কার কথা বলছে?'

'শিওর রিজো আর হগের,' মুসা বলল। 'ওরা যখন ধমকাচ্ছিল, ওর চেহারা তো দেখোনি। সাপের মত ফুঁসছিল। অত কঠিন মেয়ে, ভাই, আমি কমই দেখেছি। কিছুতেই ওকে নরম করতে পারল না দুই মস্তান।'

পাঁচ

পনেরো দিন পর অবশেষে এল সেই অমাবস্যার রাত। ইভাদের বাড়িতে পার্টিতে যাওয়ার রাত। গোরস্থান পেরিয়ে সেখানেই চলেছে ওরা।

বাতাসের বেগ বাড়ছে। আছড়ে পড়ছে পুরানো কবরখানার ওপর। গাছের পাতাশূন্য ডালগুলোকে নাড়িয়ে দিচ্ছে যেন কঙ্কালের হাড্ডিসার আঙুলের মত।

পাশাপাশি হাঁটছে এখন মুসা আর কিশোর, জিমের পেছন পেছন। দুজনকে ঘাবড়ে দিতে পারার আনন্দে এখনও হাসছে সে।

সামনে গ্রেভ ম্যানশন। বিশাল সিংহদরজা হাঁ হয়ে খুলে আছে।

চোখের কোণে নড়াচড়া লক্ষ করে ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। আরও দুজনকে আসতে দেখা গেল কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে। শরতের ফ্যাকাসে রূপালী জ্যোৎস্নায় ঝিলমিল করছে ওদের পোশাক।

সবাইকে বলে দেয়া হয়েছে একই পথে আসতে। ইভাই বলেছে, এই পথে এলে সুবিধে হবে। তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারবে। গোস্ট লেনের শেষ মাথায় একটা মোড়ে গাড়ি রেখে তাই কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে শর্টকাটে পাড়ি দিচ্ছে ওরা।

মন্দ কি? ভালই করেছে ইভা, ভাবল কিশোর। রোমাঞ্চিত হওয়ার জন্যেই

এই হ্যালোইন পার্টি। মেহমানদের যাত্রাটাও নিশ্চয় রোমাঞ্চকর করতে চেয়েছে সে, সেজন্যে কবরস্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে বলেছে।

দূর থেকে দেখে যতটা মনে হয়েছিল, কাছাকাছি এসে তার চেয়েও ভূতুড়ে লাগল বাড়িটাকে। চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগুলো এতই পুরানো, কোন কোনটার বয়েস একশো পার হয়ে গেছে। নিচতলার জানালাগুলোতে মোটা মোটা লোহার শিক লাগানো। কাঠের খোলা পাল্লাগুলো দড়াম দড়াম করে বাড়ি খাচ্ছে বাতাসে।

কতটা মেরামত করা হয়েছে বাড়িটা কে জানে, বসবাস করার উপযুক্ত হবে নিশ্চয়। তারপরেও যা দেখা যাচ্ছে, হরর ছবিতেই কেবল মানায়। সত্যি সত্যি ভূত থাকতেও পারে ওখানে–মুসার মনে হলো। ঠিক এই সময় বাতাসের গতি আর দিক, দুটোই বদলে গেল। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে যেন বাজনা আর তীক্ষ্ণ অট্টহাসির শব্দ ভেসে এল বাড়ির ভেতর থেকে। পার্টি কি শুরু হয়ে গেছে? আসতে বোধহয় দেরিই করে ফেলল ওরা।

থপথপ করে পা ফেলে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল জিম। বাতাসে উড়ছে ওর পোশাকের কানা। জীবনমৃত ভূত 'জোম্বি' সেজে পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে।

এসব সাজাসাজি পছন্দ নয় কিশোরের, তবু পার্টিতে যোগ দিতে এসেছে যখন, এর নিয়ম-কানুন তো মানতেই হবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও পরেছে, তবে অস্বাভাবিক কিছু নয়। পুরানো দিনের সার্কাসের লোকের পোশাক। লাল সাটিনের ঢোলা শার্ট আর নীল প্যান্ট। চমৎকার মানিয়েছে তাকে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে কালো রঙের মুখোশটা পরে নিল কিশোর। চোখ, নাক আর মুখের কাছে ফুটো। রবিনহুডের যুগে এ ধরনের মুখোশ লাগিয়ে ডাকাতি করতে যেত তৎকালীন 'জনদরদী দস্যুরা'–অর্থাৎ ধনীর যম গরীবের বন্ধু দস্যু। এ জিনিসের ব্যবহার অবশ্য এখনও শেষ হয়ে যায়নি। আজও ছিনতাই কিংবা ব্যাংক ডাকাতি করতে গেলে এ রকম মুখোশ পরে মুখ ঢেকে নেয় অনেক ডাকাত।

নিজের মুখোশটাও পরে নিল মুসা। যে ফার্মহাউজটাতে বাস করে ওরা, তার পুরানো চিলেকোঠায় পেয়েছে। বিশেষ উৎসবের দিনে এ জিনিস ব্যবহার করে ইনডিয়ানরা। সে পরেছে ১৮৫০ সালের ওয়েস্টার্ন কাউবয়ের পোশাক। মুখোশটা তার সঙ্গে মানিয়ে গেছে। সিগারেট খায় না, তবু খাঁটি কাউবয়দের কায়দায় একটা পুরানো প্যাকেট জোগাড় করে ভরে রেখেছে বুকপকেটে, সিনেমায় দেখা কাউবয়দের অনুকরণে। মাথায় চওড়া কানাওয়ালা হ্যাট। পরার পর প্রথমে মনে হয়েছিল, বাহ্, বেশ হয়েছে; কিন্তু এখন কবরস্থান পার হয়ে এসে পুরো ব্যাপারটাই কেমন ছেলেমানুষী আর হাস্যকর লাগছে।

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই মুখোশের ফুটো দিয়ে ঠোঁট নেড়ে বলল কিশোর, 'নিজেকে একটা রামছাগল মনে হচ্ছে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'খুলে ফেলব নাকি?'

'নাহ্, থাক। দেখাই যাক না শেষ পর্যন্ত কি ঘটে। খোলার অনেক সময়

পাব।

সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠে এল দুজনে। বারান্দার দেয়াল, ছাত সব যেন গিলে খাবার প্রস্তুতি নিয়েছে এক ধরনের লতানো ফুলের ঝাড়, ঘন হয়ে জন্মেছে। জিমকে দেখা যাচ্ছে না। বোধহয় ভেতরে চলে গেছে। বারান্দায় শুধু ওরা দুজন।

হলঘরে ঢোকার বড়, ভারী কাঠের দরজার মাঝখানে বসানো পিতলের বড় একটা ঘণ্টা বাজানোর হাতল। মাথাটা মানুষের খুলির আকৃতিতে তৈরি। বাজাতে গিয়েও ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে আনল মুসা। বিশাল এক রোমশ মাকড়সা উড়ে এসে পড়েছে তার বাহুতে।

'খাইছে!' বলে চিৎকার দিয়ে পিছিয়ে এল সে। মাকড়সা যে ওড়ে, জানা ছিল না। ভূতুড়ে নাকি!

'কি হলো!' জানতে চাইল কিশোর।

জবাবে অট্টহাসি শোনা গেল। লতায় জড়ানো মোটা একটা থামের আড়াল থেকে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এল জিম। যেন হায়েনার হাসি। মাকড়সাটা প্লাস্টিকের। সুতোয় বাঁধা। বাচ্চাদের খেলনা ইয়ো-ইয়োর মত টান দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে গেল মুসার হাত থেকে।

'নাহ্, কোন মজা নেই,' বলল সে। 'তোমাদের ভয় দেখানো যে এত সহজ, ভাবতেই পারিনি। বাকি "ভীতুরাও" যদি তোমাদের মতই হয়, প্রতিযোগিতার মজা শেষ। ধরে নিতে পারি আমরাই জিতব।'

'ধরে নিতে আর কষ্ট কি। নাও,' বলে লম্বা দম নিল মুসা। মুখোশটা ঠিকঠাক করে নিয়ে আবার হাত বাড়াল ঘণ্টা বাজানোর জন্যে।

★

ইভাদের লিভিং রুমটা অদ্ভুতভাবে সাজানো। যেন এক বাস্তব দুঃস্বপ্ন। প্রতিটি কোণে লাগানো রয়েছে কৃত্রিম মাকড়সার জাল। ভয়াবহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে প্লাস্টিকের কঙ্কাল। ছাত থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে আসছে ভ্যাম্পায়ার ব্যাট, ভয়ঙ্কর চেহারার পিশাচ আর ডাইনীরা। সব সুতোয় ঝুলানো। ঘরের আলো-আঁধারির কারণে খুব ভালমত না তাকালে সুতো চোখে পড়ে না, তাই মনে হয় শূন্যে ভেসে রয়েছে জিনিসগুলো।

ঘরের একধারে সরু একটা ব্যালকনি। তাতে বসানো রঙিন সচল স্পটলাইটের আলো বাজনার তালে তালে ঘুরে ঘুরে যেন রঙ ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে মস্ত ঘরের ভেতরটায়। সেই আলোতে ঘরের স্থির জিনিসগুলোকেও মনে হয় নড়ে, থিরথির করে কাঁপে। অন্য কোন আলোর ব্যবস্থা নেই ঘরে। বিশাল খোলা ফায়ারপ্লেস থেকে আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে সামনের অনেকখানি জায়গা জুড়ে। ইয়াবড় এক কেটলি বসানো সেই ফায়ারপ্লেসের ওপর। টগবগ করে তরল পদার্থ ফুটছে তার ভেতরে। ধোঁয়া বেরোচ্ছে নল দিয়ে।

সমস্ত আসবাবপত্র প্রায় দুই শতক আগের। তবে বুম বুম করে মিউজিক বাজছে যে যন্ত্রটা থেকে সেটা একেবারে আধুনিক। স্পীকারগুলো লুকানো।

কোনখানে আছে বোঝা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। সিনেমার সেট সাজানো হয়েছে যেন। ভূতুড়ে দুর্গ কিংবা পোড়োবাড়ির সেট। চমৎকার স্পেশাল ইফেক্ট।

'বাপরে!' ঢুকতে গিয়ে দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে গেছে জিম। 'কি সাংঘাতিক! জবাব নেই!'

'মুসা,' ওর হাত ধরল কিশোর, 'কেমন লাগছে?'

'দারুণ!' গলা কেঁপে উঠল মুসার।

জিমের মতই খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এখনও ওরা। ঘরের মাঝখান দিয়ে হেঁটে এল একজন মানবী, নাকি ডাইনী, বোঝা গেল না। ইভাকে চিনতে সময় লাগল মুসার। কুচকুচে কালো পোশাক পরেছে। আঁটসাঁট মধ্যযুগীয় খাটো গাউন। পায়ে কাঁটা বসানো কালো স্যান্ডেল। চুল ঝুঁটির মত চুড়ো-খোঁপা করে বাঁধা। পাউডার ডলে সাদা করে ফেলেছে মুখ। মড়ার মুখের মত ফ্যাকাসে লাগছে। ঠোঁটে টকটকে লাল লিপস্টিক, যেন এইমাত্র রক্ত খেয়ে এসেছে। চোখের ওপরের পাতায় লাগিয়েছে জ্বলজ্বলে সবুজ রঙ।

কিশোরের ভাল কানটার কাছে ফিসফিস করে বলল মুসা, 'টিভির হরর সিরিয়ালের এলভিরা সেজেছে!'

সামনে এসে দাঁড়াল ইভা। উষ্ণ হাসি হাসল। হাসিটা অবশ্য মানবীর মতই লাগল। নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'এলভিরার গুপ্তকক্ষে স্বাগতম। প্রায় সবাই হাজির হয়ে গেছে। তোমাদের দেরি দেখে ভাবলাম কবরের জিন্দালাশেরা বুঝি তোমাদেরও জোম্বি বানিয়ে দিয়েছে।'

'ভাল ড্রেস পরেছ তো,' প্রশংসা না করে পারল না কিশোর। 'সত্যি সত্যি ডাইনী মনে হচ্ছে।'

'থ্যাংকস,' সামান্য কেঁপে গেল মনে হলো ইভার কণ্ঠ। কিশোরের মন্তব্যটা বোধহয় সহজভাবে নিতে পারেনি। তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিয়ে বলল, 'জন্ম থেকেই আমার ইচ্ছে আমি ভ্যাম্পায়ার হব।' কাউন্ট ড্রাকুলার রক্তচোষা পিশাচিনী লুসির অনুকরণে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'তোমাদের পোশাকও কিন্তু খুব ভাল হয়েছে।...আজকের রাতটা আমাকে ভেনিস কার্নিভ্যালের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে।'

'কি কার্নিভ্যাল?' জানতে চাইল মুসা।

'বছরে একবার ভেনিসে একটা বিরাট উৎসব করে লোকে, বড় করে পার্টি দেয়। সেরাতে যার যেমন খুশি তেমন করে সাজে। পার্টি চলে প্রতিটি রাস্তায়, খালের মধ্যে বড় বড় নৌকায়। আহা, কি রাত! ইটালির সেই ভেনিস...' স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে অতীতের স্বপ্নের জগতে চলে গেল ইভা। 'আঙ্কেলের সঙ্গে ওই শহরে বহুদিন থেকেছি আমি।' বলেই যেন লাফ দিয়ে আবার বাস্তবে ফিরে এল সে। ফিরে তাকিয়ে ডাকল, 'আঙ্কেল, আমার বন্ধুরা এসে গেছে।'

ফায়ারপ্লেসের পাশের অন্ধকার ছায়া থেকে বেরিয়ে এলেন অতি রোগাটে একজন মানুষ। হাড্ডিসার দেহ। সার্কাসের ভাঁড়ের পোশাক পরেছেন। নীল মখমলে তৈরি। মুখে মেখেছেন সাদা রঙ। তাতে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ রঙের

এসে আটকে গেছে। খুবই বিষণ্ণ লাগছে তাঁকে এই সাজে।

'আঙ্কেল, ও জিম গিলবার্ট,' পরিচয় করিয়ে দিতে লাগল ইভা। 'আর এ হলো কিশোর পাশা–বিখ্যাত গোয়েন্দা।...ও মুসা আমান, কিশোরের বন্ধু এবং সহকারী। ওর আরেক সহকারী রবিনকে তো আগেই দেখলে।'

গোস্ট লেনে থাকে রবিন। তাই ব্ল্যাকফরেস্টের অন্য মেহমানদের সঙ্গে আগেই চলে এসেছে। কিশোরই বলেছিল চলে আসতে। ওর আর মুসার জন্যে অপেক্ষা করার কোন প্রয়োজন ছিল না।

'ও, তুমিই তাহলে কিশোর পাশা,' হাত বাড়িয়ে দিলেন মিস্টার মেয়ার গ্রেভ। 'ইভার কাছে তোমার কথা অনেক শুনেছি... শার্লক হোমস আর এরকুল পোয়ারোর চেয়ে কম বিখ্যাত নও তুমি, অন্তত রকি বীচে...যাই হোক, পরিচিত হয়ে খুশি হলাম।'

'আমরাও খুশি হয়েছি,' তাঁর কঙ্কালের মত আঙুলগুলো চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে দিতে বলল মুসা। 'দারুণ সাজিয়েছেন কিন্তু ঘরটা!'

'হ্যাঁ, খুব সুন্দর। বৈচিত্র্য, নতুনত্ব, দুই-ই আছে,' সুর মেলাল কিশোর। 'এরকম পার্টিতে আর কখনও যাইনি।'

'পছন্দ হয়েছে তাহলে। থ্যাংক ইউ,' মেয়ার বললেন। 'ইলেকট্রনিক এঞ্জিনিয়ার আর সিনেমার একজন স্পেশাল ইফেক্ট টেকনিশিয়ানকে ডেকে এনে এসব করাতে হয়েছে। মিউজিকের টেপ আর সিডিগুলো জোগাড় করার কৃতিত্ব অবশ্য ইভার। আমি আর সে মিলে অনেক মগজ খাটিয়ে প্ল্যান করেছি। ঠিক করেছি, এমন পার্টি দেব, যারা আসবে যাতে অনেকদিন মনে রাখে।'

'দেখি, কোটগুলো খুলে দাও তো তোমাদের,' হাত বাড়াল ইভা। 'ওই যে বাস্কেটে খাবার রাখা আছে। কেটলিতে পাবে সোডা। যত ইচ্ছে খাও।'

ওদের কোট হ্যাঙ্গারে রাখতে গেল ইভা। মেয়ার গেলেন অন্য মেহমানদের সঙ্গে কথা বলতে।

দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে রইল মুসা। ঘরের ভেতরটায় চোখ বোলাল আবার। ফায়ারপ্লেসের কাছে নাচছে দুটো ছেলে। কয়েকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে আর হাসাহাসি করছে।

প্রচুর টাকা আছে ইভার আঙ্কেলের–ভাবল সে। একটা পার্টির জন্যে যে পরিমাণ টাকা খরচ করেছেন! খটকা লাগল। মাত্র নয়জন মেহমানের জন্যে এত টাকা খরচ করতে গেল কেন ইভা?

'অদ্ভুত ডেকোরেশন, তাই না?' বলল পাশে দাঁড়ানো কিশোর। 'ভূতুড়ে!'

'সাংঘাতিক!'

'ভয় লাগছে?'

'না। তবে গা ছমছম করছে।'

'ভয় আর গা ছমছমের মধ্যে তফাতটা কি?'

'জানি না।...অতিরিক্ত খরচ করেছে ওরা। মাত্র নয়জন মানুষের জন্যে...'

'টাকা আছে, করেছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কিন্তু আমার মন বলছে, কোথায় যেন একটা ঘাপলা আছে...'

'সেটা তো কার্ড পাওয়ার পর থেকেই মনে হচ্ছিল আমার। এলাম তো সেজন্যেই।'

'থাকগে,' দ্বিধাটা ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল মুসা। 'গোয়েন্দাগিরি পরে করলেও চলবে। চলো, আগে পেট ঠাণ্ডা করি। হেঁটে এসে মনে হচ্ছে পাকস্থলীটা একেবারে খালি হয়ে গেছে।'

একধারের দেয়াল ঘেঁষে বস্যানো ডাইনিং টেবিলের দিকে এগোল ওরা। টেবিল মানে বিরাট এক কালো কফিন। বড় বড় গামলার মত পাত্রে রাখা প্রচুর খাবার। খাবারের ছড়াছড়ি। কফিন-টেবিলে খাবার তো আছেই, তার ওপরের একটা লম্বা, চওড়া তাকেও অনেকগুলো গামলা। সেগুলোতে রয়েছে নানা ধরনের চিপস, পিজা, পেপারনি, সসেজ। যত রকমের খাবার চেনে মুসা, প্রায় সবই দেখতে পেল এখানে। অচেনা খাবারও রয়েছে বেশ কিছু। কফিনের পাশে বড় বড় পিপায় বরফে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে রাশি রাশি সোডার বোতল।

'কাণ্ড দেখেছ!' বিমূঢ় হয়ে গেছে মুসা। 'এর চেয়ে অনেক বড় পার্টিতেও এত খাবার দেখিনি আমি!'

'তোমার তো সুবিধেই হলো! গিলতে থাকো,' কিশোর বলল। জেলির চেয়ে নরম, সসের চেয়ে শক্ত, থকথকে লাল জিনিসে ঢাকা একটা খাবারের দিকে আঙুল তুলল। 'এটা কি?'

'টারামা সালাটা,' হঠাৎ করে যেন কিশোরের পাশে এসে উদয় হলো জুন হুফার। মনে পড়ল কানে কম শোনে কিশোর। ভাল কানটার কাছে মুখ এনে চেঁচিয়ে নামটা বলল আবার। 'গ্রীক ডিশ। মাছের ডিম দিয়ে তৈরি। ইভাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। গ্রীসের কোন এক দ্বীপে থাকার সময় নাকি স্থানীয়দের কাছে বানাতে শিখেছে।'

'টেস্ট কেমন?' আনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করল কিশোর। 'দেখো তো মুসা, কেমন লাগে?'

'মাছের ডিম?' বিশেষ আগ্রহ বোধ করল না মুসা। তবু কিশোরের কথায় ছোট একটা চামচ দিয়ে খানিকটা তুলে মুখে দিল। 'ধূর! ফালতু! মাছের ডিম না ঘোড়ার ডিম! আজেবাজে জিনিসে পেট না ভরিয়ে ভাল জিনিসই খাওয়া উচিত। এই পিজাগুলোর চেহারা বরং ভাল মনে হচ্ছে আমার কাছে।'

একটা পিজা তুলে নিয়ে জুন কি পরেছে দেখার জন্যে ফিরে তাকাল সে।

বাইকার গার্লের পোশাক পরেছে জুন। নরম চামড়ায় তৈরি। বাহু আর ঘাড়ে উল্কি এঁকেছে।

ঘাড় কাত করল মুসা, 'ভাল।'

'থ্যাংকস,' খুশি হলো জুন। 'আমার কিন্তু খুব ভাল লাগছে। এরকম পার্টিতে আর কখনও যাইনি, সত্যি!'

সবুজ রঙের জিনিসে সাদা রঙের নরম নরম কি যেন মেশানো একটা অচেনা খাবার চেখে দেখছে কিশোর, আর মুসা পিজা চিবাতে চিবাতে তাকিয়ে দেখছে ঘরের চারপাশটা। এত বেশি ছায়া, কোন কিছু স্পষ্ট করে বোঝা

মুশকিল। এককোণে দানবীয় একটা মানুষের খুলির নিচে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখল রবিন আর টমকে। অতবড় মানুষ যদি সত্যি থাকত, ডাইনোসরের ঘাড় মটকে দিতে পারত। তারমানে ওটা প্লাস্টিকের। বাস্কেটবল খেলোয়াড়ের জার্সি পরে এসেছে টম। এটাই ওর সাজ। বলের বদলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে একটা আসল মানুষের খুলি। সে যে 'দুঃসাহসী'দের দলে, এটা বোঝানোর জন্যেই যেন নিয়ে এসেছে।

রবিন পরেছে যুদ্ধের সময়কার ভলানটিয়ারের পোশাক। হাতে একটা মেগাফোন।

ফায়ারপ্লেসের সামনে নাচতে শুরু করেছে ইভা আর জিম: ভ্যাম্পায়ার আর জোম্বি। ভাল জুটি। দৃশ্যটা বাস্তব লাগছে না মোটেও। হরর সিনেমার দৃশ্য মনে হচ্ছে।

মোট সাতজন মেহমানকে দেখা যাচ্ছে, বাকি দুজন কোথায় ভাবছে মুসা, এই সময় পেছনে শব্দ হলো। ফিরে তাকিয়ে হাঁ হয়ে গেল। পরক্ষণে হেসে উঠল। ডারবি গ্রেগ ব্যাঙ সেজেছে। নরম কাপড়ের সবুজ পাজামা, পায়ে ডুবুরিদের সুইম ফিন–ব্যাঙের পায়ের মতই দেখতে অনেকটা, আর একটা কোলাব্যাঙের চেহারার মুখোশ। বড় বড় কালো দুটো কৃত্রিম চোখ ঠেলে বেরিয়ে আছে ওটা থেকে। মুসার দিকে তাকিয়ে মুখোশ দুলিয়ে বুড়ো ব্যাঙের অনুকরণে ডেকে উঠল, 'ঘাঁ-ঘাঁ! ঘ্যাঁঙ-ঘ্যাঁঙ!'

'করেছ কি!' হাসতে হাসতে বলল মুসা, 'শেষ পর্যন্ত বায়োলজি প্রোজেক্ট নিয়ে একেবারে পার্টিতে।'

'পছন্দ হয়েছে তোমার?' খুশি হলো ডারবি। 'সাদা পাজামাকে আমি নিজে সবুজ রঙ করে নিয়েছি। মা তো দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল। ফিসফিস করে বাবাকে বলছিল ছেলেটার পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়েছে! ওকে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

'ঠিকই বলেছেন,' পাশ থেকে বলে উঠল জুন। 'সাজার অন্য কিছু আর খুঁজে পেলে না। তোমাকে দেখতে সত্যি সত্যি একটা ঘিনঘিনে কোলাব্যাঙের মত লাগছে।'

তাতে আরও খুশি হলো ডারবি। 'তারমানে আমার সাজটাই সবচেয়ে ভাল হয়েছে। জীবন্ত। আমি তো আসলে ব্যাঙ নই, রাজকুমার। জাদুকরী আমাকে জাদু করে ব্যাঙ বানিয়ে রেখেছে। কোন মানুষের মেয়ে আমার গালে চুমু খেলেই আমি আবার মানুষে পরিণত হব।' হাতজোড় করে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলল, 'ওগো, মানুষের মেয়ে, তোমার কাছে মিনতি করছি, অভিশাপ থেকে মুক্ত করো আমাকে।'

'তারচেয়ে বরং ওই জোম্বিটাকে শাপমুক্ত করতে রাজি আছি, তা-ও তোমাকে না।...ওয়াক! থুহ্!' কিশোরের দিকে তাকাল জুন। 'নাচবে আমার সঙ্গে?'

দুই হাত নেড়ে তাড়াতাড়ি বলল কিশোর, 'মাপ চাই। আমি ওসবের মধ্যে নেই।'

নাচ থামিয়ে সরে এল ইভা। তার জায়গা গিয়ে দখল করল জুন। নাচার জন্যে জিমের হাত ধরল। দ্রুতলয়ের নাচের বাজনা বেজে উঠল। নাচতে শুরু করল দুজনে।

মুসার দিকে তাকাল কিশোর। 'মুসা, কেমন লাগছে খেতে? দুনিয়ার কোন দেশের খাবার আর বাকি রাখেনি। গ্রীক, জাপান, ফ্রেঞ্চ, মেক্সিকো...'

'যত যা-ই বলো, আমেরিকান পিজার ধারেকাছে আসতে পারবে না কোনটা।'

'সব না খেয়েই কি করে বলে দিলে? এদিকে এসো। দেখো তো এটা কি জিনিস? আমার অনুমানেরও বাইরে। এই বয়েসেই এত রান্না শিখল কি করে ইভা! সত্যি, ট্যালেন্ট আছে।'

'জিজ্ঞেস করো, কোনখান থেকে শিখল।'

মিউজিক বদলে গিয়ে নতুন একটা গান শুরু হলো। সঙ্গে সঙ্গে নাচের ধরনও বদলে দিল জুন আর জিম।

ডারবি করল এক মজার কাণ্ড। রবিনকে টেনে হলের মাঝখানে নিয়ে এসে ব্যাঙের নাচন শুরু করল। ব্যাঙ বনাম মেগাফোন হাতে ভলান্টিয়ার। সে এক দেখার মত দৃশ্য। হল জুড়ে হাসির হুল্লোড় উঠল।

ধীরে ধীরে আনন্দ বাড়ছে। 'চমৎকার পার্টি,' মুসা ভাবছে।

আর কিশোর ভাবছে, 'এখনও বুঝলাম না, আমাকে কেন দাওয়াত করল!'

থেমে গেল বাজনা। টেপ শেষ। বদলে দিতে গেলেন মেয়ার। দরজায় জোরে জোরে থাবা দিতে লাগল কেউ। দেখতে গেল ইভা। সবাই ঘুরে তাকাল কে এসেছে দেখার জন্যে।

নীরব হয়ে গেল ঘরটা। সবাই চুপ। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে আপাদমস্তক রূপালী পোশাক পরা একটা মূর্তি। বুলফাইটারদের ভঙ্গিতে গলা লম্বা করে একটা হাত আর পা বাড়িয়ে দিল সামনে, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘরে ঢুকল। রূপালী মুখোশে মুখ ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শরীর দেখেই ওকে চিনতে পারল সবাই। স্কিনটাইট পোশাকের নিচে হাঁটার তালে তালে ঢেউ খেলে যাচ্ছে পেশিতে।

মুসার পাশে সরে এল কিশোর। ফিসফিস করে বলল, 'ভাল ড্রেস নিয়েছে তো ভিকি। ফ্যান্টাসটিক লাগছে ওকে।'

'হ্যাঁ।'

শিস দিয়ে উঠল একজন। চিৎকার করল আরেকজন। কলরব করে ভিকিকে স্বাগত জানাতে লাগল তার দলের সদস্যরা।

হাততালি দিল ইভা। ঘোষণা করার ভঙ্গিতে বলল, 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান, একজন রূপালী রাজকুমারকে উপহার দিচ্ছি আপনাদের।'

ইভার কথা শুনে গর্বে যেন আর মাটিতে পা পড়তে চাইল না ভিকির। ঘরের বাকি অংশটুকু এমন ভঙ্গিতে পার হয়ে এল, যেন টাইটানিক ছবির নায়ক হয়ে গেছে।

মুসা বলল, 'যাহ্, দিল পেটটা ফুলিয়ে। পেট ফেটে না মরে এখন। ওর

এই অহঙ্কারী ভঙ্গি আর যাবে না কোনকালে!'

কথাটা শুনতে পেল না ভিকি। পেলে নিশ্চয় কড়া জবাব দিত।

এই সময় আবার বেজে উঠল বাজনা। তালে তালে পা দুলিয়ে একাই না
শুরু করে দিল ভিকি।

'একেবারে বেহায়া!' না বলে আর পারল না কিশোর। 'ওর সঙ্গে তোমা
বন্ধুত্ব হয়েছিল কি করে?'

'বেহায়ামিটা ওর দোষ, তবে...' কথাটা শেষ করতে পারল না মুসা।

হঠাৎ বুম করে বিকট এক শব্দ। বোমা ফাটল যেন। চমকে গেল সবাই।

'কি হলো?' চিৎকার করে উঠল কে যেন।

সুইচ অফ করে থামিয়ে দেয়া হলো বাজনা।

ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে ঘর। কি হয়েছে কিছুই বুঝতে না পেরে চেঁচামে
শুরু করে দিল সবাই। কিসের শব্দ, ধোঁয়া আসছে কোথা থেকে, কেউ বুঝ
পারছে না।

মুসাকে নিয়ে দরজার দিকে এগোতে যাবে কিশোর, এই সময় ঘরে
মাঝখানে এসে দাঁড়াল ইভা। হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল আমা
চমক? একে বলে ফ্ল্যাশ পট। থিয়েটারে কিছুদিন ম্যানেজারি করেছিলে
আঙ্কেল। তখন শিখেছেন। তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি এভাবে
সফল হয়েছি তো?'

কিশোরের মনে হলো, কথাবার্তা, চালচলন, সব কিছুতেই অতিরি
নাটকীয়তা করছে ইভা। আসল ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে না কিছুতেই। মুসা
ধারণাই ঠিক–কোথায় যেন কি একটা ঘাপলা রয়েছে। ধরা যাচ্ছে না।

ইভার কথায় হাততালি দিল দু'তিনজন। কয়েকজন এখনও চমকে
ধাক্কাটাই কাটাতে পারেনি।

হেসে একটা ভুরু উঁচু করল ইভা। 'আমি তোমাদের বলেইছিলাম, না
রকম চমকের ব্যবস্থা থাকবে। মাত্র শুরু। আরও অনেক কিছুই আসবে এ
একে।...হ্যাঁ, নাচ কি শেষ করে দেয়া হবে? নাকি আরও নাচার ইচ্ছে আ
কারও?'

কেউ বলল, নাচ চলুক, কেউ বলল, নতুন কিছু হোক। একমত হ
পারল না সবাই। শেষে ইভা বলল, 'যদি কিছু মনে না করো, ছোট্ট এক
লেকচার দিই। ইতিহাস বলে, সেই প্রাচীনকাল থেকেই নাচ পছন্দ ক
এসেছে মানুষ। মধ্যযুগে নাচকে শুধুই আনন্দ আর মজা করার প্রক্রিয়া হিসে
না নিয়ে আরও সিরিয়াসলি নিয়েছিল কিছু মানুষ। তারা মনে করত, নাচার স
কারও কারও ওপর শয়তান ভর করে। একবার নাচতে শুরু করলে অ
থামতে পারত না ওরা। আরও দ্রুত, আরও দ্রুত নাচতে গিয়ে শেষে মৃত্যু
কোলে ঢলে পড়ত। সেকথা ভেবেই খুব দ্রুতলয়ের কিছু মিউজিক জোগ
করেছি আমি। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নাচতে গেলে নাচতেও হবে খুব দ্রুত
আমার কথা শোনার পর কারও কি দ্রুত নাচার সাহস হবে?'

'হবে!' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল একজন। তার সঙ্গে গলা মেলাল আর

কয়েকজন।

'বেশ, শুরু হোক তাহলে,' ইভা বলল।

'হোক।'

উত্তেজিত হয়ে উঠেছে উগ্ররা। তাদেরকে যদি এখন ফুটন্ত পানির সুইমিং পুলে সাঁতরাতে বলে ইভা, তাহলেও যেন পিছিয়ে আসবে না। মুসার তো সন্দেহই হতে লাগল–মাথায় গণ্ডগোল আছে ইভার। নিজের লেজ কাটা বলে সবার লেজ কাটতে চাইছে না তো? দাওয়াত দিয়ে এনে সবাইকে পাগল করে দেয়ার মতলব? আচমকা বোমা ফাটিয়ে স্নায়ুর ওপর চাপ সৃষ্টি, নাচতে নাচতে মরে যাওয়ার কাহিনী শুনিয়ে দ্রুত নাচার পরামর্শ...

'দেখা যাবে কে বেশি দ্রুত নাচতে পারে,' মেহমানদের খুঁচিয়ে যেন আরও উত্তেজিত করে দেয়ার চেষ্টা চালাল ইভা।

ব্যাপারটা মুসার যেমন সন্দেহ জাগিয়েছে, কিশোর আর রবিনেরও ভাল লাগল না। কাছে সরে চলে এল রবিন। কিশোরের ভাল কানটার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'ঘটনা কোন দিকে যাচ্ছে, বলো তো?'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'বুঝতে পারছি না। এটুকু বোঝা যাচ্ছে, কিছু একটা করার ফন্দি এঁটেছে ইভা। সেটা ভাল কিছু না-ও হতে পারে।'

পেছনের দেয়ালের কাছে সরে গেল ইভা। হাত বাড়িয়ে একটা সুইচ টিপতেই চোখের পলকে নিভে গেল দেয়ালের খাঁজে খাঁজে লুকানো সমস্ত মোমবাতি। জ্বলে উঠল একটা মাত্র আলো, টর্চের আলোকরশ্মির মত, তবে অনেক বেশি মোটা হয়ে ছাত থেকে খাড়া এসে পড়ল মেঝেতে। বেজে উঠল দ্রুতলয়ের বাজনা। যেমন দ্রুত, তেমনি জোরে। এমনই বাজনা, যে নাচতে চায় না, তারও পা নাচানো শুরু হয়ে যায় নিজের অজান্তে।

নতুন করে কাঠ না ফেলাতে ফায়ারপ্লেসের আগুনও নিভে গেছে। ধিকিধিকি জ্বলছে কেবল পোড়া কয়লা।

গোল আলোটার নিচে প্রথমেই চলে গেল ডারবি। খানিকক্ষণ তার ব্যাঙ-নৃত্য দেখিয়ে হাসাল সবাইকে। তাল নেই কিছু নেই, তিড়িং-বিড়িং করে কিছু লাফঝাঁপ দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে সরে চলে এল আলোর নিচ থেকে।

মুসা, কিশোর কিংবা রবিন, কাউকেই নাচতে রাজি করাতে পারল না জুন। শেষে গিয়ে ভিকির সঙ্গী হলো। কিন্তু বেশিক্ষণ চালাতে পারল না। এতই দ্রুতলয়ের বাজনা, কয়েক মিনিটেই পায়ের পেশিতে খিঁচ ধরে যাওয়ার অবস্থা। সরে এল সে। বাহাদুরি দেখানোর জন্যে ভিকি অবশ্য একাই চালিয়ে গেল। রূপালী একটা চরকির মত বনবন করে পাক খেতে লাগল সে। তবে সঙ্গী না থাকলে নাচের মজা থাকে না।

বিষণ্ণ গোঙানির মত শব্দ করে আচমকা বন্ধ হয়ে গেল মিউজিক। নিভে গেল আলো। ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কয়লার কমলা আভা ছাড়া ঘর এখন পুরোপুরি অন্ধকার।

'কি হলো, ইভা?' জানতে চাইল জিম, 'নতুন কোন চমক?'

'বুঝলাম না। কি হলো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলে মেয়ারকে ডাকতে শুরু

করল ইভা, 'আঙ্কেল, আঙ্কেল...'

'কারেন্টের গোলমাল বোধহয়,' শান্তকণ্ঠে জবাব দিলেন মেয়ার। 'দাঁড়াও, ফিউজ বক্সটা দেখে আসি। যেখানে আছ, দাঁড়িয়ে থাকো। কেউ নোড়ো না।'

'যাও, আমরা আছি।' ইভার কণ্ঠ শুনে মনে হলো ভয় পেয়েছে। তবে সেটা ওর অভিনয় কিনা বোঝা গেল না। এই হঠাৎ কারেন্ট চলে যাওয়ার ব্যাপারটাও হয়তো সাজানো, আরেকটা চমক। 'যে আলোটার নিচে নাচছিলে সেটা অনেক বেশি পাওয়ারের। সিসটেমটা নতুন বসানো হয়েছে। পরীক্ষা করা হয়নি আর। আজকেই চালু করা হলো।...অতিরিক্ত গরম হয়ে গিয়ে বোধহয় ফিউজ কেটে দিয়েছে...ভয় নেই। দাঁড়িয়ে থাকো।'

মোমগুলো সব একসঙ্গে জ্বলে উঠল আবার। বোঝা গেল, ওগুলো কৃত্রিম মোম। আসলে বৈদ্যুতিক আলো। এমন ভাবে তৈরি, মনে হয় আসল মোমই জ্বলছে। বাজনাও শুরু হয়ে গেল আবার। তবে নাচতে এগোল না আর কেউ। ভিকিও না। সবার নজর ফায়ারপ্লেসের দিকে।

ওটার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা কঙ্কাল। অর্ধেক শরীর কার্পেটের ওপর, বাকি অর্ধেক বাইরে। পিঠে বেঁধা বড় একটা ছুরি। ফলাটা পুরো ঢুকে গেছে। খাড়া হয়ে রয়েছে বাঁটটা। রক্তে ভিজে গেছে ক্ষতস্থানের চারপাশ।

ছয়

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ নড়ল না, কথাও বলল না। তারপর একসঙ্গে শুরু হলো চিৎকার। মুসার হৃৎপিণ্ডটা এত জোরে লাফাতে লাগল, তার মনে হলো ঢিবঢিব শব্দটা সে নিজেই শুনতে পাচ্ছে।

চতুর্দিকে হট্টগোল, নানা রকম কথা:

'ওহ্, খোদা, এ-কি হলো!'

'এ হতেই পারে না!'

'আরে দেখো না গিয়ে কে?'

'অ্যামবুলেন্স ডাকা দরকার!'

'আগে পুলিশকে ফোন করো। ওরাই ডাক্তার নিয়ে আসবে!'

সবার আগে পা বাড়াল কিশোর। পেছনে এগোল তার দুই সহকারী। দেখাদেখি অন্য সবাই এগোতে শুরু করল। পড়ে থাকা কঙ্কালটা আসলে কঙ্কাল নয়, কঙ্কাল সেজেছে। কে?

তিন গোয়েন্দার আগেই গিয়ে লাশের কাছে বসে পড়ল ভিকি। ও যে কতবড় দুঃসাহসী বোঝানোর জন্যে গায়ে হাত দিল। ওকে এবং আরও অনেককে চমকে দিয়ে একলাফে উঠে বসল কঙ্কাল।

'কেমন বুঝলে? দিলাম তো হাঁ করিয়ে!' বলে হাসিতে ফেটে পড়ল

কঙ্কালের পোশাক পরা হেনরি কার্টারিস।

চমকটা কাটতে সময় লাগল। আস্তে করে হাসল একজন, যেন হাসতে ভয় পাচ্ছে। আরেকজন হাসল। শেষে সবাই মিলে এমন হাসি শুরু হলো, ঘর কাঁপিয়ে দিল।

'নম্রদের পক্ষে এক পয়েন্ট,' ঘোষণা করল ডারবি।

'দারুণ দেখালে, হেনরি,' পিঠ চাপড়ে দিল মুসা।

'সত্যি ভাল,' প্রশংসা করল রবিন। 'কিন্তু দলের সবাইকে একটা ইঙ্গিত দিয়ে রাখতে পারতে। ঘাবড়ে দিয়েছিলে একেবারে।'

'সেটাই তো চেয়েছিলাম। দলের সবাই না ভড়কালে বিরোধী দল সন্দেহ করে বসত। তাতে আসল চমকটা সৃষ্টি হত না, পয়েন্টও পেতাম না। তবে আর কেউ না জানলেও ইভা জানে, তার সঙ্গে পরামর্শ করেই করেছি সব। ওর সাহায্য ছাড়া পারতাম না। প্রথমে দিলাম মেইন সুইচ অফ করে। তারপর অন্ধকারের মধ্যে এসে শুয়ে পড়লাম ফায়ারপ্লেসের সামনে।' টান দিয়ে পিঠ থেকে ছুরিটা খুলে আনল হেনরি। শুধুই হাতল, ফলাটলা কিছু নেই। হালকা খাপের মত প্লাস্টিকের জিনিসটা আঠা আর টেপ দিয়ে আটকে নিয়েছিল পিঠে। 'রক্ত বের করেছি একটা টিউবের সাহায্যে,' বুঝিয়ে বলল সে। 'সিনেমার একজন টেকনিশিয়ানের কাছে শুনেছিলাম, এক ধরনের টিউবে রক্তের রঙের রাসায়নিক তরল পদার্থ ভরে পোশাকের নিচে রেখে দেয়া হয়। ধীরে ধীরে সেটা বেরিয়ে এমন করে ছড়িয়ে পড়ে, মনে হয় রক্ত বেরোচ্ছে।'

হেসে উঠল জিম, 'আমি আগেই জানতাম, এমন কিছুই করেছ। মোটেও ভয় পাইনি আমরা।'

'সে-তো বটেই,' হর্ন-রিমড চশমাটা কঙ্কালের মুখোশের ওপর পরে নিল হেনরি। তাতে ভারিক্কি চেহারার একজন 'সম্ভ্রান্ত কঙ্কাল' হয়ে উঠল সে। 'ভয় পেয়েছ কিনা সেটা সবাই দেখেছে।' হাত নেড়ে জিমকে উড়িয়ে দিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হেনরি, 'খাবার কোথায়? খিদেয় মরে যাচ্ছি। রান্নাঘরের মধ্যে এতক্ষণ এভাবে লুকিয়ে থাকা যায়! উফ্...'

এত নাচানাচি আর বার বার চমক ক্লান্ত করে দিয়েছে অনেককে। সোফায় হেলান দিল ওরা। খেতে খেতে কথা বলতে লাগল।

'হুঁহ্, খেয়ে আর কাজ পেল না!' একটা অ্যানটিক চেয়ারে বসে, হাতলে পা তুলে দিয়ে দোলাতে শুরু করল টম। 'কঙ্কাল সেজেছেন! কবে পচে বাসি হয়ে গেছে এসব।'

'কিন্তু ধরতে তো পারলে না,' রবিন বলল। 'ঠকাটা ঠিকই খেলে। পারলে না আমাদের সঙ্গে।'

চটে উঠল টম। 'পারলাম না মানে? এখনও তো শুরুই করিনি আমরা। টের পাবে। যদি প্যান্ট ভেজাতে না চাও, সময় থাকতে কেটে পড়ো।'

'তোমরা ভেজাবে? আমাদের প্যান্ট? হুঁহ্!' ঠোঁট বাঁকাল ডারবি। 'কত হাতিঘোড়া...'

'পণ্ডিতি রাখো!' হাত নাড়ল ভিকি। 'এসব বাল্যশিক্ষা শুনতেও এখন রাগ

লাগে...'

কিশোর কোন মন্তব্য করল না। সবার ঠোঁটের দিকে নজর।

নীরবে খাবার চিবাচ্ছে মুসা।

ওদের মুখোমুখি একটা অ্যানটিক বেঞ্চের হাতলে বসেছে ভিকি। কেউ আর কিছু বলছে না দেখে বলল, 'এক পয়েন্টে এগিয়ে থেকে অবশ্য খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না তোমরা।'

'খালি বাগাড়ম্বর! ওই এক পয়েন্টই নাও না আগে,' মুখ না খুলে আর পারল না মুসা, 'সমান সমান হোক। তারপর তো আরও একটা পয়েন্ট লাগবে জেতার জন্যে। ইতিমধ্যে আমরাও কি বসে থাকব নাকি?'

খোঁচা মারল ডারবি, 'ষাঁড়ের মতন একখান দেহ থাকলেই শুধু হয় না। এসব কাজে গায়ের চেয়ে মগজের জোরটা বেশি দরকার...'

'আহারে, কি আমার ডবল আই-কিউওয়ালা আইনস্টাইন?' কর্কশ হয়ে উঠল ভিকির গলা।

এই তর্কাতর্কি যে হাতাহাতিতে রূপ নিতে সময় লাগবে না বুঝতে পেরে কড়া গলায় বলল কিশোর, 'আচ্ছা, এই দলাদলিটা বন্ধ করতে পারো না তোমরা? এসেছিলাম মজা করতে। কিন্তু তোমরা যা শুরু করেছ, সত্যি ভয় পাচ্ছি আমি, কি ঘটাবে খোদাই জানে! রক্তারক্তি না করে বসো!'

তবে তেমন কিছু ঘটানোর আগেই আবার বেজে উঠল নাচের বাজনা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ডারবিকে নাচে আহ্বান জানিয়ে বসল কিশোর। অন্য কেউ না বুঝলেও মুসা আর রবিন ঠিকই বুঝল, পরিবেশটাকে হালকা করতে চাইছে কিশোর। অঘটন ঠেকাতে চাইছে।

মুসার দিকে তাকাল ভিকি। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখে চোখ আটকে রইল দুজনের। নরম হয়ে এল ভিকির দৃষ্টি। যেন বোঝাতে চাইল—এত খাতির ছিল তোমার সঙ্গে আমার! অথচ কি থেকে কি হয়ে গেল! কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না সে। চোখ ফিরিয়ে নিল।

উঠে ফায়ারপ্লেসের কাছে চলে এল মুসা। ভাবছে, কি বলতে চাইল ভিকি? ওর আচরণে ঠিক শত্রুতা প্রকাশ পাচ্ছে না। পুরানো সম্পর্কটাকে কি আবার ঝালাই করে নিতে চায়?

বেঞ্চ থেকে উঠে এল ভিকি। কিশোর আর ডারবির কাছে এসে দাঁড়াল। কিশোরকে বলল, 'তোমাকে কিন্তু নাচতে দেখিনি কখনও। ভালই তো পারো। নাচবে আমার সঙ্গে?'

কোন রকম দ্বিধা নেই কিশোরের। ডারবির হাত ছেড়ে দিয়ে হেসে রসিকতা করে বলল, 'এসো। কোলাব্যাঙের সঙ্গে লাফালাম, এবার সিলভার প্রিন্সের সঙ্গে ঘুরপাক খেয়ে দেখা যাক কেমন লাগে।'

কিশোর হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় যেন হতাশ হয়েই গিয়ে আবার রবিনকে পাকড়াও করল ডারবি। কি যেন বলল। জোরে হেসে উঠল রবিন।

জুনের সঙ্গে নাচতে শুরু করেছে ওদিকে টম। ভাল নাচে সে। ভিকি গিয়ে কিশোরের সঙ্গে হাত মেলানোতে টমও যেন অনেকটা নরম হয়ে গেছে।

উদ্ধত ভঙ্গিটা আর নেই।

ভালই হচ্ছে–ভাবল মুসা। দলাদলি তারও ভাল লাগছিল না। সর্বক্ষণ একটা টেনশন। চুপচাপ দাঁড়িয়ে না থেকে সে-ও নাচবে কিনা ভাবতে শুরু করেছে, এই সময় পেছন থেকে কথা বলে উঠল একটা সুরেলা কণ্ঠ, 'নাচবে নাকি?'

ফিরে তাকাল মুসা। হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। 'আমিও নাচার কথাই ভাবছি.' যেন মুসার মনের কথা পড়তে পারছে সে। 'তুমি ভাবছ, আমিও ভাবছি, কেমন কাকতালীয় হয়ে গেল না?' হাত বাড়িয়ে দিল। 'এসো।'

একজন মেয়ের সঙ্গে নাচবে! দ্বিধায় পড়ে গেল মুসা। সে চাইছিল ডারবি কিংবা রবিনকে, ভিকির সঙ্গে হলেও এ মুহূর্তে দ্বিমত করত না। কিন্তু মেয়ে! তা-ও ইভা! আমতা আমতা করে বলল, 'কিন্তু আমি তো···নাচতে জানি না···'

'কে-ই বা জানে,' মুসার একটা হাত চেপে ধরল ইভা। 'এখানে জানাজানির প্রয়োজন নেই। আনন্দ করতে পার্টি দিচ্ছি, আনন্দ করব, ব্যস।'

কিন্তু কিছুতেই জড়তা কাটাতে পারল না মুসা। বার বার অসহায়ের মত করুণ চোখে তাকাচ্ছে রবিন আর কিশোরের দিকে। মনেপ্রাণে চাইছে ওরা কেউ এসে ওকে বাঁচাক। কিন্তু কেউ এল না। মুসার অবস্থাটা বুঝে ফেলেছে ওরা। চলুক এই নাচ। পরিস্থিতি আরও হালকা হোক। কিশোর চাইছে হাসি-আনন্দের মাঝে দলাদলিটা ভুলে যাক সবাই।

বেতালে পা ফেলছে মুসা।

মুখ ঝামটা দিল ইভা, 'আরে কি করছ! ওদিকে তাকিয়ে আছ কেন? হ্যাঁ, বলো এখন, পার্টি কেমন লাগছে?'

'ভা-ভা-ভাল!' ঢোক গিলল মুসা। ইভার হাতের শক্তি দেখে অবাক হলো। রীতিমত পুরুষ মানুষের মত গায়ের জোর।

'সবাই মজা পাচ্ছে এখন, তাই না? আমিও এটাই চাই, মজা পাক।'

'যাই বলো, বিশাল আয়োজন করেছ তুমি,' ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছে মুসা। 'তুমি আর তোমার আঙ্কেল···এত খাবার, এত সাজসজ্জা, আলো, মিউজিক···'

'আঙ্কেল এখন কোথায় আছে, জানো? চিলেকোঠায়। আরও কিছু চমকের ব্যবস্থা করছে।'

'খাইছে! আরও চমক? তোমার মাথায়, সত্যি, অনেক বুদ্ধি!'

'খাইছে বলাটা তোমার মুদ্রাদোষ বুঝি?···আরে না না, এমনি কথার কথা বললাম, আবার শক্ত হয়ে যাচ্ছ কেন?'

লাজুক হাসি হাসল মুসা, 'না, শক্ত হচ্ছি না।'

আগের প্রসঙ্গে এল ইভা, 'অনেক সময় নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়ে একেকটা বুদ্ধি বের করেছি আমি আর আঙ্কেল।'

কয়েক মিনিট পর থেমে গেল মিউজিক। টেপ শেষ। ইভার হাত ছেড়ে দিয়ে সরে এল মুসা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, এই পার্টিতে নাচের কথা আর একটিবারের জন্যেও ভাববে না। আসলে ভিকির কথা

ভেবেই...

হঠাৎই আবিষ্কার করল মুসা, ভিকির ব্যাপারে তার মনও নরম হয়ে আসছে। তারমানে পুরানো বন্ধুত্বটা ফেরত চায় সে-ও।

মিউজিক বন্ধ হয়ে যাওয়াতে নাচ থামিয়ে দিয়েছে সবাই। ফায়ারপ্লেসের কাছে রুমাল দিয়ে গলার ঘাম মুছছে কিশোর। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ভিকি। হেসে হেসে কথা বলছে ওরা।

ওদের দিকে এগোতে গিয়ে আচমকা হোঁচট খেয়ে যেন থেমে গেল মুসা। ফিরে তাকাল দরজার দিকে। গুঁতো মারছে কিসে যেন। গোঁ গোঁ করছে শক্তিশালী এঞ্জিন।

দরজার কাছাকাছি রয়েছে ডারবি। এগিয়ে গিয়ে খুলে দিল।

হেডলাইটের উজ্জ্বল আলো এসে পড়ল ঘরের মধ্যে। চোখ ধাঁধিয়ে দিল মুসার।

গর্জন করতে করতে ঘরে ঢুকল দুটো মোটর সাইকেল।

সাত

হাঁ করে তাকিয়ে আছে সবাই। প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না। চেয়ে চেয়ে দেখছে। মোটর সাইকেল আরোহীদের গায়ে চামড়ার জ্যাকেট, পরনে চামড়ার প্যান্ট। কালো চকচকে হেলমেটে ঢাকা মুখ।

'কে হে তোমরা?' এটাও ইভার নতুন আরেকটা চমক ভেবে হালকা স্বরে জিজ্ঞেস করল ডারবি।

কয়েক হপ্তা আগে দেখা Animal House ছবির দৃশ্যের কথা মনে পড়ল মুসার। তাতে একটা লোককে মোটর সাইকেল নিয়ে নানা রকম কাণ্ড করতে দেখেছিল। এই দুজনও তাই করছে। মোটর সাইকেল চালিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে চলে এসেছে ঘরে।

অ্যাক্সিলারেটর ঘুরিয়ে কয়েকবার বিকট কানফাটা গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে অবশেষে এঞ্জিন বন্ধ করে দিল দুই আরোহী। হেলমেট খুলে নিল একজন। বাইক থেকে নামল।

রিচার্ড জোনস! রিজো! চোখ লাল। নেশাটেশা করে এসেছে বোধহয়। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে চেহারা। কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'নাইস পার্টি!'

তার সঙ্গী হগও হেলমেট খুলে নিল। হাতের ওপর রেখে ঘোরাতে লাগল ওটা। ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ভাল সাজিয়েছ তো। আমাদের বাদ দিয়ে এমন একটা পার্টি করার কথা ভাবলে কি করে!'

'দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে কেন?' জিজ্ঞেস করল রিজো। 'আমাদের ভয়ে?'

সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইভা। রাগে শক্ত হয়ে গেছে চোয়াল। বরফ-শীতল

কণ্ঠে বলল, 'চলে যাও এখান থেকে!'

'যাব?' রিজো বলল, 'সবে তো এলাম।'

'এলে কেন? দাওয়াত দিয়েছি নাকি?' গলা কাঁপছে ইভার। ভয়ে নয়, রাগে। ভয় সে মোটেও পায়নি।

'না দিলে কি? আমরা জোর করেই নিলাম। আমাদের বাদ দিয়ে পার্টি করতে পারবে না.' সিনেমার ভিলেনের মত দাঁত বের করে হাসল রিজো।

এগিয়ে এলেন আঙ্কেল মেয়ার। ইভাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা কে?'

'দুটো ভাঁড়!' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে ইভার কণ্ঠ। 'ওদের কার্ড দেয়া হয়নি। বেহায়ার মত এসে ঢুকেছে।'

রিজো আর হগের দিকে তাকালেন মেয়ার। বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, 'দেখো, এখনই চলে গেলে আর পুলিশ ডাকব না।'

'শুনলি?' সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে ফ্যাকফ্যাক করে হাসল রিজো। 'পুলিশ ডাকবেন না!'

হগও তার সঙ্গীর মতই দাঁত বের করে হাসতে লাগল। আচমকা জোরে এক ধাক্কা মারল মেয়ারের বুকে। পেছনে উল্টে পড়ে গেলেন তিনি, একটা টেবিলের ওপর।

'আঙ্কেল!' চিৎকার করে উঠল ইভা।

তাঁকে ধরে তোলার জন্যে এগিয়ে এল কয়েকজন। তাদের মধ্যে রবিনও রয়েছে।

মুসার পাশে এসে দাঁড়াল কিশোর।

'সরি! না বুঝে ধাক্কা দিয়েছে। অ্যাক্সিডেন্ট।' বন্ধুর হয়ে সাফাই গাইল রিজো। চোখ টিপে রসিকতা করল। এগোতে গিয়ে টলে উঠল। বুঝতে আর অসুবিধে হলো না কারও, নেশা করেই এসেছে দুজনে।

চিৎকার করে উঠল ইভা, 'ভাগো এখান থেকে, শয়তান কোথাকার!'

কান দিল না রিজো। হগের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভাল সাজিয়েছে, কি বলিস, হগ? এক্কেবারে তোর ঘুমানোর খোঁয়াড়টার মত লাগছেরে।'

যেন মস্ত রসিকতা করে ফেলেছে। মজা পেয়ে হো-হো করে হাসতে লাগল দুজনে।

'আহারে, মাকড়সার জালে একেবারে ছেয়ে আছে,' হগ বলল। 'আয়, সাফ করে দিই। এত নোংরার মধ্যে পার্টি চালাতে পারবে না।' বেল্টের লুপ থেকে একটা সাইকেলের চেন খুলে নিল সে। চোখ পড়ল ফায়ারপ্লেসের ওপরে সাজানো কয়েকটা দামী ফ্লাওয়ার ভাসের দিকে। এক বাড়িতে ফেলে দিল সেগুলো। বাড়ি লেগে ভাঙল কয়েকটা, বাকিগুলো ভাঙল মাটিতে পড়ে।

তাকিয়ে আছে মুসা। কেউ কিছু করছে না কেন এখনও? বাধা দিচ্ছে না কেন ওদের?

জানালার কাছে ডেকোরেশনগুলো ভাঙতে আরম্ভ করল দুজনে।

আর চুপ থাকতে পারল না মুসা। 'দেখো, বন্ধ করো এসব!'

হগের দিকে এগোল সে।

চোখের পলকে সামনে চলে এল রিজো। কি করল সে, বুঝতে পারল না মুসা, টের পেল প্রচণ্ড আঘাতে ঝটকা দিয়ে মাথাটা পেছনে সরে গেল ওর। পরক্ষণে আরেকটা আঘাত। চিত হয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল বোধহয়। চোখ মেলে দেখল দুদিক থেকে ওর ওপর ঝুঁকে রয়েছে কিশোর আর রবিন।

উঠতে গেল মুসা। ঠেলে আবার তাকে শুইয়ে দিল কিশোর, 'থাক, উঠো না।'

'ঘাড়টা মটকে গেল নাকি কাল্লুটার?' খিকখিক করে হাসতে লাগল রিজো। সবার দিকে আহ্বান জানাল, 'আর কারও ঘাড় ভাঙানোর ইচ্ছে আছে? এসো, পয়সা লাগবে না। আজ যা করব, সব ফ্রী।'

হেসে উঠল হগ। দারুণ আনন্দে কালো দস্তানা পরা হাতে একে অন্যের পিঠ চাপড়ে গলা ফাটিয়ে হাসতে লাগল ওরা।

আবার ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ইভা। রেগেই আছে। তবে মুসাকে এত সহজে ধরাশায়ী হতে দেখে বোধহয় ঘাবড়েও গেছে কিছুটা।

'বেশ,' বলল সে, 'স্বীকার করছি তোমাদের দাওয়াত না দিয়ে ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু এখন আর সেটা শোধরানো সম্ভব নয়। মাত্র নয়জনের ব্যবস্থা করেছি আজকে। ভালয় ভালয় যদি চলে যাও এখন, কথা দিচ্ছি, শুধু তোমাদের দুজনের জন্যেই একটা পার্টি দেব আমি। পরের সপ্তাহেই।'

'তা দিয়ো। এখনও খুব একটা খারাপ নেই আমরা।' ইভার কথায় পটল না রিজো। 'ভালই তো লাগছে।' খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল সে। ডারবি আর জুন দাঁড়িয়ে ছিল ওটার কাছে, তাড়াতাড়ি সরে গেল।

খানিকটা টারামা সালামা মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দিল রিজো, 'কি রে ভাই এটা? পচা মাছ চটকানো নাকি? উহ্, কি দুর্গন্ধ!' ইভার দিকে ফিরে রাগত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল কিছু নেই নাকি তোমার এখানে? চিপস? পিজা?'

'ওই যে তাকটায় দেখো। যা ইচ্ছে নাও। নিয়ে বিদেয় হও...'

'ড্রিংকস?' মেয়ারের দিকে ঘুরল হগ। নিচু একটা টুলে বসে আছেন তিনি। অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁকে। 'অ্যাই বুড়ো, মদের বোতলগুলো কোথায় রাখো?'

'আমি মদ খাই না,' কাটা জবাব দিলেন মেয়ার। 'বাড়িতে কারও জন্যেই মদ রাখি না আমি।'

'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম না,' ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল হগ। 'কেমন লোক তুমি, মেহমানের খাতির করতে জানো না!' মেয়ারের জামার কলার চেপে ধরল সে।

'খবরদার!' চাবুকের মত শপাং করে উঠল একটা কণ্ঠ। থমকে গেল হগ। একটা রূপালী ঝিলিকের মত তার দিকে ছুটে গেল ভিকি। পেছন থেকে হগের কলার চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে আনল মেয়ারের কাছ থেকে।

রাগে ফুঁসে উঠল হগ। সে কিছু করার আগেই তিন লাফে পৌঁছে গেল

রিজো। পেছন থেকে ধরে টেনে সরিয়ে নিল ভিকিকে। এই সুযোগে ধাঁ করে তার পেটে লাথি মারল হগ।

ব্যথায় ককিয়ে উঠে বাঁকা হয়ে গেল ভিকির দেহটা। পেট চেপে ধরে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে। শরীরটাকে কুণ্ডলী পাকিয়ে দম নেয়ার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল।

'আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট,' ভিকিকে ডিঙিয়ে অন্যপাশে চলে গেল রিজো।

আবার ভাঙচুর শুরু করল দুই মস্তান। মদের বোতল খুঁজতে গিয়ে প্রতিটি দরজা, আলমারি যা পেল খুলতে লাগল। ভেতরের জিনিস ছড়িয়ে ফেলল মেঝেতে।

কেউ বাধা দেয়ার জন্যে সাহস করে এগোতে গেলেই সাইকেলের চেইন ঘুরিয়ে হুমকি দেয় রিজো।

'এসব বন্ধ করা দরকার,' কিশোরের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলল মুসা।

ওর ঠোঁট নড়া দেখেই কথা বুঝে নিল কিশোর। আস্তে মাথা কাত করে মোটর সাইকেল দুটোর দিকে ইঙ্গিত করল।

টমের দিকে তাকাল মুসা। চোখে চোখ পড়তেই মাথা ঝাঁকাল টম। সে-ও সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

আস্তে করে উঠে বসল মুসা। ইঞ্চি ইঞ্চি করে খুব ধীরে এগোতে শুরু করল। মোটর সাইকেলের কাছাকাছি গিয়ে ফিরে তাকাল কিশোরের দিকে।

নীরবে ঠোঁট নাড়ল কিশোর। লিপ রীডার না হয়েও ও কি বলছে বুঝতে পারল মুসা। বলল, 'এগোতে থাকো।'

পাশে সরে হাত বাড়িয়ে আলগোছে একটা মোমবাতির স্ট্যান্ড তুলে নিল কিশোর।

ভাঙচুর আর খাওয়ায় এতটাই ব্যস্ত রয়েছে দুই মস্তান, অন্য কোনদিকে নজরই নেই। মুসা আর টম যে মোটর সাইকেলে চেপে বসেছে, এঞ্জিন গর্জে ওঠার আগে খেয়াল করল না।

'অ্যাই! অ্যাই!' বলে চিৎকার করে ছুটে এল রিজো। পেছনে হগ। 'নামো বলছি!'

কিন্তু দেরি করে ফেলেছে ওরা। দুটো মোটর সাইকেলই ঘুরে গেছে ওদের দিকে। প্রচণ্ড ধাক্কায় চিত হয়ে পড়ে গেল দুজনে।

গাল দিতে লাগল হগ। রিজোর আগে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। চেন ঘুরিয়ে বাড়ি মারতে গেল মুসাকে। ততক্ষণে কাছে চলে এসেছে কিশোর। মোমবাতির স্ট্যান্ড বাড়িয়ে ধরে আটকে দিল চেনটা। রবিনও চলে এসেছে ওকে সাহায্য করার জন্যে। দুজনে মিলে চেপে ধরল চেনের মাথা। হ্যাঁচকা টান মারল। কব্জিতে চেনের অন্য মাথা পেঁচিয়ে নিয়েছিল হগ। ধরে রাখতে পারল না। ছাল-চামড়া তুলে নিয়ে তার হাত থেকে খসে এল চেনটা। ব্যথায়, রাগে চিৎকার করে উঠল সে।

প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে উঠে এসেছে ভিকি। রিজো উঠে দাঁড়ানোর

আগেই লাথি মারল ওর পেটে। তারপর চেপে বসল বুকে। এলোপাতাড়ি কিলঘুসি মারতে শুরু করল নাকেমুখে। যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে রিজো। কেয়ারও করল না ভিকি। রোখ চেপে গেছে তার। সমানে পিটিয়ে চলল।

মোটর সাইকেল থেকে নেমে পড়ল মুসা। হগের হাতে চেন নেই এখন। মুখোমুখি হতে আর বাধা নেই। কারাতের কৌশল কাজে লাগাল সে। প্রচণ্ড মার খেয়ে রক্তাক্ত নাক-মুখ চেপে ধরে মেঝেতে লুটিয়ে পড়ল হগ।

সামনের দরজার দিকে মোটর সাইকেল ছোটাল টম। খোলা দরজার কাছে পৌঁছে গতি না কমিয়েই লাফ দিয়ে নেমে পড়ল সীট থেকে। ফিরে তাকিয়ে চিৎকার করে বলল, 'অ্যাই হগ, ধরো ধরো। বাইকটা তোমাকে না নিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছে হগ। নাক-মুখ সামলাবে, না মোটর সাইকেল, সিদ্ধান্ত নেয়ার আগেই ধুড়ুম-ধাড়ুম শব্দ ভেসে এল বাইরে থেকে।

'তোমারটাকেও ওখানেই পাঠাই, কি বলো?' রিজোকে বলল মুসা।

'না না!' বলে চেঁচিয়ে উঠল রিজো। উঠে বসার চেষ্টা করল। বুকে চেপে আছে ভিকি। প্রাণপণে ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল। মুসা বাইকে চাপার আগেই একটা পা তুলে দিল সীটের ওপর দিয়ে। সীটে বসে ফিরে তাকাল। কাটা, রক্তাক্ত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে বলল, 'পস্তাতে হবে! বুঝবে মজা! ধরে নাও কবরে চলে গেছ তোমরা!...অ্যাই, হগ, ওঠো!'

টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল হগ। টমের দিকে তাকাল। চোখে বিষাক্ত গোক্ষুরের দৃষ্টি। পারলে ছোবল মারে। কিন্তু আপাতত সে সাধ্য নেই ওর। ফণাটা ধসিয়ে দেয়া হয়েছে।

আট

ঘরের বাতাসে ভারী হয়ে আছে মোটর সাইকেলের ধোঁয়ার গন্ধ। উটকো ঝামেলা সরাতে পেরে সবাই খুশি। পরস্পরকে স্বাগত জানাচ্ছে, ধন্যবাদ দিচ্ছে।

'বাঁচা গেল,' জিম বলল।

'হ্যাঁ,' টিস্যু পেপার দিয়ে ঠোঁটের রক্ত মুছতে মুছতে বলল টম। 'মরুকগে এখন যেখানে খুশি গিয়ে।'

'ইভা, ফোনটা কোথায়?' জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'পুলিশকে জানিয়ে রাখা দরকার। দলবল নিয়ে আবার এসে ঝামেলা করতে পারে।'

আতঙ্ক এবং সতর্কতা যুগপৎ খেলে গেল ইভার চোখে মুখে। 'পুলিশ! না না!'

'কিন্তু আবার যদি আসে? কি কাণ্ডটা করে গেল দেখলে তো। দলবল নিয়ে এলে আর রক্ষা থাকবে না।'

'আমার মনে হয় না আর আসবে। ওই একটু হুমকি-ধামকি দিয়ে গেল আরকি।' টমের কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। বাহুতে হাত রেখে মুখের দিকে তাকাল। 'সবাই মিলে যে ধোলাইটা দিয়ে দিয়েছ, আর আসতে সাহস করবে না।'

'কি জানি!' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল টম। 'ওদের বিশ্বাস নেই!'

'আমি জানি, আর আসবে না ওরা। পালানোর ভঙ্গিতেই বোঝা গেছে। তেমন ক্ষতিও ওরা করতে পারেনি, কয়েকটা জিনিস ভেঙেছে শুধু। তোমরা কেউ যে জখম হওনি, এতেই আমি খুশি। ভিকি? মুসা? ঠিক আছ তো তোমরা?'

'আছি,' জবাব দিল ভিকি।

চোয়ালে হাত বোলাচ্ছে মুসা। ফুলে আছে যেখানটায় ঘুসি মেরেছিল রিজো। উত্তেজনা চলে যেতে ব্যথাটা টের পাচ্ছে এখন।

'সবাইকে ধন্যবাদ,' ইভা বলল। 'যেভাবে পার্টিটাকে রক্ষা করেছ তোমরা, তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।' হাসিটা পুরোমাত্রায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার।

রবিনের মনে হলো, তার হাসির বাল্বে এরচেয়ে বেশি ভোল্টেজ আর নেই।

'সাহস তো দেখালে,' দুষ্টু হাসি ঝিলিক দিয়ে গেল ইভার চোখেমুখে। 'কিন্তু এর পরের চমকটা কি সহ্য করতে পারবে?'

'তারমানে পার্টি চালিয়ে যাচ্ছ তুমি?' জুন বলল।

'তো আবার কি? বন্ধ করে দিলে তো রিজো আর হগই জিতল। এত কষ্ট করে সব জোগাড়যন্ত্র করলাম, অর্ধেকটাই শেষ হয়নি এখনও।'

'ঠিক,' বলে উঠল জিম, 'ভীতু এবং সাহসীদের প্রতিযোগিতা-টাও এখনও বাকি। তবে ভীতুরা যদি পরাজয় মেনে নেয়...'

'প্রশ্নই ওঠে না,' ডারবি বলল। 'ভীতু বলছ কাদের! আমরা এখনও তোমাদের চেয়ে এক পয়েন্ট এগিয়ে আছি। হার মেনে নিলে বরং তোমাদেরই নেয়া উচিত। আর তোমাদের অবগতির জন্যে জানাচ্ছি, বেশ কিছু খেলা এখনও বাকিই রয়ে গেছে আমাদের।'

'গুড,' খুশি হলো ইভা। 'তাহলে পার্টি চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আরাম করে বসো সবাই। আমি আরও খাবার নিয়ে আসি। খাওয়ার পর শুরু হবে গুপ্তধন খোঁজা।'

রান্নাঘরের দিকে চলে গেল সে।

চিন্তিত ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল মুসা, এরপর কোন চমক দেখাবে ইভা? আড়চোখে ভিকির দিকে তাকাল। ফায়ারপ্লেসের কাছে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখে চোখ পড়তে কাঁধ ঝাঁকাল। ঠোঁট গোল করে একটা শব্দ উচ্চারণ করল, দূর থেকে শোনা না গেলেও যার মানে বোঝা যায়: ভীতু। তারমানে প্রতিযোগিতার নেশা জিমের মতই ভিকিরও এখনও যায়নি। সুতরাং তার নিজেরও পিছিয়ে আসা চলবে না। ভিকির কাছে হার স্বীকার করবে না সে

কোনমতেই। কোনভাবে জিততে দেবে না ভিকিকে।

গরম গরম আপেল সিডার আর কুকি নিয়ে এল ইভা। আনতে সাহায্য করলেন আঙ্কেল মেয়ার।

পুরানো দিনের টেপ বাজানো হচ্ছে এখন। পঞ্চাশের দশকের বিখ্যাত গান। পা ঠুকতে শুরু করল রবিন। ডারবিও যোগ দিল তাতে।

খানিক আগের উত্তেজনায় ভাটা পড়ল সবারই। আবার স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল।

'অ্যাট দা হপ বাজছে,' রবিন বলল। 'পুরানো এই গানগুলো আমার খুব ভাল লাগে।'

'আমারও,' জুন বলল। বাজনার তালে তালে হাততালি দিতে লাগল সে। পাথরের ফায়ারপ্লেসের একধারে হেলান দিতে গিয়ে চমকে সোজা হয়ে গেল। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ফিরে তাকিয়ে দেখে পাথরের দেয়াল সরে গিয়ে ফোকর বেরিয়ে পড়েছে। তাতে একটা মানুষের কঙ্কাল।

চিৎকার দিয়ে উঠল জুন। শুরু হলো হট্টগোল। তারপর হাসি। বোঝা গেল, এটা ইভার সাজিয়ে রাখা আরেক চমক।

'দিলে তো আমাদের একটা ট্র্যাপডোর খুলে,' হাসতে হাসতে বলল ইভা। 'গোপন পথটা আর গোপন থাকতে দিলে না।'

'একটা? তারমানে আরও গোপন পথ আছে তোমাদের?'

'সময় এলেই দেখতে পাবে।'

'কি সাংঘাতিক!'

'ভয় লাগছে?'

মাথা নাড়ল জুন। 'না, তবে...'

'অ্যাই, দেখো তোমরা, কি নিয়ে এসেছি!'

ডারবির তীক্ষ্ণ চিৎকারে ঘাড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাল জুন, 'কি এনেছ?'

'মানুষের মগজ,' ডারবির হাতে কালো একটা ধাতব বাক্স।

'বাজে কথা!' এগিয়ে এল ভিকি। 'মানুষের মগজ তুমি পেলে কোথায়?'

'আমার আঙ্কেলের কাছে,' নিরীহ কণ্ঠে জবাব দিল ডারবি। 'ডাক্তারি জিনিসপত্র সাপ্লাইয়ের দোকান চালায়। পার্টির জন্যে তার কাছ থেকে চেয়ে এনেছি এটা।'

জুনের মুখ দেখে মনে হলো অসুস্থ হয়ে পড়বে।

'দেখি?' কাছে এসে দাঁড়াল জিম।

'বের করা যাবে না। করলেই শেষ। নষ্ট হয়ে যাবে,' বাক্সটা শক্ত করে চেপে ধরল ডারবি। 'তবে...ছুঁতে চাইলে...'

বাক্সের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল ভিকি। পরক্ষণে এমন এক চিৎকার দিয়ে উঠল, যেন গলা টিপে ধরা হয়েছে তার। ঝটকা দিয়ে বের করে আনল হাতটা।

'পিচ্ছিল, নরম নরম, তাই না?' নিরীহ ভঙ্গিটা বদলায়নি ডারবির। 'যে কেউ ছুঁয়ে দেখতে পারো। দেখবে?'

'অবশ্যই,' এগিয়ে এল টম। হাত বাড়াল বাক্সে ঢোকানোর ভঙ্গিতে।

হঠাৎ টান দিয়ে উল্টে ফেলল। থ্যাপ করে পাথরের মেঝেতে পড়ল ভেতরের জিনিসটা।

'কই, মগজ কোথায়? ঠাণ্ডা স্প্যাগেটির মত লাগছে।'

'তারমানে আরেক পয়েন্ট পেলাম আমরা,' নিরীহ্ ভঙ্গিটা একই রকম আছে ডারবির। 'জুন আর ভিকি দুজনেই আমার কথা বিশ্বাস করেছে। মনে করেছে মানুষের মগজই আছে। যেহেতু ঠকা খেয়েছে, পয়েন্ট সত্যিকার সাহসী, মানে আমাদের।'

'কে বলল, মোটেও বিশ্বাস করিনি,' স্বীকার করতে চাইল না ভিকি। 'নিজেদের আবার সাহসী বলছে! হুঁহ্! তোমাকে কেবল বোকা বানাচ্ছিলাম। তারমানে সাহসীরা এক পয়েন্ট...'

ছোট একটা ঘণ্টা বাজিয়ে এই তর্কাতর্কির অবসান ঘটাল ইভা।

'ওসব বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকাও,' আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। পেছনের আগুনের পটভূমিতে ওকে ভ্যাম্পায়ারের মতই লাগল মুসার। ফায়ারপ্লেসের একপাশে একটা টুলে পিঠ কুঁজো করে বসে আছেন আঙ্কেল মেয়ার। চোখের কৃত্রিম পানির ফোঁটাটা আটকে রয়েছে সেই এক জায়গায়।

'মনমেজাজ ঠিক হয়েছে সবার? পার্টির জন্যে রেডি?' জানতে চাইল ইভা। কারও জবাবের অপেক্ষায় না থেকে বলল, 'পরের চমকের জন্যে রেডি হয়ে যাও সবাই। এখনকার খেলা গুপ্তধন খোঁজা।'

'ট্রেজার হান্ট!' বিড়বিড় করল রবিন। 'তারমানে গুপ্তধন আছে এ বাড়িতে!'

'পচা খেলা,' জিম বলল। 'গুপ্তধন খোঁজা, ও আবার কোন খেলা হলো নাকি? বাচ্চারা খেলে।' আড়চোখে তাকাল ডারবি আর মুসার দিকে, 'আর ভীতুরা...'

জিমের দিকে ঘুরল ইভা। মুখের হাসি মুছল না। 'গুপ্তধনের তালিকাটা দেখলে আর একথা বলতে না। তবে ভয় পেলে এখানে বসে থাকতে পারো। কাজটা বিপজ্জনক। এই গুপ্তধন খোঁজায় একমাত্র দুঃসাহসীরাই অংশ নিতে পারবে।'

'আমি একবারও বলিনি অংশ নেব না,' তাড়াতাড়ি বলল জিম।

'গুড,' উত্তেজনায় বিড়ালের চোখের মত ঝিকিয়ে উঠল ইভার পান্না-সবুজ চোখ। ফটোকপি করা গুপ্তধনের তালিকার কপি বিতরণ শুরু করল মেহমানদের মাঝে। একটা কপিতে টোকা দিয়ে বলল, 'আমি আর আঙ্কেল এ বাড়ির বিভিন্ন জায়গায় এসব জিনিস লুকিয়ে রেখেছি। প্রতিটি ঘর, নিচতলা, ওপরতলা, চিলেকোঠা, মাটির নিচের ঘর, সবখানে ছড়িয়ে আছে। কোথাও যেতে বাধা নেই। রাত বারোটা পর্যন্ত সময় পাবে। এর মধ্যে যে দল সবচেয়ে বেশি জিনিস বের করে আনতে পারবে, তাদের জন্যে স্পেশাল পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।'

তালিকা নেয়ার জন্যে কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল 'উগ্র'রা। দৌড় দিতে যাবে, ডেকে থামাল ইভা, 'একটা কথা। খুব সাবধানে থাকবে। কখন যে কি

ঘটে যায় কেউ বলতে পারে না…যত যা-ই হোক, এটা হ্যালোউইন পার্টি।'

প্রথম গুপ্তধনটা বের করে ফেলল রবিন। লিভিং রুম থেকে তখনও বেরোয়নি কেউ। নিয়ম-কানুন ব্যাখ্যা করছে তখনও ইভা। কাস্কেটের খাবার সরিয়ে নিচ থেকে নীল কাপড়ে মোড়া কয়েকটা হাড় বের করে আনল সে। তালিকায় লেখা আছে: মানুষের মমির আঙুলের হাড়।

'পেয়েছি!' চিৎকার করে জানাল রবিন। 'কিন্তু ইভা, সত্যি কি এগুলো মমির হাতের?'

'তাই তো জানি,' জবাব দিল ইভা। 'আমি আর আঙ্কেল মিশরে থাকতে জোগাড় করেছিলাম ওগুলো।'

পরের কয়েকটা মিনিট নিচতলার ঘরগুলো তন্নতন্ন করে খুঁজল ওরা। কখনও শোনা গেল চিৎকার, কখনও হাসি। একের পর এক গুপ্তধন উদ্ধার করছে, কিংবা নতুন কোন চমকের সম্মুখীন হচ্ছে গুপ্তধন শিকারিরা।

'দারুণ জমান জমিয়েছে ইভা, তাই না?' হাসতে হাসতে মুসাকে বলল টম। দুদিক থেকে দুই দরজা দিয়ে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছে ওরা।

'কল্পনাই করতে পারিনি এসব উদ্ভট জিনিস আছে ইভা আর তার আঙ্কেলের কাছে,' মুসা বলল। বহু চেষ্টায় খুঁজে পাওয়া একমাত্র গুপ্তধনটা তুলে দেখাল সে। কাচের পেপারওয়েটের মধ্যে সংরক্ষিত একটা টারান্টুলা মাকড়সার মৃতদেহ। 'টয়লেটের ট্যাঙ্কের ভেতরে পেয়েছি।'

'আমি পেয়েছি এইটা,' স্টাফ করা একটা কেউটে সাপ দেখাল টম। 'নড়তে দেখে প্রথমে ভেবেছিলাম জ্যান্ত। ছোবল মারল। লাফ দিয়ে সরে গিয়ে দৌড় দিয়েছিলাম। ফিরে তাকাতেই তারটা চোখে পড়ল। ব্যাটারিচালিত মোটরের সঙ্গে লাগানো। তখন তুলে নিয়েছি।'

'আমি আর কোন আগ্রহ পাচ্ছি না,' গুপ্তধনের তালিকার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল মুসা, 'এসব কোন জিনিস হলো! এই দেখো, এক বোতল রক্ত।'

'তোমার আর খোঁজা লাগবে না। জিম ওটা পেয়ে গেছে। সামনের হলে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে হোঁচট খেল মেঝের পাটাতনের একটা আলগা তক্তায়। বোতলটা তার নিচেই রাখা ছিল।'

'চলি। দেখা হবে।'

রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল মুসা। ভাল লাগছে না আর। এই প্রতিযোগিতা শেষ হলে বাঁচে। একবার মনে হলো, সব বাদছাদ দিয়ে হলরুমে গিয়ে বসে থাকে। এসব অর্থহীন জিনিস খোঁজার কোন মানে হয় না। ঠিক এই সময় ভিকির চেহারাটা ভেসে উঠল মনের পর্দায়। নাহ্, হাল ছাড়া যায় না। ভিকির কাছে পরাজিত হলে টিটকারির ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যাবে। তার চেয়ে জেতার চেষ্টা করাই বরং ভাল।

★

নিরাসক্ত ভঙ্গিতে হাতের তালিকাটার দিকে তাকাল কিশোর। ক্রমেই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছে। পার্টিতে প্রচুর খরচ করেছে ইভা, নানা রকম মজা আর চমকের আয়োজন করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু সবই যেন ছেলেমানুষী। মোটেও ভাল

লাগছে না কিশোরের। কিছুই করত না, হয়তো চলেও যেত-ইভা যা ভাবে ভাবুক, ঠেকিয়ে রেখেছে একটা জিনিসই-রহস্য। রহস্যের গন্ধ সে শুরু থেকেই পেয়েছে, এখন আরও জোরাল হচ্ছে সেটা। কিন্তু কোন্ দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ঘটনাপ্রবাহ, অনুমান করতে পারছে না।

হাস্যকর এই গুপ্তধন শিকারেও কোনমতেই অংশ নিত না সে। নিয়েছে একটা বিশেষ কারণে। গুপ্তধন খোঁজার ছুতোয় পুরো বাড়িটার আগাপাশতলা ভালমত দেখে নিতে পারবে। জানতে পারবে কোনখানে কি আছে। তাতে মূল রহস্যটা কি, স্পষ্ট হয়ে উঠতেও পারে।

কফি শপে ইভার ফোনের কথা মনে পড়ল। কারও বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল সে, হুমকি দিয়েছিল। সেটা কি সত্যি রিজো আর হগের বিরুদ্ধে, না আরও সিরিয়াস কিছু? এই পার্টির সঙ্গে সম্পর্কিত? কে জানে!

এতক্ষণে কোন রকম খারাপ আচরণ করেনি ইভা। একটিবারের জন্যে প্রকাশ পায়নি তার কোন মেহমানের ওপর সে অসন্তুষ্ট। বরং সবাইকে ইভা খুশি করার, আনন্দ দেয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। চেহারা যেমনই হোক না কেন, তার আঙ্কেলও খুব ভাল মানুষ। তিনিও আন্তরিকভাবে সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করছেন।

তারপরেও কোথায় যেন কি একটা গোলমাল রয়ে গেছে, কিছুতেই ধরতে পারছে না কিশোর। কিন্তু জানতেই হবে, রহস্যটা কোনখানে। জানা দরকার, রহস্য একটা আছে-নাহলে কেন সন্দেহ জাগল ওর মনে।

ওপরতলার কয়েকটা ঘর খোঁজা হয়ে গেছে। আগ্রহ জাগায় এমন কোন কিছু চোখে পড়েনি এতক্ষণেও। পেছন দিকের বড় একটা বেডরুমে এসে ঢুকল। সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। ধড়াস করে উঠল বুক। তার ঠিক সামনে পড়েছে জ্বলজ্বলে একটা মুণ্ড। পরক্ষণে বুঝল ইভার সাজিয়ে রাখা আরেকটা চমক ওটা। সে যেদিকেই সরে, মুণ্ডটা তার সামনে সামনে থাকে।

সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিতেই আবার সিলিঙে ফিরে গেল সুতোয় বাঁধা মোটরচালিত মুণ্ডটা। বোঝা গেল, আলোর সুইচ আর ইলেকট্রনিক মুণ্ডের সুইচ এক করে দেয়া হয়েছে। ওই সুইচ টিপে আলো জ্বাললেই নেমে আসবে আবার ওটা। যা, বেটা, থাক্ ওখানে, জ্বালবই না আমি-মনে মনে বলে টর্চ জ্বেলে একটা চার্জার লাইট কিংবা ল্যাম্প খুঁজে পাওয়া যায় কিনা দেখতে লাগল।

পেয়ে গেল একটা চার্জার লাইট। সুইচ টিপে জ্বালল। নামল না মুণ্ডটা। ওটার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। ফাঁকিটা দিয়ে দিয়েছে ইলেকট্রনিক চোখকে।

পারফিউমের গন্ধ আর অ্যানটিক ড্রেসিং টেবিলে রাখা কসমেটিকসের শিশি-বোতল-কৌটা দেখে অনুমান করল, ইভার বেডরুমে ঢুকেছে। অ্যানটিক খাটের ওপর বিছানো রক্তলাল মখমলের চাদর।

একজন মানুষের বেডরুম দেখেই তার স্বভাব সম্পর্কে অনেক কিছু বলে

দেয়া যায়। এতদিন তা-ই জানত কিশোর। কিন্তু ইভার বেডরুম দেখে তেমন কিছু অনুমান করতে পারল না সে। স্টাফ করা কোন পাখি বা জানোয়ার নেই, সিনেমার হিরো, কোন নামকরা খেলোয়াড় কিংবা গায়কের ছবি নেই, ওর কোন ছবি আছে কিনা, থাকলে সেটা কি, তার কোন প্রমাণ নেই ঘরের কোনখানে। কেবল পঞ্চাশের দশকের একজন হাসিখুশি পুরুষ আর সুন্দরী মহিলার বড় করে বাঁধানো যুগল ছবি দাঁড় করিয়ে রাখা আছে ড্রেসারের আয়নার একপাশে।

স্কুলের বই আর খাতাপত্র অবহেলায় স্তূপ করে ফেলে রাখা হয়েছে ঘরের এককোণে। লেখাপড়া করার জন্যে কোন ডেস্ক বা চেয়ার-টেবিল নেই ঘরের কোথাও, একজন স্কুলছাত্রীর ঘরে সাধারণত যা থাকে।

আশ্চর্য! স্কুল আর লেখাপড়ার কোন গুরুত্বই নেই মনে হয় ইভার কাছে! ছোটবেলা থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে, অতিরিক্ত দেখে ফেলে জীবন সম্পর্কে অল্পবয়েসেই কি কোনও হতাশামূলক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে? নাকি ব্ল্যাকফরেস্টের মত ছোট্ট, নগণ্য একটা শহরে মন টিকছে না তার?

চেস্ট অভ ড্রয়ারের প্রতিটা ড্রয়ার খুলে খুলে দেখতে লাগল কিশোর। কোথাও কিছুই পেল না, কেবল কয়েকটা ভাঁজ করা আন্ডারপ্যান্ট আর সোয়েটার বাদে।

ইভার সম্পর্কে কৌতূহল আরও বেড়ে গেল ওর। কিন্তু যা খুঁজছে–কি খুঁজছে জানে না যদিও–পায়নি এখনও। আলমারিগুলো খুলে রীতিমত অবাক হলো। সব খালি। একেবারে শূন্য। একটাতে কেবল পাওয়া গেল কিছু কাপড়-চোপড়, যেগুলো পরে স্কুলে যাতায়াত করে ইভা।

কিন্তু অন্যান্য জিনিসপত্র, সোয়েটশার্ট, স্নিকার, এসমস্ত কই? স্কুল থেকে এসে কাপড় তো নিশ্চয় বদলাতে হয়। কি বদলায়? কি পরে? কোথাও তো কিছু দেখা যাচ্ছে না? কোন রকম পার্টি ড্রেসও নেই। এত বড়লোকের মেয়ে। কম করে হলেও কয়েক ডজন পার্টি ড্রেস থাকার কথা।

ল্যাম্পের চেয়ে টর্চ দিয়ে খুঁজতে সুবিধে। তা-ই করল কিশোর। একটা বিশাল শূন্য দেয়াল-আলমারির পেছনের কাঠে হালকা একটা চারকোনা ফাটলের মত দাগ চোখে পড়ল। ফায়ারপ্লেসের ট্র্যাপডোরটার কথা মনে পড়ল ওর। এটাও তেমন কিছু নয় তো?

আলমারির ভেতর ঢুকে পড়ল সে। ফাটলটায় হাত রেখে ঠেলতে শুরু করল। কিছুই ঘটল না।

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওটার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল সে। চোখ সরাতেই নজরে পড়ল ওপরের তাকে ছোট, গোল একটা নবমত দেখা যাচ্ছে। এই তো পাওয়া গেছে! উত্তেজিত হয়ে উঠল সে। নব চেপে ধরে এক মোচড় দিতেই খুলে গেল ট্র্যাপডোর। বেরিয়ে পড়ল পেছনে বসানো আরও বড় একটা আলমারি।

বিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল কিশোরের মুখ থেকে। নানা রকমের পোশাকে বোঝাই হয়ে আছে লুকানো আলমারিটা। প্রথমে ভাবল, এগুলো ব্যবহার করা কাপড়। প্রাসাদ ছেড়ে যাওয়ার সময় ফেলে গেছে এর বাসিন্দারা।

কিন্তু হ্যাঙ্গার থেকে কয়েকটা নামিয়ে এনে ভালমত দেখে বোঝা গেল, নতুন। এখনও লেবেলও খোলা হয়নি। নিউ ইয়র্ক, স্যান ফ্র্যান্সিসকো, প্যারিসের নামকরা বড় বড় দর্জি আর দামী ডিপার্টমেন্টাল স্টোর থেকে কেনা।

সুন্দর পশমী স্যুট, চকচকে মখমলের ককটেল ড্রেস, ঝলমলে রঙিন স্কার্ট আর জ্যাকেট–যে সব পোশাক কোনদিন কেউ পরতে দেখেনি ইভাকে। ক্রোমের তৈরি সবচেয়ে নিচের তাকটায় কয়েক ডজন হাই-হিল জুতো, যত রকম চামড়া আর রঙে তৈরি করা সম্ভব, সব রকমের আছে।

আলমারির একেবারে পেছনে ঝোলানো রয়েছে তিনটে অতি চমৎকার গাউন আর দুটো ফারের কোট–একটা মিঙ্কের চামড়ায় তৈরি, আরেকটা শেয়ালের।

তাকিয়ে আছে কিশোর। একসঙ্গে এত সুন্দর সুন্দর পোশাকে ভর্তি ওয়ারড্রোব কমই দেখেছে সে। এগুলো ইভার পোশাক? পরে কখন? নিজের ঘরের মধ্যে এভাবে লুকিয়ে রাখার অর্থ কি?

নাকি ইভার মায়ের জিনিস? তা অবশ্য হতে পারে। তবে কেউ জানে না ওর মা বেঁচে আছেন কিনা। নাকি অন্য কোন মেয়েমানুষ বাস করে এ বাড়িতে? মেয়ারের স্ত্রী কিংবা বান্ধবী? তাহলে তিনিই বা এখন কোথায়? পার্টিতে যোগ দেননি কেন? আরও একট প্রশ্ন–ইভার তেমন কোন পোশাক নেই কেন কোন আলমারি কিংবা ওয়ারড্রোবে?

ঠিকই আন্দাজ করেছিল কিশোর, রহস্য একটা আছে বাড়িটাকে ঘিরে। তার অনুমান অমূলক নয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে।

আলমারির পাশে ছোট একটা দেরাজ। ড্রয়ারগুলো খুলে দেখতে লাগল সে। নাইটগাউন, সিল্কের অন্তর্বাস আর ঘরে পরার সাধারণ পোশাক আছে কিছু। নিচের ড্রয়ারটায় সুন্দর প্যাকেট করে রাখা আছে কি যেন। কোন কিছু চিন্তাভাবনা না করেই খুলে ফেলল সে। একটা বাঁধানো ফটোগ্রাফ। তাতে একজন পুরুষের সঙ্গে ইভার ছবি। লোকটার বয়েস চল্লিশের কম হবে না। ইভার বয়েস অনেক কম লাগছে ছবিটাতে।

কে লোকটা? কি হয় ওর?

যেখানে যেভাবে যা ছিল, সেভাবে রেখে দিল আবার কিশোর। গুপ্ত আলমারির দরজা বন্ধ করল। ঘর থেকে বেরোতে যাবে এই সময় বাথরুমের দরজার দিকে চোখ পড়ল।

এগিয়ে গেল সে। একজন মহিলার বাথরুমে ঢুকতে বাধোবাধো লাগল, অস্বস্তি। কিন্তু প্রচণ্ড কৌতূহল টেনে নিয়ে গেল তাকে। ইভা যদি দেখে ফেলে, জবাব দিতে পারবে গুপ্তধন খুঁজতে এসেছে। কোথাও যেতে বাধা নেই বলেই তো দিয়েছে সে।

মেড্‌সিন চেস্টটা খুলল কিশোর। সাধারণত যা যা থাকার কথা তা-ই আছে। টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ, কয়েক শিশি নেইলপলিশ আর অন্যান্য কসমেটিকস, অ্যাসপিরিন আর একবাক্স ব্যান্ড-এইডস।

ওপরের তাকে পাওয়া গেল তিনটে প্রেসক্রাইব করা ওষুধের শিশি। এক

এক করে সব ক'টা নামিয়ে দেখল। দুটো ওষুধের নাম অচেনা, একটা চিনতে পারল—ঘুমের বড়ি। খটকা লাগল প্রেসক্রিপশনের রোগীর নাম দেখে, তানিয়া গ্রেভ।

কে এই তানিয়া? মেয়ারের স্ত্রী?

যে-ই হোক, একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল কিশোর, এ বাড়ি নয়, রহস্যটা আসলে ইভাকে ঘিরে। ঝলমলে হাসির আড়ালে সেটাকে যথাসাধ্য গোপন রাখার চেষ্টা করছে সে।

কেন?

এই কেনর জবাবটাই জানতে হবে। যা যা দেখেছে গিয়ে বলতে হবে মুসা আর রবিনকে। ওদের দুজনের সাহায্য ছাড়া এক রাতে এই রহস্যের সমাধান সম্ভব নয়।

★

মুসা এখন গুপ্তধন শিকারে বেশ ভালই মজা পাচ্ছে। মাকড়সাটা পাওয়ার পর খুব দ্রুত আরও তিনটে জিনিস পেয়ে গেছে—চকচকে পালিশ করা একটা বানরের খুলি, একটা স্ফটিকের বল, আর হাতির দাঁতে তৈরি একটা ছুরির প্রতিকৃতি। ছুরিটা পেয়েছে আলমারির মধ্যে। দরজা খুলে আরেকটু হলেই মূর্ছা যাচ্ছিল। তাকের মধ্যে দেখে একটা কাটা মুণ্ড। দেখার সঙ্গে সঙ্গে পালাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ মনে হলো ইভার কোন ফাঁকিবাজি নয়তো? ভয়ে ভয়ে এসে ভাল করে তাকাতেই বুঝল, ফাঁকিই। একটা ম্যানিকিনের মাথা। আবছা অন্ধকারে একেবারে আসলের মত লাগছিল। ছুরিটা পেয়েছে মুণ্ডটার গলায়, সুতো দিয়ে বাঁধা। নিজে নিজেই হেসে ছুরিটা খুলে জমিয়ে রেখেছে অন্য গুপ্তধনগুলোর সঙ্গে।

আরও দুজন গুপ্তধন শিকারির সাড়া পেল, এদিকেই আসছে। মনে পড়ল, চিলেকোঠাতেও চমক আছে বলেছে ইভা। ওপরে ওঠার সিঁড়ি খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেল সরু কাঠের সিঁড়িটা।

অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল সে। যতই নিঃশব্দে ওঠার চেষ্টা করুক, মচমচ শব্দ হয়েই যাচ্ছে। দুরুদুরু করছে বুক। চিলেকোঠা সম্পর্কে এমনিতেই একটা ভীতি আছে ওর। তার ওপর পুরানো বাড়ির চিলেকোঠা। এবং তার ওপর আবার পুরানো কবরস্থানের পাশে পুরানো বাড়ি...'তাঁরা না থেকেই যান না!' ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েও ঘুরল না। শত দ্বিধা আর শঙ্কা থাকা সত্ত্বেও একটা অদ্ভুত কৌতূহল জোর করে ওপরে টেনে নিয়ে চলল তাকে। কোন গুপ্তধনটা পাওয়া যাবে ওখানে? কিসের চমক সৃষ্টি করে রেখেছে ইভা আর তার আঙ্কেল মিলে?

চিলেকোঠাটা ছোট। ধুলোয় ঢাকা। পুরানো বাক্স আর ট্রাংক গাদাগাদি করে ফেলে রাখা হয়েছে।

সুইচ টিপে মাথার ওপরের আলোটা জ্বালল সে। একটা আলমারি চোখে পড়ল। জিনিস লুকানোর চমৎকার জায়গা।

কিছু না কিছু পাওয়া যাবেই ওর ভেতরে। আপনমনে হাসতে হাসতে গিয়ে

আলমারির দরজা ধরে টান দিল। ভেতরে চোখ পড়তেই আঁতকে উঠল। নিজের অজান্তেই ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল মুখ থেকে। কিছু বলতে চাইল, নিজের কানেই দুর্বোধ্য শোনাল সেগুলো।

ঘরের আলোটা যেন হঠাৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। দম আটকে গেছে গলার কাছে। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। শক্ত করে চেপে ধরল আলমারির দরজা। তাকাতে চাইছে না, তারপরেও নজর অবাধ্য হয়ে চলে যাচ্ছে ভেতরের আবছা অন্ধকারের দিকে।

'ভিকি! ভিকি!' অবশেষে চিৎকারটা স্পষ্ট হয়ে বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

একটা দড়িতে ঝুলছে 'রূপালী রাজকুমারের' দেহ। বেকায়দা ভঙ্গিতে বেঁকে আছে ঘাড়টা। পোশাকের বুকের কাছে রক্ত। টপ টপ করে নিচে ফোঁটা পড়ার শব্দ যেন শোনা যাচ্ছে। হয় ছুরি মেরে খুন করার পর দড়িতে ঝোলানো হয়েছে, নয়তো ঝোলানোর পর পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় ছুরি মারা হয়েছে। ভয়াবহ কোন বিকৃত মানসিকতার খুনীর কাজ।

নয়

এ হতেই পারে না! আরেকটা ধাপ্পাবাজি, নিজেকে বোঝাল মুসা। ওহ্, খোদা! প্লীজ, প্লীজ, ফাঁকিবাজিই হোক। আসল না হোক। ঠকে ঠকুক ওরা, পরাজিত হোক। তবু মারা না যাক ভিকি।

কিন্তু রক্তের ফোঁটাগুলো তো ভুল না। মনে হচ্ছে, সারা জীবনে ভুলবে না ওই শব্দ, দুঃস্বপ্ন হয়ে কানে বাজতে থাকবে।

ভিকির দিক থেকে চোখ সরাতে পারছে না সে। পা নড়াতে পারছে না। কাউকে যে গিয়ে ডেকে আনবে সে শক্তিও যেন হারিয়েছে।

পদশব্দ শোনা গেল পেছনে। টম এসে দাঁড়াল। আলমারির ভেতরে চোখ পড়তেই আতঙ্ক ফুটল চেহারায়।

'আলমারি খুলেই দেখি এই অবস্থা,' কাঁপা গলায় কোনমতে বলল মুসা। 'মনে হয় আরেকটা ধাপ্পাবাজি।'

'আমার তা মনে হয় না। দাঁড়িয়ে থাকো। ছুঁয়ো না। আমি লোক ডেকে নিয়ে আসি।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব,' আর একটা মুহূর্তও ভিকির লাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় মুসা।

দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় ডারবি পড়ল সামনে। ওর পেছনে রয়েছে রবিন আর হেনরি। মুসা কি আবিষ্কার করে এসেছে, উত্তেজিত কণ্ঠে ওদের জানাল টম।

'এখুনি অ্যামবুলেন্স ডাকা দরকার,' জরুরী কণ্ঠে বলে উঠল রবিন। 'হয়তো মরেনি এখনও। সময়মত হাসপাতালে নেয়া গেলে...'

'সময় আর নেই এখন,' টম বলল। 'দেরি হয়ে গেছে। ওর ঘাড়ের অবস্থা দেখলেই বুঝবে। ঘাড় ভাঙা, বুকে রক্ত...'

দৃশ্যটা কল্পনা করে কেঁপে উঠল মুসা। ভিকি মৃত! ভাবতেই পারছে না। মোচড় দিয়ে উঠছে বুকের মধ্যে। ভিকির এই অপমৃত্যু সহ্য করতে পারছে না।

'পুলিশকে খবর দেয়া দরকার,' হেনরি বলল।

'আগে গিয়ে ইভা আর তার আঙ্কেলকে বলি,' টম বলল, 'ওরাই ভাল বুঝবে কি করতে হবে।'

ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে নিচু স্বরে কথা বলছে ইভা আর মেয়ার। মুসারা হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে খবরটা জানাতেই লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ইভা।

'পুলিশকে ফোন করো তুমি!' মেয়ার বললেন। 'আমি দেখছি, কি অবস্থা।'

'না আঙ্কেল, এখনই পুলিশকে খবর দেয়ার দরকার নেই। আগে দেখে আসি, তারপর...'

মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার।

সবাই মিলে দৌড় দিল আবার চিলেকোঠার দিকে। একেক লাফে দু'তিনটে করে ধাপ টপকে উঠে যেতে লাগল ওপরে।

চিলেকোঠায় সবার আগে ঢুকল মুসা। আলমারির দরজা লেগে গেছে আবার। টান দিয়ে সেটা খুলেই হাঁ হয়ে গেল।

শূন্য আলমারি!

'খা-খা-খাইছে!...এইমাত্র তো দেখে গেলাম...' সমর্থনের আশায় টমের দিকে তাকাল মুসা।

'গেল কোথায়?' অবাক হয়ে বলে উঠল টম।

'ভুল দেখোনি তো?' রবিনের প্রশ্ন।

'আমি একা হলে না হয় ভুল বলা যেত। কিন্তু টমও দেখেছে।'

'হ্যাঁ, ছিল,' টম বলল। 'ওই যে, রক্ত।' নিচু হয়ে আঙুলের মাথায় লাগিয়ে নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকে দেখল। 'মানুষের রক্তই তো মনে হচ্ছে!'

'তারমানে আমি একাই চমক সৃষ্টি করছি না,' হেসে বলল ইভা। 'আঙ্কেল, চলো, নিচতলায়।'

সবাই তাকে অনুসরণ করতে যাবে এই সময় ঘরে ঢুকল কিশোর।

'এই রবিন, মুসাকে দেখেছ...' বলতে বলতেই মুসার ওপর চোখ পড়ল তার। 'কি ব্যাপার, সবাই ভিড় করে আছ কেন এখানে?'

কি ঘটেছে জানানো হলো তাকে।

'তারপর এসে দেখি,' শেষ করল হেনরি, 'লাশটা নেই। আলমারি খালি। মনে হচ্ছে এটাও ধাপ্পাবাজি, সাজিয়েছে ওরা।'

মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'ভুল দেখোনি তো?'

'না।'

'ভিকিকে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি না আমি,' ডারবি বলল। উদ্বিগ্ন শোনাল

তার কণ্ঠ। 'তোমরা কেউ দেখেছ?'
কেউ জবাব দিল না।
মুসার দিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোর, 'এখানে আলোছায়ার মধ্যে ভুল দেখাটা অস্বাভাবিক নয়। মুসা...'
'ও একা নয়, আমিও দেখেছি,' মুসার পক্ষ নিল টম। 'ভিকিকেই দেখেছি আমরা।'
'কিন্তু এখন দেখছ না কেন? কি ঘটেছে শিওর হতে হলে ওকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদের।' দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর, 'এসো, সাহায্য করো আমাকে।'
শুধু মুসা আর রবিন নয়, হেনরি, টম, ডারবিও এগিয়ে এল। চিলেকোঠার সমস্ত বাক্স-পেটরা সরিয়ে খুঁজতে শুরু করল ভিকির লাশ। পেল না। দোতলায় নেমে ওখানকার ঘরগুলোতে খুঁজতে শুরু করল।
একটা ঘরের দরজা খুলে কিশোর বলল, 'এটা ইভার বেডরুম...' সুইচ টিপে আলো জ্বেলেই থেমে গেল। অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। মুণ্ড নেমে আসার জন্যে নয়। এবার আর নামেনি ওটা। সিসটেম অফ করে দেয়া হয়েছে সম্ভবত। কিংবা কানেকশন কেটে দিয়েছে।
কি হয়েছে দেখার জন্যে হুড়াহুড়ি করে এগিয়ে এল সবাই। ইভার বিশাল খাটটায় চিত হয়ে পড়ে আছে ভিকি।
বিছানার কাছাকাছি এসে বোঝা গেল, ওটা ভিকি নয়।
সবার আগে খাটের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ডারবি। 'আরে এ তো একটা...'
'ডামি!' কথাটা শেষ করে দিল মুসা। বিছানায় যেটা পরে আছে, সেটা ভিকির রূপালী পোশাকটা, ভেতরে ঠেসে খড় ভরা হয়েছে। 'রক্ত' আসল রক্ত নয়। হাস্যকর। লাল রঙের সেলোফেন সরু সরু কেটে বুকে আটকে দেয়া হয়েছে। বাতাসে নড়াচড়া করেছে ওগুলো। আলমারির ভেতরের আলো-আঁধারিতে রক্তের মত মনে হয়েছে। আলমারির নিচে নিশ্চয় রঙের ফোঁটা ফেলে রাখা হয়েছিল। এ ভাবে বোকা বনেছে বলে নিজের ওপরই মেজাজটা খিচড়ে গেল মুসার। এতটাই ভড়কে গিয়েছিল, রক্ত পড়তে দেখেছে বলে তো মনে হয়েছেই, ফোঁটার আওয়াজও শুনেছে মনে হয়েছে। তারমানে ওসব ছিল সব তার কল্পনা! ভূতের ভয়ে কাবু হয়ে থাকার ফল...গাধা আর কাকে বলে!
বাথরুম থেকে হাসিমুখে বেরিয়ে এল ভিকি। পরনে নীল আলখেল্লা। এমন হাসা শুরু করে দিল, শেষমেষ দম নিতে পারল না।
'তারমানে তোমার কিছু হয়নি,' কিশোর বলল।
'হলে কি আর হাসত নাকি, দেখছ না!' খেঁকিয়ে উঠল মুসা। কেঁপে উঠল গলা–ভয়ে নয়, রাগে। 'ভিকি, এই কাজটা করা তোমার মোটেও উচিত হয়নি। আমি সত্যি সত্যি ভেবেছিলাম তোমার কিছু হয়ে গেছে।'
'তাতে কি দুঃখ পেয়েছ?'
'সত্যি বলব? পেয়েছি।'
হাসি থেমে গেল ভিকির। চোখ সরিয়ে নিল। টমের দিকে তাকিয়ে বলল,

'তোমার অভিনয়টা খুব ভাল হয়েছে।'

হাসতে হাসতে বলল টম, 'হ্যাঁ, এমনই খেল দেখালে...'

টমের দিকে তাকিয়ে ফোঁসফোঁস শুরু করল মুসা, 'তুমিও ফাঁকি দিয়েছ!'

'তো কি করব? এরকম বিশ্রী খেলা তো তোমাদের দলের লোকেই শুরু করল।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'টম,' ভিকি জিজ্ঞেস করল, 'গুপ্তধনের খবর কি? আমার লাশ দেখে অনেক সময় নষ্ট করেছে বোকা ভীতুগুলো, এই সুযোগে নিশ্চয় ওদের চেয়ে বেশি বের করা গেছে?' জবাব জেনে তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল সে, 'হেরে গেলে তোমরা। গুপ্তধনও বেশি, পয়েন্টও বেশি আমাদের।'

রাগত স্বরে কিশোর বলল, 'ভিকি, তোমার কাছ থেকে এরকম একটা নিচুস্তরের ধাপ্পাবাজি আশা করিনি। কাজটা খুব খারাপ করেছ তুমি।'

'কিন্তু...কিন্তু হ্যালোউইন পার্টিতে তো সব জায়েয...তা ছাড়া নিজের দলকে জেতাতে...'

'তোমার ভাবা উচিত ছিল, তোমার লাশ দেখলে দুঃখ পাব আমরা সবাই...'

'কিন্তু হেনরি যে করল?'

'সে-ও ঠিক করেনি,' মুসার হাত চেপে ধরে টান দিল কিশোর। 'চলো, এখানে সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

নীরবে ওদের দিকে তাকিয়ে রইল ভিকি। বুঝল, ওর প্রতি ভালবাসাটা এখনও কমেনি মুসার। ওর যেমন কমেনি মুসার ওপর।

কিশোরের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে একই কথা ভাবছে মুসাও। ভিকির প্রতি ভালবাসা না থাকলে ওর লাশ দেখে এতটা অস্থির হয়ে যেত না। আর অস্থির হয়ে গিয়েছিল বলেই নানা রকম ভুলভাল দেখেছে, ভুল কল্পনা করেছে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে ফাঁকিটা ধরে ফেলত সহজেই।

লিভিং রুমে কৃত্রিম মোমের ম্লান আলোয় আবার নাচ শুরু করেছে জুন আর জিম। ফায়ারপ্লেসের পাশে একটা টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে উদ্ধার করে আনা গুপ্তধনগুলো।

কিশোরের দিকে তাকাল মুসা, 'তুমি কিছু পাওনি?'

'পেয়েছি। এসো এদিকে। জরুরী কথা আছে।'

কোণের দিকের একটা সোফায় রবিন আর মুসাকে ডেকে নিয়ে গেল কিশোর। আশেপাশে কেউ আছে কিনা দেখে নিয়ে নিচুস্বরে বলল, 'সেদিন কাফেতে টেলিফোনে কি বলেছিল ইভা, মনে আছে?'

অবাক হলো মুসা। 'তারমানে এখনও ভাবছ এই পার্টি দেয়ার পেছনে কোন একটা মতলব আছে ইভার? কিন্তু এখন পর্যন্ত তো সন্দেহজনক কিছু করতে দেখলাম না।'

'কি পেয়েছি শোনো আগে,' কিশোর বলল, 'তারপর ভেবেটেবে বলো যা বলার। তোমরা যখন গুপ্তধন খোঁজায় ব্যস্ত, আমি ঢুকে পড়েছিলাম ইভার

বেডরুমে...'

'গুপ্তধন খুঁজতে?'

'না। দেখতে, কি আছে ওখানে। ও বলেছে সারা বাড়িতে কোথাও যেতে বাধা নেই, তাই অনধিকার প্রবেশ করেছি সেটাও বলতে পারবে না। মুসা, ওর ঘরে সাধারণ হাইস্কুল স্টুডেন্টের কোন জিনিসই নেই।'

'থাকার কথাও নয়,' যুক্তি দেখাল রবিন। 'মাত্র কয়েক মাস হলো এসেছে। সারা জীবন বাইরে বাইরে কাটিয়েছে। স্কুলের সাধারণ ছাত্রদের মত আজেবাজে জিনিসের স্তূপ না বানিয়ে ভ্রমণের জন্যে প্রয়োজনীয় টুকটাক জিনিস ব্যবহার করতেই সে বেশি অভ্যস্ত।'

'একথা ভাবিনি মনে করেছ? ওর ঘরে ভ্রমণের জিনিসপত্রও নেই। এমনকি একটা ট্র্যাভেল ব্যাগও না। কি আছে শুনবে?'

যা যা দেখেছে খুলে বলল কিশোর। ছবিটার কথায় আসতেই বলে উঠল মুসা, 'তাহলে কি বলতে চাও ইভা সিআইএর লোক? স্পাই? বয়স্ক লোকটা তার বস?'

'হুট করে সিআইএর কথা মাথায় এল কেন তোমার?'

'না, ঘটতেও তো পারে ওরকম। পারে না? আজকাল তো হচ্ছে...'

'ওর বাথরুমে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন পেয়েছি। তাতে লেখা রয়েছে অন্য এক মহিলার নাম, তানিয়া গ্রেভ।'

'নিশ্চয় ইভার ছদ্মনাম। সিআইএর স্পাইদের কারও কারও ডজন ডজন ছদ্মনাম থাকে, শুনেছি। আমাদের বেছে বেছে পার্টিতে ডেকে আনার কারণটা এখন পরিষ্কার। সবাইকে সিআইএতে যোগ দিতে বলবে।'

'ওসব কিছু না। অন্য কোন ব্যাপার আছে।'

'কি ব্যাপার?'

'সেটা বুঝলে তো রহস্যের সমাধানই করে ফেলতে পারতাম...'

আলোচনা শেষ করতে পারল না ওরা। ঘণ্টা বাজিয়ে সবাইকে ডাকল ইভা। ওপর দিক থেকে এসেছে শব্দটা। দেখা গেল, ব্যালকনিতে গিয়ে উঠেছে ও। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে ঝুঁকে আছে। পাশের টেবিলে সোনালি কাগজের মোড়কে একটা বাক্স। ঘোষণা করল, 'এবার পুরস্কার দেয়া হবে। এই খেলায় এতটা সফল হব ভাবিনি। আমি তোমাদের চমক দেখাব ভেবেছিলাম, উল্টে তোমরাই আমাকে চমকে দিলে।'

হাততালি দিল কেউ, কেউ দিল শিস। হই-হই শুরু করল।

আস্তে মাথা ঝুঁকিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বাউ করল ইভা। 'এই বাক্সে প্যারিসের স্পেশাল চকলেট আছে। বিজয়ীরা পাবে। কে নিতে আসবে?'

'কে জিতল, তাই তো জানলাম না,' টম বলল।

'তোমরাই জিতেছ।'

হুল্লোড় করে উঠল উগ্র পার্টি। ভিকির দিকে তাকাল টম, 'তোমার জন্যেই জিতেছি আমরা। যাও, তুমিই নিয়ে এসো।'

আবার সেই রুপালী পোশাক পরেছে ভিকি। তবে আগের মত অহঙ্কারী

ভঙ্গি দেখাচ্ছে না আর। খেলাটা আর ততটা উপভোগ করছে না যেন সে। পুরস্কার নেয়ার জন্যে সিঁড়ির দিকে এগোল।

'ভালই হলো,' হেসে বলল ইভা, 'রূপালী রাজকুমারের জন্যে সোনালি চকোলেট।' টেবিল থেকে বাক্সটা তুলে নিল সে। এতই ভারী, ভারের চোটে বাঁকা হয়ে গেল সে। রেলিঙের ওপর ভর রেখে সোজা হতে গেল। সহ্য করতে পারল না পুরানো রেলিঙ। মড়মড় করে ভেঙে গেল। বাক্সটা পড়ে গেল ইভার হাত থেকে। তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার দিয়ে সে-ও পড়ে যেতে শুরু করল।

দশ

এত দ্রুত ঘটে গেল ঘটনাটা, কেউ কোন সাহায্য করতে পারল না। ইভার আর্তচিৎকার সিলিঙে প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। ব্যালকনির নিচে বড় একটা সোফার ওপর পড়ল সে। পড়ে রইল নিথর হয়ে। নড়াচড়া নেই।

সবার আগে পৌঁছে গেল ভিকি। চিৎকার করে উঠল, 'ইভা!'

ধীরে ধীরে চোখ মেলল ইভা। ঘোরের মধ্যে যেন জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

আটকে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়ল এতক্ষণে মুসা। ভাবছে, আর কত চমক? আর কি কি ঘটবে? তার পাশে রবিন আর কিশোর চুপ করে আছে।

'পড়ে গিয়েছিলে,' জবাব দিল ভিকি। 'হাত-পা ভাঙেনি তো?'

'মনে হয় না। কিন্তু কিভাবে পড়লাম...'

'রেলিঙটা তোমার ভার সইতে পারেনি, ভেঙে গেল।'

'কিন্তু কিভাবে ভাঙবে? ভীষণ শক্ত ছিল। বাড়িটা মেরামতের সময় সব কিছু চেক করা হয়েছে। রেলিঙের কোথাও কোন খুঁত নেই, মিস্ত্রী বলেছিল, মনে আছে আমার।' একটা কুশনে ভর দিয়ে উঠতে গেল সে। ককিয়ে উঠল। 'উফ্, কব্জিটা!...মচকেই গেছে মনে হয়...'

এগিয়ে গেল রবিন। 'ভাঙেনি তো?' হাতটা তুলে ধরে দেখতে শুরু করল সে। 'ব্যান্ডেজ বেঁধে দেব? ইলাস্টিক ব্যান্ডেজ আছে ঘরে?'

সে আর জুন ব্যান্ডেজ আনতে গেল। কয়েকজন রওনা হলো সিঁড়ি বেয়ে ব্যালকনিতে ওঠার জন্যে, রেলিঙটা পরীক্ষা করতে। তবে সবার আগেই সেখানে উঠে গেছেন আঙ্কেল মেয়ার। চোখের নিচে কৃত্রিম পানির ফোঁটার বিষণ্ণতাও তার চেহারায় ফুটে ওঠা ক্রোধ চেপে দিতে পারেনি। ওখান থেকে নিচে হলঘরের দিকে তাকালেন। কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজটা কে করেছ, বলে ফেলো তো দেখি?'

'কি কাজ?' বুঝতে পারল না জিম। 'রেলিঙটা তো আপনাআপনি ভেঙে পড়ল...'

'করাত দিয়ে কেটে রাখা হয়েছিল!' রেলিঙের এক টুকরো কাঠ তিনি

তুলে ধরলেন, সবার দেখার জন্যে।

'আর কে করবে, উগ্ররাই করেছে,' ডারবি বলল। 'ফিসফিস করে পরামর্শ করছিল ওরা তখন, আড়ি পেতে শুনে ফেলেছি। বলেছে ওদের প্ল্যানগুলো নাকি ডেঞ্জারাস।'

'বাজে কথা বোলো না!' ধমকে উঠল জিম। 'তোমরা করেছ, স্বীকার করে ফেলো। জেতার জন্যে মরিয়া হয়ে গিয়েছিলে তোমরা।'

'পাগল হয়ে গেলে নাকি!' হেনরি বলল। 'এত্তবড় বোকামি করব ভাবলে কি করে? তোমরাই বা কেন করবে, সেটাও মাথায় ঢুকছে না আমার।'

'কেন করবে, আমি বুঝতে পারছি,' ভিকি বলল।

'কেন?'

'আমাদের বদনাম করানোর জন্যে।'

'তারমানে তো সেই আমাদেরকেই দোষটা দিচ্ছ।'

'করেছ তোমরা, আর কাকে দেব?'

'বেশ, ধরে নিলাম করেছি,' এগিয়ে এল কিশোর। 'কিন্তু কখন করলাম। কিভাবে? সবার চোখের সামনে গিয়ে ব্যালকনিতে উঠলাম কখন, আর কাটলামই বা কখন? আমি শুরু থেকেই জানতাম, যা শুরু করেছ সবাই মিলে, অঘটন একটা ঘটিয়েই ছাড়বে। সেজন্যেই এর বিরোধিতা করেছি। তখন তো কেউ শুনলে না আমার কথা। এখন বাকি রয়ে গেছে কেবল তোমার আর মুসার মারামারি করে নাক ফাটানো।' মেয়ারের দিকে ফিরল সে, 'মিস্টার মেয়ার, যা ঘটে গেছে সেটার জন্যে আমরা দুঃখিত। যে-ই করে থাকুক, স্বীকার করুক আর না করুক, তার হয়ে আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি আপনার আর ইভার কাছে...'

'কিন্তু আরেকটু হলেই আমার ভাতিজীকে খুন করে ফেলেছিলে। মজা করতে এসেছ মজা করো যত ইচ্ছে, কিন্তু তাই বলে খুনোখুনি...'

'আহ্, আঙ্কেল, থামো না!' নিচে থেকে বলে উঠল ইভা। 'আমারই ভুল হয়ে গেছে, পুরানো রেলিঙে হেলান দিতে গেলাম কেন? সবাইকে দাওয়াত করে এনে পার্টি নষ্ট করার কোন মানে হয় না।'

সন্তুষ্ট হতে পারলেন না মেয়ার। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে নেমে আসতে লাগলেন সিঁড়ি থেকে।

ইভার পাশে এসে বসল ভিকি। 'থাক, অত চিন্তা কোরো না। তোমার পার্টি নষ্ট হবে না। যেমন জমে উঠেছে, তেমনই থাকবে।'

'হ্যাঁ, কোন ভয় নেই তোমার, পার্টি ঠিকই থাকবে,' জুন বলল। 'দেখি, দাওতো হাতটা, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।'

ইভাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে এখন সবাই। ভরসা দিতে লাগল, ওর পার্টি নষ্ট হবে না।

'থ্যাংক ইউ,' কাঁপা গলায় বলল ইভা। 'কয়েকটা মিনিট সময় দাও আমাকে, একটু রেস্ট নিয়ে নিই। তারপর আবার পুরোদমে চালু করে দেব পার্টি। এখনও অনেক কিছুই বাকি।' উঠে দাঁড়াল সে। 'ওপর থেকে আসছি

আমি। নিজের ঘরে যাব। কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

সঙ্গে সঙ্গে গেল ভিকি। কি যেন বলল ইভাকে। ইভাও কিছু বলল। হেসে উঠল দুজনে। তারপর ভিকি ফিরে এল, ইভা উঠে গেল সিঁড়িতে।

ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছে মুসা, 'এত খাতির হলো কি করে দুজনের? কিশোর, কি মনে হয় তোমার, রেলিঙটা ভিকিই কেটেছে?'

'ও না কাটলেও কে কেটেছে জানে ও, আমি শিওর,' রবিন বলল।

'ওই দুজনে মিলে আজ একটা অঘটন ঘটাবেই,' চিন্তিত ভঙ্গিতে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর।

'ইভাকে সাবধান করে দেয়া দরকার,' বলল মুসা।

'কি সাবধান করবে?' ফিরে তাকাল কিশোর। 'ওর কথাই তো বলছি আমি। অঘটনটা ও-ই ঘটাবে। বরং ভিকির জন্যেই ভয় হচ্ছে আমার।'

'কি বলছ তুমি কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'আমি চাই না ওর খারাপ কিছু ঘটে যাক। কারণ ইভাকে বিশ্বাস করতে পারছি না আমি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে আজ রাতে...'

'তুমি কি বলতে চাইছ রেলিঙটা ইভা নিজে কেটে নিজেই পড়ে যাওয়ার অভিনয় করেছে?'

'কে কেটেছে জানি না। যদি না-ও কেটে থাকে, ভিকির সঙ্গে কোন একটা খেলা খেলবেই সে আজ রাতে। আমাদের সবার সঙ্গেও খেলতে পারে।'

'তোমার কথার মাথামুণ্ড কিছুই বুঝতে পারছি না আমি। তাহলে কি ভিকিকে সতর্ক করবে এখন?'

'কিছু করার আগে কি ঘটতে যাচ্ছে সেটা জানা দরকার, সময় থাকতে থাকতে। নইলে কপালে খারাবি আছে বলে দিলাম।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। সরে যেতে লাগল ওখান থেকে।

'কোথায় যাচ্ছ?'

জবাব দিল না কিশোর।

একটা চুয়ান্ন ইঞ্চি ওয়াইড স্ক্রীন টেলিভিশন সেট বসানো আছে ঘরের এককোণে। তাতে হরর ছবি হচ্ছে: ব্রাইড অভ ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। ছবিটা দেখেনি মুসা। কয়েক মিনিট সেদিকে তাকিয়ে থাকল। সবে মনোযোগটা বসছে ছবিতে, এই সময় বিকট এক শব্দে কেঁপে উঠল পুরো বাড়ি।

ছবি চলে গেল টিভি থেকে। দপ করে নিভে গেল বাতিগুলো। সব অন্ধকার।

এগারো

চিৎকার শোনা গেল।

ভয় মেশানো হাসি।

ঘরে আলো বলতে একমাত্র ফায়ারপ্লেস থেকে আসা আগুনের আভা। কাঠ ফেলা হয়েছে আবার। কমলা রঙের কম্পিত শিখাগুলো ফায়ারপ্লেসের ভেতরের দেয়ালে অদ্ভুত সব ছায়া তৈরি করছে।

অন্ধকারে চাবুকের মত আছড়ে পড়ল যেন ইভার কণ্ঠ, 'তোমরা হয়তো ভাবছ এটাও আমার আরেক চমক।' হেসে উঠল সে। 'চমকই, তবে এটা আমার সৃষ্টি নয়, স্বয়ং ঈশ্বরের। বজ্রপাতের শব্দ। বাইরে আকাশের অবস্থা খুব খারাপ। কারেন্ট ফেল করেছে। ভালই হলো। এই অন্ধকারে আমার পরের খেলাটা জমবে খুব। কারও অতটা দুঃসাহস থাকলে খেলতে আসতে পারো।'

'পার্টির কি হবে?' জানতে চাইল ডারবি।

'এই গাধাটাকে কথা বলতে কে বলেছে!' অন্ধকারে ধমক শোনা গেল। 'পার্টির কথাই তো বলা হচ্ছে, বুঝতে পারছ না?'

আগুনের আলোয় ঘড়ি দেখল মুসা। রাত তিনটে বাজে! উত্তেজনায় কত দ্রুতই না কেটে গেছে সময়! আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে হ্যালোউইনের রাত। শেষ হবে পার্টি।

কিশোর কোথায় বোঝার চেষ্টা করল। অন্ধকারে দেখতে পেল না। জানে আশেপাশেই আছে কোথাও।

বেশিক্ষণ ভাবার সময় পেল না। ইভার কথা শোনা গেল আবার, 'খেলাটা একটু ভিন্ন ধরনের। নিজের দোষ স্বীকার করতে হবে। কে কোন্ খারাপ কাজটা করেছ জীবনে, সবচেয়ে খারাপ সেটা খোলাখুলি বলতে হবে উপস্থিত সবার কাছে। সত্যি কথা বলতে হবে। একবর্ণ মিথ্যে বলা চলবে না। শ্রোতারা যদি মনে করে মিথ্যে বলা হচ্ছে, শাস্তি পেতে হবে তাকে।'

'এমন খেলার কথা জীবনেও শুনিনি,' বলে উঠল জিম। 'বোকার মত প্রস্তাব।'

'সত্যি কথা বলতে ভয় পাচ্ছ?'

'না, পাচ্ছি না। তবে এটা কোন খেলাই নয়, বরং মানুষের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ। যাই হোক, ভয় পাচ্ছি না আমি।'

'গুড। কেন এই খেলার আয়োজন করলাম, বুঝতে পারোনি মনে হয়। পরস্পরের মনের কথা জানার জন্যে, চিনে নেয়ার জন্যে। বন্ধু হতে গেলে, সবার সব কথা জানা থাকা ভাল। কে প্রথম শুরু করতে চাও?'

কেউ সাড়া দিল না।

কয়েক মিনিট চুপ করে থেকে ইভা বলল, 'ডারবি, তুমি বলবে জীবনে

সবচেয়ে খারাপ কোন্ কাজটা করেছ?'

ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ঘামছে ডারবি। অস্বস্তি বোধ করছে। বলল, 'আমার মুখ দিয়ে বেরোবে না!'

চিৎকার করে উঠল একজন, 'আরে, ডারবি, তোমার মুখ দিয়ে বেরোয় না এমন কথাও আছে নাকি?'

হেসে উঠল কয়েকজন।

ডারবি হাসল না। কয়েক সেকেন্ড দ্বিধা করে বলেই ফেলল সে, 'একবার একটা খারাপ কাজ করেছিলাম বটে। বেড়াতে গিয়েছিলাম ফিয়ার আইল্যান্ডে···না, ভাই, আমাকে মাপ করো। আমি বলতে পারব না।'

'গাধা কোথাকার!' অন্ধকারে বলে উঠল আগের কণ্ঠটা। ডারবির গোপন কথাটা জানতে না পেরে হতাশ হয়েছে মনে হলো।

'খেলা শুরু করে না বলার জন্যে তোমাকে শাস্তি পেতে হবে,' ইভা বলল। 'এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকো আমি নামাতে না বলা পর্যন্ত।'

'এক পায়ে?' ভড়কে গেল ডারবি। 'কিন্তু আমি তো ব্যালান্স রাখতে পারি না। ছোটবেলায় কত মার খেয়েছি···'

'ও, তাই নাকি। তাহলে তো এটাই তোমার সবচেয়ে উপযুক্ত শাস্তি। দাঁড়িয়ে থাকো। এরপর কে বলবে? জুন?'

'আমারটা বলা কোন ব্যাপারই না,' হাসতে হাসতে বলল জুন। 'নিচের ক্লাসে পড়ার সময় বান্ধবীদের চকোলেট চুরি করে খেয়ে ফেলতাম···'

'এটাই তোমার সবচেয়ে খারাপ কাজ?'

'হ্যাঁ।'

হেসে উঠল সবাই।

'সবাই সত্যি বলে মেনে নিয়েছে তোমার কথা। তুমি বসতে পারো,' ইভা বলল। 'জিম, তুমি বলবে?'

জিম উঠে অঙ্কের ক্লাস ফাঁকি দেয়ার গল্প শুরু করল।

পুরো ব্যাপারটাই কেমন বোকামি মনে হতে লাগল মুসার, কিছুটা নিষ্ঠুরও। মনের গোপন কথা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে। ও ঠিক করল, কিছু বলবে না। শাস্তিও মেনে নেবে না। বললেই হলো! না মানলে কি করতে পারবে ইভা? ও নিশ্চিত, কিশোরও মানবে না। হয়তো জবাবই দেবে না। রবিনও বলবে না। অন্ধকারে কোথায় আছে ওরা বোঝা যাচ্ছে না। আলোচনাও সম্ভব নয়।

চারপাশে তাকাতে লাগল সে। অন্ধকার অনেকটা চোখে সয়ে এসেছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনের আলোয় এখন অনেক কিছুই মোটামুটি দেখা যায়। ঘরের কোনখানে কিশোরকে দেখল না মুসা।

অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। হল পেরিয়ে রান্নাঘরে চলে এল। কিশোর ওখানেও নেই। আবার হলরুমে যখন ফিরল, ডারবি তখনও একপায়ে দাঁড়িয়ে। আসলেই ও বোকা। মিনতি শুরু করল, 'অনেক তো হলো। এবার পা নামাই?'

'সত্যি কথাটা বলে ফেললেই নামাতে পারবে। অসুবিধে কি?'

'শুধু আমার কথা নয়তো, আরও অনেকে জড়িত। বললে ওদের কথাও বলতে হয়, সেজন্যেই বাধছে। অন্যের গোপন কথা ফাঁস করা কি ভাল?'

'এতক্ষণ বলোনি কেন একথা? ঠিক আছে। বসো।'

ইভার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল ভিকিকে। ইভা জিজ্ঞেস করল, 'এরপর কে বলবে?'

'তোমারটাই বলে ফেলো না,' ডারবি বলল।

হাসল ইভা, 'বলব তো বটেই। তবে সবার পরে। কারণ খেলাটা আমিই শুরু করেছি।...মুসা, তুমি বলবে নাকি?'

'না, এখন না,' মানা করে দিল মুসা। 'কিশোরকে খুঁজে পাচ্ছি না। ও কোথায়, দেখেছ তোমরা কেউ?'

'এখানেই তো ছিল,' এতক্ষণে খেয়াল করল রবিন। 'গেল কোথায়?'

'সত্যি কথা বলার ভয়ে লুকিয়ে পড়েছে দেখোগে,' হেসে রসিকতা করল জিম।

'বাজে কথা বোলো না!' রেগে উঠল মুসা। 'কিশোরকে তোমরা চেনো, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে পালালেও সে পালাবে না।'

রবিনও এসব খেলা আর পছন্দ করতে পারছে না। সে-ও রেগে গেল, 'তোমাদের এসব ইয়ার্কি মারা বন্ধ করলে খুশি হব। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এসব ফালতু খেলার মধ্যে নেই আর আমরা।'

'আমি কিশোরকে খুঁজতে যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'রবিন, এখানেই থাকো। ও যদি চলে আসে, বলবে।'

ইভা কিংবা অন্য কারও তোয়াক্কা না করে ম্যানটলের ওপর রাখা ওর টর্চটা তুলে নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল মুসা। সিঁড়িতে উঠতে বৃষ্টির শব্দ কানে এল। লিভিং রুম থেকে শোনা যায় না। ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে।

এক এক করে দোতলার ঘরগুলোতে উঁকি মেরে দেখতে লাগল মুসা। শেষ ঘরটা, অর্থাৎ ইভার বেডরুমেও যখন পেল না ওকে, কিছুটা ঘাবড়েই গেল।

জানালায় টর্চের আলো ফেলল। স্রোতের মত বৃষ্টির পানি নামছে কাঁচ বেয়ে। বাতাসের ঝাপটায় কেঁপে ওঠা পাল্লার শব্দ শুনেই অনুমান করা যায় তুমুল ঝড়ও হচ্ছে। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সেই আলোয় নুয়ে নুয়ে যাওয়া গাছের মাথাগুলো চোখে পড়ে।

কোন ঘরেই না পেয়ে চিলেকোঠার সিঁড়ির দিকে নজর দিল মুসা। এই অন্ধকারের মধ্যে ওখানে যাওয়ার কথা ভেবে দমে গেল সে। কিন্তু উপায় নেই। কিশোরকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সেদিন তৃতীয়বারের মত উঠে এল আবার চিলেকোঠায়। ধুলোয় ভরা নোংরা ঘরটায় আলো ফেলে দেখল। বাক্সগুলো তেমনি উল্টোপাল্টা হয়ে পড়ে আছে। কিম্ভূত সব ছায়া তৈরি করে নেচে নেচে উঠছে বিদ্যুতের আলোয়। প্রবল ঝাপটা মেরে যাচ্ছে বাতাস। কতটা ঝড় বইছে, চিলেকোঠায় এলে টের পাওয়া যায়। ঠাণ্ডা ঘাম বইতে শুরু করল ওর মেরুদণ্ড বেয়ে।

নাহ্, এখানেও নেই কিশোর। তবে কি আবার নিচে নেমে গেল? এমনও হতে পারে, ও একদিক দিয়ে উঠেছে, কিশোর আরেকদিক দিয়ে নেমে গেছে, সেজন্যেই দেখাটা হয়নি।

আলমারিটাতে আলো ফেলবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না ফেলে পারল না। একটিবারের জন্যেও ভাবেনি কিশোর ওটার মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে। তারপরেও কেন যে ফেলল সে নিজেও জানে না।

দরজা বন্ধ।

মনে পড়ল, শেষবার যখন যায়, খোলা দেখে গিয়েছিল।

বাতাসে বন্ধ হলো নাকি?

এগোল, পিছিয়ে গেল, দ্বিধা করল, আবার পা বাড়াল। দরজাটা বন্ধ কেন, না দেখে যেতে চায় না। কৌতূহল বাড়ছে।

কিন্তু কিছু এখন পাওয়া যাবে না ওটার মধ্যে, যুক্তি দিয়ে বোঝাল নিজেকে। উগ্ররা এখন সব লিভিং রুমে। তাদের কেউ এখানে এসে চমক সৃষ্টি করার জন্যে আলমারিতে ঢুকে থাকবে না। কিশোরের ঢোকার তো কোন কারণই নেই।

অহেতুক সময় নষ্ট করছে। কিন্তু আবার পিছাতে গিয়েও পিছাতে পারল না মুসা। যেন কোন অদৃশ্য শক্তি টেনে নিয়ে চলল ওকে আলমারির দিকে। কিছু না থাকুক, এসেছে যখন না দেখে যাবে না।

দরজাটা টান দিয়েই স্থির হয়ে গেল সে। একেবারে স্তব্ধ।

আলমারির মেঝেতে বাঁকা হয়ে বসে আছে একটা দেহ। বুক থেকে বেরিয়ে একটা বড় ছুরির বাঁট।

এটা ডামি নয়। টর্চের আলোয় ভালমত দেখতে পাচ্ছে সে। ভুল হওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। চশমার ওপাশে নিষ্প্রাণ চোখ দুটোও দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার।

হেনরি কার্টারিস!

বারো

দুই দুইবার ধোঁকা খেয়েছে। তৃতীয়বার আর আসল লাশ দেখেও বিশ্বাস করতে চাইল না। ছোঁয়ার সাহসটা পেল সেকারণেই।

নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখল। এখনও গরম। ডাক দিল, 'হেনরি, এই হেনরি, ওঠো। খেলাটা পুরানো হয়ে গেছে। যে খুশি জিতুকগে। আমাদের আর জেতার দরকার নেই।'

নড়লও না, সাড়াও দিল না হেনরি।

হঠাৎ মনে পড়ল মুসার, মানুষ মৃত না জীবিত তার নাড়ি দেখে বোঝা যায়। গলার কাছে টিপে দেখল। নাড়ি পেল না।

নাকের সামনে হাত বাড়াল। বাতাস লাগল না। নিঃশ্বাস নেই।

বুকের দিকে তাকাল। ছুরির হাতলটা দেখল। আগেরটার মত নকল কিনা বোঝার চেষ্টা করল। আসলই মনে হলো। ফলা আছে এটার, শুধু বাঁট নয়, পুরোটা ফলা ঢুকে গেছে বুকের মধ্যে। প্রচণ্ড শক্তিতে গেঁথে দেয়া হয়েছে।

এবার সত্যি সত্যি মারা গেছে হেনরি। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। চিৎকার করে ডাকল মুসা, 'হেনরি, ওঠো! প্লীজ! এসব খেলা আর ভাল্লাগছে না। সহ্যের বাইরে চলে গেছে।'

কিন্তু নীরব হয়ে রইল হেনরি। একইভাবে চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের ম্যানিকিনের মত নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে চোখদুটো।

আর দাঁড়াতে পারছে না মুসা। ধীরে ধীরে পিছিয়ে এল দরজার দিকে। এত জোরে লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ডটা, নিজের কানেই পৌঁছে যাচ্ছে যেন তার শব্দ।

ঝাড়া দিয়ে মাথার ভেতরটা পরিষ্কারের চেষ্টা করতে করতে নিচে নামতে শুরু করল সে। পা দুটোকে রবারের মত লাগছে. পানির নিচে হাঁটতে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়। কিংবা স্বপ্নের মধ্যে হাঁটার সময়।

খোদা, স্বপ্নই হয়ে যাক না এটা!

লিভিং রুমের কাছাকাছি আসতে টর্চের আলো এসে পড়ল তার মুখে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসছে টম। অবাক হয়ে গেছে মুসাকে দেখে। 'মুসা, কি হয়েছে? ভূত দেখেছ...'

'হেনরি মারা গেছে!' ভোঁতা গলায় জবাব দিল মুসা।

'কি?'

'হ্যাঁ। এইমাত্র দেখে এলাম। চিলেকোঠার আলমারিটার ভেতর।'

'সত্যি বলছ?' এত বেশি ধাপ্পাবাজির ঘটনা ঘটে গেছে, কেউই আর এখন কারও কথা বিশ্বাস করতে চাইছে না। চোখের পাতা সরু করে মুসার দিকে তাকাল টম। 'তখনকার ভিকির শোধটা নিতে চাইছ আমার ওপর, তাই না?'

'হেনরি মারা গেছে। বুকে একটা ছুরি গাঁথা। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখে এসেছি আমি।'

'এসব বুলেটলে আমাকে দেখাতে নিয়ে যাবে। তারপর আমাকে বোকা বানিয়ে হাসতে হাসতে আলমারি থেকে বেরিয়ে আসবে হেনরি। এই ফন্দি করেছ তো?'

'ও আর কোনদিন কারও ডাকে সাড়া দিয়েই বেরিয়ে আসবে না।' ধাক্কাটা সামলে নিতে আরম্ভ করল মুসা। 'তুমি বিশ্বাস করলে কি করলে না কিচ্ছু যায়-আসে না তাতে আমার। আমি পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছি।'

'এক মিনিট। চলো, দেখে আসি। হতে পারে আবার ঠকানো হয়েছে তোমাকে।'

'ঠকাবে কেন? ও আমার নিজের দলের লোক।'

'চলো।'

টমের সঙ্গে আবার চিলেকোঠায় ফিরে চলল মুসা। কারণ একটাই, এখনও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না হেনরি মারা গেছে। ক্ষীণ একটা আশা–গেলেই টমকে দেখে উঠে বসবে হেনরি, বিরোধী দলের লোককে ঠকাতে পেরে হাসবে!

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল মুসা। বার বার মনে মনে বলতে থাকল, 'খোদা, ওকে তুমি জ্যান্ত করে দাও!'

আলমারির দরজাটা খোলার সময় হাত কাঁপতে লাগল ওর।

খুলেই আবার যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল।

শূন্য আলমারি!

'আমি জানতাম,' টম বলল। 'ধোঁকা দেয়ার জন্যে আমাকে নিয়ে এসেছ। হাসবে তো? হাসো! হেসে গড়াগড়ি খাও! পয়েন্ট তো একটা পেয়ে গেলে!'

ওর কথা যেন কানেই ঢুকল না মুসার। শূন্য আলমারিটার দিকে তাকিয়ে আছে। বাঁধভাঙা জোয়ারের মত স্বস্তি ছড়িয়ে পড়তে লাগল মনে।

বাস্তব ছিল না ওটা? ধোঁকাবাজি? নাকি ও নিজেই পাগল হয়ে গেছে? হোক। হেনরি মরে যাওয়ার চেয়ে পাগল হয়ে গিয়ে ওর নিজের উল্টোপাল্টা দেখাটা বরং অনেক ভাল।

'মুসা!' খটকা লাগল টমের। 'কি হয়েছে তোমার? মাথাটাথা ঠিক আছে?'

'বুঝতে পারছি না। টম, সত্যি বলছি, ও এখানেই ছিল। এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলে গেল...' আলমারির মেঝেতে চোখ পড়তে থেমে গেল মুসা।

'কি?' বলে নিজেও দেখতে পেল টম। টর্চের আলোয় গাঢ় রঙের তরল পদার্থের একটা ধারা। কালচে লাল। আগের বারে ভিকির ফেলে যাওয়া রঙ নয়। তারপরেও বিশ্বাস করতে না পেরে নিচু হয়ে আঙুলের মাথায় লাগিয়ে তুলে আনল চোখের সামনে। মুসাকে টর্চ ধরতে বলল। চটচটে। আঠাল। আঁশটে গন্ধ।

কোন সন্দেহই নেই আর। রক্ত।

'ওই দেখো। আরও আছে,' টমের গলাও কাঁপছে এখন।

আলমারির কাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্তচিহ্ন চলে গেছে।

নীরবে অনুসরণ করে চলল দুজনে। কয়েকটা বাক্সের ধার ঘুরে চলে এল পেছনের জানালার কাছে।

জানালাটা খোলা। বৃষ্টি আসছে। ঘরের ভেতরে চৌকাঠের নিচেটা ভিজিয়ে দিয়েছে। চৌকাঠে রক্ত লেগে আছে। পুরোপুরি ধুয়ে দিতে পারেনি এখনও পানি।

এত জোরে জোরে যে হৃৎপিণ্ড লাফাতে পারে, জানতই না যেন টম। বুক চেপে ধরল। হেনরির লাশটার কি হয়েছে? খুন হওয়ার পর নিজে নিজে উঠে জানালা খুলে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বেরিয়ে গেছে? ব্ল্যাকফরেস্ট গোরস্থানের ভূতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সে-ও ভূত হয়ে গেছে? এখুনি এসে ঘাড় মটকাবে না তো?

দূর, কি আবোল-তাবোল ভাবছে! মুসার মত ভূত বিশ্বাস করে না সে। 'দাঁড়াও, বাইরেটা দেখছি আমি,' সাহস করে বলল বটে, কিন্তু ভয় যাচ্ছে না

কিছুতে।

জানালার পাল্লা ঠেলে পুরো ফাঁক করে দিল সে। বৃষ্টির মধ্যেই মাথা বের করে দিল বাইরে। পাশে দাঁড়িয়ে মুসাও গলা লম্বা করে নিচে তাকাল।

প্রায় একই সঙ্গে লাশটা দেখতে পেল দুজনে। দোতলার কাছে বেরিয়ে থাকা ডরমারের ছাতে দলামোচড়া হয়ে পড়ে আছে লাশটা। বুকে বিদ্ধ ছুরির বাঁটটাও টর্চের আলোয় দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

তেরো

'ওকে ওখান থেকে তুলে আনা দরকার,' টম বলল। খুঁজতে খুঁজতে একটা দড়ির বান্ডিল পেয়ে গেল। খুলতে শুরু করল সেটা।

'আমি যাচ্ছি,' সামান্যতম দ্বিধা না করে ভেজা, পিচ্ছিল চৌকাঠে উঠে বসল মুসা। লাফ দিয়ে পড়ল নিচের ছাতে। বাতাসে সুচের মত এসে মুখে বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটা। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

পড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলেই, ছাতের কিনারটা খামচে ধরে আটকাল কোনমতে। এরই মাঝে চিৎকার করে বলল, 'আর একটু…একটু আটকে থাকো, হেনরি, আমি আসছি।'

জানালা দিয়ে দড়িটা ফেলল টম। হাত বাড়িয়ে ধরে ফেলল মুসা। ধরে রেখে একটু একটু করে এগোল হেনরির দিকে। বুকে বেঁধা ছুরির বাঁট সেই একইভাবে খাড়া হয়ে আছে। এই প্রথম বিশ্বাস করল মুসা, হেনরি মারা গেছে। কেউ তাকে খুন করেছে।

খুন!

এর অর্থ, একজন খুনী লুকিয়ে আছে তাদের মধ্যে!

আপাতত মন থেকে ভাবনাটা দূরে সরিয়ে যে কাজে এসেছে সেটা শেষ করতে চাইল মুসা। ঢালু হয়ে থাকা চালায় পা পিছলালে তারও হেনরির গতি হবে। এক পা, এক পা করে এগিয়ে চলল সে।

চোখ থেকে চশমাটা পড়ে গেছে হেনরির। গা-ও আর আগের মত গরম নয়। তবে চোখ দুটো এখনও খোলাই আছে। দড়িটা ওর গায়ে বাঁধার সময় চোখের দিকে যতটা সম্ভব কম তাকাল মুসা। ছুরিটা যেখানে গেঁথে আছে, তার সামান্য ওপরে পেঁচিয়ে বাঁধল দড়ির একমাথা।

তারপর লাশটা নিয়ে এল একেবারে জানালার নিচে। ওপর থেকে দড়ি ধরে টেনে তুলতে শুরু করল টম। নিচে থেকে সাহায্য করল মুসা। কাজটা সহজ হলো না মোটেও। তবে যেভাবেই হোক, ওপরে টেনে তুলে জানালা গলিয়ে আবার চিলেকোঠায় ঢোকাল ওটা।

মৃত বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইল দুজনে। পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছে। জানালাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে টম বলল, 'ঢেকে দেয়া দরকার।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। একটা পুরানো কম্বল পাওয়া গেল। সেটা দিয়ে ঢেকে দিল লাশটা।

একটা কাজ শেষ। এরপর কি করবে ভাবতে লাগল মুসা। 'পুলিশকে খবর দিতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল টম, 'তা তো দেবই। কিন্তু তার আগে সবাইকে জানাব না?'

ভাবছে মুসা। কিশোরকে পাওয়া গেলে দায়িত্বটা ওর ওপর ছেড়ে দেয়া যেত। রবিনের সঙ্গেও আলাপ করা দরকার। তবে অন্য কাউকে জানানোটা উচিত মনে করল না সে। বলল, 'না, আগে পুলিশকে খবর দেব। ভুলে যাচ্ছ কেন, পার্টিতে উপস্থিত লোকের মধ্যেই একজন খুনী লুকিয়ে আছে। জানাজানি হয়ে গেলে পালানোর চেষ্টা করবে সে।'

'তাহলে মিস্টার মেয়ারকে অন্তত জানানো দরকার। এটা তাঁর বাড়ি। পুলিশকে ফোনটা তিনি করলেই ভাল হয়।'

লিভিং রুমে ফিরে এল ওরা। ভান করতে লাগল যেন কিছুই ঘটেনি। মুসার মনে হচ্ছে বহু ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। কিন্তু ঘড়ি দেখে বুঝল গেছে মাত্র কয়েক মিনিট।

গোপন কথা বলার খেলা চলছে এখনও। একটানা অন্ধকারের মধ্যে থাকতে বোধহয় ভাল লাগছিল না, তাই মোম জ্বেলে দেয়া হয়েছে কয়েকটা। আসল মোম।

সত্যবাদিতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে মেহমানরা। ঘরের কোণে মাথার ওপর ভর দিয়ে উল্টো হয়ে আছে ভিকি। মিথ্যে বলার শাস্তি হচ্ছে বোধহয় তার। শুধু হাস্যকর নয়, এই খেলাটার ওপর ভয়ানক বিরক্তি লাগল এখন মুসার।

ওদের ঢুকতে দেখে বলে উঠল ইভা, 'এসেছ। এইবার বলবে তো সত্যি কথাটা?'

'না, সময় হয়নি,' গম্ভীর হয়ে জবাব দিল মুসা। 'তোমার আঙ্কেল কোথায়? জরুরী কথা আছে।'

'এখানেই তো ছিল। নাকি রান্নাঘরে গেছে?'

'অনেকক্ষণ থেকেই আমি তাঁকে দেখছি না,' জুন বলল।

'গায়েব হওয়ার খেলায় মাতেননি তো?' হেসে রসিকতা করল জিম। 'কিশোর আর হেনরির মত। এ বাড়ির কোনখানে হয়তো বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মত একটা জায়গা আছে, ঢুকলেই গায়েব।'

তারমানে কিশোর ফেরেনি! চমকে গেল মুসা। হেনরি কেন গায়েব হয়েছে সে তো জেনেই এসেছে। কিশোরও কি…আর ভাবতে চাইল না সে। দৌড় দিয়ে আবার চিলেকোঠায় উঠে গিয়ে খোঁজার কথা ভাবল, এই সময় তার পিঠে হাত রাখল টম। 'চলো, রান্নাঘরে দেখে আসি।'

ওদের পেছন পেছন এল রবিন। মুসাকে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর কোথায়?'

নিচু স্বরে জবাব দিল মুসা, 'পাইনি। সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে। কেউ খুন করেছে হেনরিকে। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করে এখন তাঁকে দিয়ে

পুলিশকে ফোন করাতে হবে।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। কথা সরছে না মুখ থেকে। মুসার মত একই ভাবনা খেলে যাচ্ছে মাথায়–কিশোরকেও কি...'

রান্নাঘরের জানালার একটা খোলা পাল্লা দড়াম করে বন্ধ হলো বাতাসে। পাশেই দেয়ালে একটা ওয়াল ফোন জানালা দিয়ে আসা বৃষ্টিতে ভিজছে।

মেয়ারকে না পেয়ে মুসাই ফোন করতে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা খুলে এনে জরুরী নম্বরের বোতাম টিপতে শুরু করল। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে গেল। 'ডেড!'

'বাতাসে তার ছিঁড়ে ফেলেছে হয়তো,' অনুমান করল টম। 'বাইরে ডালপালার তো অভাব নেই। আর যা বাতাস...'

পেছনে একটা দরজা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন। দরজা খুলে উঁকি দিল। জানালার ঠিক ওপর দিয়ে এসেছে টেলিফোনের তার। দরজার বাইরে বারান্দা দেখে তাতে বেরোল সে। টর্চের আলোয় তারটা একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। বলল, 'কেটে রাখা হয়েছে। ওই দেখো।'

'খুনীর কাজ?' কণ্ঠের ভয় চাপা দিতে পারল না টম।

'তা ছাড়া আর কে?'

'কাকে সন্দেহ হয় বলো তো?'

'কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কি করে বলি? তোমরা দেখে এসেছ, তোমরা বলতে পারবে...'

'রিজো আর হগ। চলে গিয়ে চুপি চুপি ফিরে এসেছিল আবার। লুকিয়ে ছিল কোথাও। যেই সুযোগ পেয়েছে দিয়েছে খতম করে...এ ছাড়া আর কে?'

ভেবে দেখল মুসা। সত্যি কি ওরা দুজনই এসে খুন করেছে হেনরিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে তাহলে এখন?

'ফিরে এসে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল,' টম বলল।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ওরা যত বড় মস্তানই হোক, খুন করার কলজে নেই কোনটারই।'

'কি করে শিওর হচ্ছ? রাগ আর প্রতিশোধের নেশা যে কোন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে...'

'নিলেও। খুন ওরা করেনি।...কিশোর কোথায়?'

'ওর জন্যেই তো ভয় লাগছে!' জবাব দিল মুসা। 'সারা বাড়ি চষে ফেলেছি। কোথাও পেলাম না।'

'বেরিয়ে চলে যায়নি তো?'

'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'কি বলে গেছে ও মনে নেই? সময় থাকতে থাকতে যা করার করতে হবে। সেটা করতেই গেছে হয়তো।'

'অনিশ্চিত অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না আর। একটা খুন এরমধ্যেই হয়ে গেছে। কিশোরের আশঙ্কা ঠিক। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করা দরকার এখন। তাঁকে সব জানিয়ে রেখে আমাদের একজনের চলে যাওয়া

উচিত পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যে।'

হলরুমে ফিরে এল ওরা। সামনের দরজার পাশের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। হগের বাঁকাচোরা মোটর সাইকেলটা পড়ে আছে বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠে যেন জানিয়ে দিতে চাইছে মহাসর্বনাশের আগাম-সঙ্কেত।

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। দীর্ঘস্থায়ী হলো আলোটা। একটা জিনিসে নজর আটকে গেল মুসার। দৌড় দিল দরজার দিকে। ও কি দেখেছে অনুমান করতে না পেরে পেছনে ছুটল টম আর রবিন।

মোটর সাইকেলের সামনের চাকার নিচে কাদার মধ্যে পড়ে আছে নীল রঙের একটা মখমলের জ্যাকেট। ভাঁড়ের পোশাক। মেয়ারের পরনে ছিল ওটা।

তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল মুসা। জ্যাকেটের একটা হাতা রক্তে মাখামাখি।

চোদ্দ

'আরেকটা ধোঁকাবাজি, তাই না?' হালকা গলায় বলল জিম। 'আরেকটা চালাকি...'

'তা ছাড়া আর কি?' তার সঙ্গে সুর মেলাল ভিকি। 'আমরা জিতে গেছি দেখে কোনমতেই সহ্য হচ্ছে না মুসার। যে কোন ভাবেই হোক, ছলচাতুরি করে হলেও জেতাটা চাইই চাই এখন তার।...টম, ওর পক্ষে কথা বলার জন্যে কত ঘুষ খেয়েছ?'

'চালাকি নয় এটা, ভিকি!' কেঁপে উঠল টম। ভেজা কাপড়ে শীত লাগছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় শুকাচ্ছে এখন সে আর মুসা। রবিন বাইরে বেরোয়নি, তাই ভেজেনি। সবার নজর ওদের দিকে। পার্টির হাসিখুশি মেজাজটা এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। হ্যালোউইন পার্টির ধোঁকাবাজি আর ধোঁকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বাস্তব হয়ে গেছে।

চোখের পানি ঠেকাতে ঠেকাতে জুন বলল, 'তোমরা বলতে চাইছ হেনরি বেঁচে নেই...মারা গেছে?'

'খুন হয়েছে,' শুধরে দিল মুসা।

'কে...'

বাধা দিয়ে বলল ইভা, 'আর আঙ্কেলেরও কিছু হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। তবে তাঁর জ্যাকেটের হাতায় রক্ত লেগে আছে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ইভা। বহু আগেই উল্টো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে গেছে ভিকি, বসে আছে এখন ইভার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

পুলিশকে ফোন করাতে হবে।'

শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল রবিন। কথা সরছে না মুখ থেকে। মুসার মত একই ভাবনা খেলে যাচ্ছে মাথায়–কিশোরকেও কি...'

রান্নাঘরের জানালার একটা খোলা পাল্লা দড়াম করে বন্ধ হলো বাতাসে। পাশেই দেয়ালে একটা ওয়াল ফোন জানালা দিয়ে আসা বৃষ্টিতে ভিজছে।

মেয়ারকে না পেয়ে মুসাই ফোন করতে এগিয়ে গেল। রিসিভারটা খুলে এনে জরুরী নম্বরের বোতাম টিপতে শুরু করল। রিসিভার কানে ঠেকিয়ে স্থির হয়ে গেল। 'ডেড!'

'বাতাসে তার ছিঁড়ে ফেলেছে হয়তো,' অনুমান করল টম। 'বাইরে ডালপালার তো অভাব নেই। আর যা বাতাস...'

পেছনে একটা দরজা দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল রবিন। দরজা খুলে উঁকি দিল। জানালার ঠিক ওপর দিয়ে এসেছে টেলিফোনের তার। দরজার বাইরে বারান্দা দেখে তাতে বেরোল সে। টর্চের আলোয় তারটা একবার দেখেই যা বোঝার বুঝে নিল। বলল, 'কেটে রাখা হয়েছে। ওই দেখো।'

'খুনীর কাজ?' কণ্ঠের ভয় চাপা দিতে পারল না টম।

'তা ছাড়া আর কে?'

'কাকে সন্দেহ হয় বলো তো?'

'কোন তথ্য-প্রমাণ ছাড়া কি করে বলি? তোমরা দেখে এসেছ, তোমরা বলতে পারবে...'

'রিজো আর হগ। চলে গিয়ে চুপি চুপি ফিরে এসেছিল আবার। লুকিয়ে ছিল কোথাও। যেই সুযোগ পেয়েছে দিয়েছে খতম করে...এ ছাড়া আর কে?'

ভেবে দেখল মুসা। সত্যি কি ওরা দুজনই এসে খুন করেছে হেনরিকে? কোথায় লুকিয়ে আছে তাহলে এখন?

'ফিরে এসে জানালা দিয়ে ঢুকেছিল,' টম বলল।

'উঁহু, আমার তা মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রবিন। 'ওরা যত বড় মস্তানই হোক, খুন করার কলজে নেই কোনটারই।'

'কি করে শিওর হচ্ছ? রাগ আর প্রতিশোধের নেশা যে কোন পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে...'

'নিলেও। খুন ওরা করেনি।...কিশোর কোথায়?'

'ওর জন্যেই তো ভয় লাগছে!' জবাব দিল মুসা। 'সারা বাড়ি চষে ফেলেছি। কোথাও পেলাম না।'

'বেরিয়ে চলে যায়নি তো?'

'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে?'

'কি বলে গেছে ও মনে নেই? সময় থাকতে থাকতে যা করার করতে হবে। সেটা করতেই গেছে হয়তো।'

'অনিশ্চিত অবস্থায় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা যায় না আর। একটা খুন এরমধ্যেই হয়ে গেছে। কিশোরের আশঙ্কা ঠিক। মিস্টার মেয়ারকে খুঁজে বের করা দরকার এখন। তাঁকে সব জানিয়ে রেখে আমাদের একজনের চলে যাওয়া

উচিত পুলিশকে খবর দেয়ার জন্যে।'

হলরুমে ফিরে এল ওরা। সামনের দরজার পাশের একটা জানালা দিয়ে উঁকি দিল মুসা। হগের বাঁকাচোরা মোটর সাইকেলটা পড়ে আছে বাইরে। বিদ্যুতের আলোয় চকচক করে উঠে যেন জানিয়ে দিতে চাইছে মহাসর্বনাশের আগাম-সঙ্কেত।

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। দীর্ঘস্থায়ী হলো আলোটা। একটা জিনিসে নজর আটকে গেল মুসার। দৌড় দিল দরজার দিকে। ও কি দেখেছে অনুমান করতে না পেরে পেছনে ছুটল টম আর রবিন।

মোটর সাইকেলের সামনের চাকার নিচে কাদার মধ্যে পড়ে আছে নীল রঙের একটা মখমলের জ্যাকেট। ভাঁড়ের পোশাক। মেয়ারের পরনে ছিল ওটা।

তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করে দেখল মুসা। জ্যাকেটের একটা হাতা রক্তে মাখামাখি।

চোদ্দ

'আরেকটা ধোঁকাবাজি, তাই না?' হালকা গলায় বলল জিম। 'আরেকটা চালাকি...'

'তা ছাড়া আর কি?' তার সঙ্গে সুর মেলাল ভিকি। 'আমরা জিতে গেছি দেখে কোনমতেই সহ্য হচ্ছে না মুসার। যে কোন ভাবেই হোক, ছলচাতুরি করে হলেও জেতাটা চাইই চাই এখন তার।...টম, ওর পক্ষে কথা বলার জন্যে কত ঘুষ খেয়েছ?'

'চালাকি নয় এটা, ভিকি!' কেঁপে উঠল টম। ভেজা কাপড়ে শীত লাগছে। ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ভেজা কাপড় শুকাচ্ছে এখন সে আর মুসা। রবিন বাইরে বেরোয়নি, তাই ভেজেনি। সবার নজর ওদের দিকে। পার্টির হাসিখুশি মেজাজটা এখন আতঙ্কে রূপ নিয়েছে। হ্যালোউইন পার্টির ধোঁকাবাজি আর ধোঁকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বাস্তব হয়ে গেছে।

চোখের পানি ঠেকাতে ঠেকাতে জুন বলল, 'তোমরা বলতে চাইছ হেনরি বেঁচে নেই...মারা গেছে?'

'খুন হয়েছে,' শুধরে দিল মুসা।

'কে...'

বাধা দিয়ে বলল ইভা, 'আর আঙ্কেলেরও কিছু হয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। তবে তাঁর জ্যাকেটের হাতায় রক্ত লেগে আছে।'

দুই হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল ইভা। বহু আগেই উল্টো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে গেছে ভিকি, বসে আছে এখন ইভার পাশে। তার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করল।

মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়াল জুন। 'এখানে…এই ঘরের মধ্যে একজন খুনী রয়েছে…খুনী!' তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে তার কণ্ঠ। প্রলাপ বকার মত কথা বলছে।

'কিংবা ঘরের বাইরে,' টম বলল। টেলিফোন লাইন কেটে দেয়ার কথা জানাল সে।

'আমি বাড়ি যাব!' জুন বলল। 'এখানে আর এক মুহূর্তও নয়…' দরজার দিকে দৌড় দিল সে।

পেছন পেছন গেল ডারবি আর জিম।

ডারবি বলল, 'বেরোবে কি করে? যা বৃষ্টির বৃষ্টি!'

'বাইরে এখনও নিশ্চয় ঘাপটি মেরে আছে রিজো আর হগ,' জিম বলল। 'বেরোলেই ধরবে।'

'ধরুক! যা খুশি করুক! আমি আর এর মধ্যে নেই!' দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল জুন। মুহূর্ত পরেই শোনা গেল তার আর্তচিৎকার।

দৌড়ে গেল ডারবি আর জিম। খানিক পর ফিরে এল ডারবি, আগের চেয়ে ভীত। 'পড়ে গেছে ও। তাড়াহুড়ো করে নামতে গিয়ে সিঁড়িতে পড়ে গেছে।'

জুনকে বয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকল জিম। এখনও কাঁদছে জুন। তবে মরিয়া ভাবটা নেই। গুঙিয়ে উঠল, 'গোড়ালিটা গেছে আমার! ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে গোহ্!'

'আরে নাহ্, ভাঙেনি,' ওকে সোফায় বসিয়ে দিয়ে বলল জিম, 'মচকেছে একটু।'

'বাড়ি যাব কি করে?' ককাতে শুরু করল জুন। 'হাঁটতে তো পারব না! কে বয়ে নিয়ে যাবে?'

এগিয়ে এল ভিকি। 'দরকার হলে আমি নিয়ে যাব। অত চিন্তা করছ কেন?'

'এই থামো তোমরা!' চিৎকার করে বলল ইভা। 'আমাকে একা ফেলে চলে যাবে সব! আমি থাকব কি করে? বসে থাকো। সকাল হোক। বেরোনো সহজ হবে তখন।'

'কিন্তু পুলিশকে তো অন্তত জানানো দরকার,' রবিন বলল। 'সবার যাওয়ার দরকার নেই। গোস্ট লেনের মোড়ের পে-বুদটা থেকেই ফোন করা যাবে। গাড়ি নিয়ে গেলে কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না।'

'কিন্তু যাবে কে?'

'আমি যাব।'

গোরস্থানের অন্যপাশে গাড়িগুলো রেখে এসেছে ওরা। এই দুর্যোগের মধ্যে যাবে কি করে রবিন একা! ভাবনায় পড়ে গেল মুসা। কিন্তু পুলিশকে ফোন করতে হলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই। যাক। তাকে এখানেই থাকতে হবে। কিশোরকে খুঁজে বের না করা পর্যন্ত কোথাও যাওয়া চলবে না তার।

'ভাবনা নেই,' ইভাকে বলল রবিন। 'আমি যাব আর আসব। এখানে তো বাকি সবাই থাকছে। লিভিং রুম থেকে কোথাও যাবে না কেউ। সামনের দরজায় তালা দিয়ে রাখবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চলে আসব আমি।'

জ্যাকেটটা গায়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল রবিন।

ঘরে জুনের মৃদু ককানো ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। ডারবি উঠে গিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে এল।

আগুনের সামনে জড় হয়েছে সবাই। কেউ আর দূরে থাকতে চাইছে না। এমনকি আগুনের কাঁপা কাঁপা শিখার আলোয় ইভার মুখটাকেও ভীত-সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে।

'কয়েক মিনিটের বেশি লাগবে না,' জুনকে অভয় দিয়ে বলল টম। 'আমরা একসঙ্গে থাকলে কেউ কিছু করতে পারবে না...মুসা, কোথায় যাচ্ছ?'

'কিশোরকে এখনও পাওয়া যায়নি,' শান্ত থাকার চেষ্টা করছে মুসা। 'ওকে খুঁজতে গিয়েই তো হেনরিকে পেলাম।'

'এখনও বলো, কোন চালাকি নয়তো?' ভিকির কণ্ঠে সন্দেহ।

'তোমার মাথাটা আসলেই অতিরিক্ত মোটা, এজন্যেই বনে না তোমার সঙ্গে,' রেগে উঠল মুসা। 'পরিস্থিতি দেখেও বুঝতে পারছ না কি হচ্ছে?'

'সরি!' একমুহূর্ত দ্বিধা করে বলল ভিকি, 'আমি আসব তোমার সঙ্গে? সাহায্য হবে।'

'লাগবে না' বলতে গিয়েও বলল না মুসা। এখন শত্রুতা জিইয়ে রাখার সময় নয়। দুজনে মিলে খুঁজলে কাজটা সহজও হবে, তাড়াতাড়িও। এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল, 'এসো।'

★

বনের ভেতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে হাঁটছে রবিন। হুট করে বলে ফেলেছে ফোন করতে যাবে, কারণ কাউকে না কাউকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে। ঘরে থেকে কল্পনা করতে পারেনি রাতের এই সময়ে ঝড়তুফানের মধ্যে বাইরে বেরোলে কেমন লাগে। আসলেই কি এই ঝুঁকি নেয়ার কোন প্রয়োজন ছিল? রাত আর বেশি বাকি নেই। ইভা বলেছিল, সকাল হলেই সাহায্যের জন্যে বেরোতে পারবে। সেটাই করা উচিত ছিল।

কিন্তু বেরিয়ে এসে এখন আর ফিরে যাওয়ার উপায় নেই। টিটকারি দিয়ে ওর শান্তি হারাম করে দেবে উগ্ররা। তারচেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল।

হেনরিকে একটা মুহূর্তের জন্যে ভুলতে পারছে না সে। ভাগ্যিস লাশটা দেখেনি। তাহলে আর এগোতে পারত না।

যতবার বাতাসে ডাল নাড়ছে, চোখের সামনে ভেসে উঠছে হেনরির কঙ্কালের পোশাক পরা মূর্তি।

মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। বহু আগেই ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে সে। ঠাণ্ডায় কাঁপুনি উঠে যাচ্ছে। আশঙ্কা হতে লাগল ভয়ে না মরলেও ঠাণ্ডায় জমে মরবে!

যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল, কবরস্থানে পৌঁছতে তারচেয়ে বেশি সময় লাগল। এবড়োখেবড়ো মাটি এখন কাদা হয়ে গেছে। পিচ্ছিল। সাবধান না

থাকলে আছাড় খেতে দেরি লাগবে না। বাতাসের গতি বদলে গেছে। সরাসরি এসে মুখে আঘাত হানছে এখন। যেন গ্রেভ ম্যানশনে ফিরে যেতে আবার বাধ্য করতে চাইছে।

রিজো কিংবা হগকে দেখা গেল না কোথাও। হয়তো এতটা খারাপ আবহাওয়ায় তার পিছু নেয়ার কষ্ট না করে ঘরে বসে থাকাটাই সমীচীন মনে করেছে। কিন্তু হেনরিকে খুন করবে কেন ওরা? ও তো কিছু করেনি। এক হতে পারে, পার্টিতে যাদের দাওয়াত করা হয়েছে তাদের সবার ওপরই রাগ। যাকে আগে বাগে পেয়েছে, তাকেই দিয়েছে শেষ করে।

যতই এগোচ্ছে, সামনে উঁচু হয়ে উঠছে কবরস্থানের দেয়াল। কাছে এসে ঠেলে খুলল গেটটা। ঢুকে পড়ল ভেতরে। কবরফলকগুলোর দিকে যতটা সম্ভব কম তাকিয়ে এগিয়ে চলল মাঝখানের পথ ধরে। একটাই লক্ষ্য, কোনমতে পার হয়ে ওপাশে চলে যাওয়া।

প্রতিবার বিদ্যুৎ চমকানোর সাথে সাথে নীলচে আলো ছড়িয়ে পড়ছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রাচীন সব কবরফলক, পুরানো ইঁটের নিচু দেয়াল, গর্ত। দেখতে না চাইলেও দেখতে হচ্ছে ওকে। পরক্ষণেই বুকে কাঁপুনি তুলছে বজ্রপাতের শব্দ। ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। সন্ধ্যায় ম্যানশনে যাওয়ার সময় এই অবস্থা হবে কল্পনাও করা যায়নি।

পার হয়ে চলে এসেছে। আর মাত্র কয়েক গজ এগোতে পারলেই পৌঁছে যাবে গাড়িগুলোর কাছে। বিদ্যুতের আলোয় ওগুলোর দিকে তাকিয়ে স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল মনে।

আর কয়েক কদম এগোলেই বেরিয়ে চলে যাবে কবরস্থানের গণ্ডি থেকে। তারপর আর কোন ভয় নেই। নিরাপদ।

পৌঁছে গেল অবশেষে উল্টোদিকের গেটটার কাছে। হাত বাড়িয়ে ঠেলা মেরে খুলেই দিল দৌড়। যেন পালিয়ে যেতে চাইছে ভয়াবহ কবরস্থানের সীমানা থেকে।

পকেট থেকে গাড়ির চাবিটা বের করল। বিশাল এক গুবরেপোকার মত লাগছে ওর পুরানো ফোক্সওয়াগনটাকে।

কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছেই থমকে দাঁড়াল। দমে গেল মন। গাড়িটার বসে থাকার ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক। টর্চ না জ্বেলে, না দেখেও বুঝতে পারল, টায়ারগুলো বসা। বাতাস ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কিংবা খুঁচিয়ে ফুটো করে দিয়েছে টিউব।

পনেরো

শিওর, রিজো আর হগের কাজ, ভাবল রবিন।

এখন কি করবে? শহর অনেক দূর, হেঁটে যাওয়া সহজ কথা নয়। এত

কষ্ট করে এসে ফোন না করে ম্যানশনে ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না।

বিদ্যুৎ চমকাল। আলোকিত করে দিল চারদিক। কিছুদূরে রাস্তার পাশের বাড়িগুলো চোখে পড়ল। কোন একটা বাড়িতে গিয়ে ফোন করার অনুমতি চাইতে পারে। বেশির ভাগ বাড়িতেই লোক থাকে না, জানা আছে তার। যেগুলোতে থাকে, তাদের সবার ফোন আছে কিনা জানা নেই। ফোন থাকলেও রাতের এ সময় কড়া নাড়লেই দরজা খুলবে কিনা সন্দেহ আছে। অনেকেই ভূত বিশ্বাস করে এবং তাদের ধারণা রাতের এই সময়টাতেই কবরস্থানের ভূতগুলো উপদ্রব করে বেশি। রবিনকে ড্রাকুলা বা জোম্বি জাতীয় কোন ভূত ভেবে বসলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সবচেয়ে কাছের যে বাড়িটাতে লোক বাস করে, সেটার দিকে এগোবে কিনা ভাবছে ও, এই সময় কানে এল মোটর সাইকেলের এঞ্জিনের শব্দ।

ফিরে তাকাল। রিজো আর হগ দুজনেই মোটর সাইকেলে চেপে কবরস্থানের দেয়ালের একপাশ ঘুরে সোজা এসে পথরোধ করে দাঁড়াল তার।

'যাচ্ছ নাকি কোথাও?' বাঁকা স্বরে জিজ্ঞেস করল রিজো।

'ওদিকে কোথায় যাচ্ছ,' হাত নাড়ল হগ, 'পার্টি তো হচ্ছে ওই দিকে, প্রাসাদে। চলো, আরেকবার আমাদের নিয়ে চলো ওখানে।'

'না নিলে বুঝতেই পারছ কি ঘটবে!' হুমকি দিল রিজো।

দুজনেরই জড়ানো জিভ। মদ খেয়ে একেবারে পাঁড় মাতাল হয়ে আছে। কিন্তু এল কোনখান থেকে? প্রাসাদ থেকে পিছু নিয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না। তাহলে আরও আগেই এঞ্জিনের শব্দ কানে আসত। গাড়িগুলোর চাকার হাওয়া ছেড়ে দিয়ে নিশ্চয় গিয়ে কোনখান থেকে মদ খেয়ে এসেছে। জানে, সকাল হলেই ফিরবে সবাই এপথে। যাকে বাগে পাবে, তাকেই···

'কি, কথা বলছ না কেন?' ধমকে উঠল হগ।

প্রাসাদ নয়, অন্য কোনখান থেকে এসেছে! যদি তা-ই হয়ে থাকে–ভাবছে রবিন, তাহলে হেনরিকে খুন করল কে? কি করবে বুঝতে পারছে না সে। রাতের শুরু থেকে এ পর্যন্ত যা যা ঘটেছে, সব মিলিয়ে সহ্যের সীমা ছাড়িয়েছে তার। চাপ আর সহ্য করতে পারছে না উত্তেজিত স্নায়ু। যা ঘটে ঘটুক, কেয়ার করে না আর। ধমকে উঠল, 'সরো সামনে থেকে!' পা বাড়াতে গেল সে।

অ্যাক্সিলারেটর বাড়িয়ে এঞ্জিনটাকে অহেতুক গোঁ গোঁ করাতে শুরু করল রিজো। এই কায়দায় রবিনকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করল বোধহয়। তারপর বলল, 'আহাহা, চটছ কেন, শান্ত হও, খোকা, শান্ত হও।'

'ভদ্রতা খানিকটা শিখিয়ে দিই, কি বলো?' জ্যাকেটের পকেট থেকে টান দিয়ে চেন বের করল হগ। ভয়ানক ভঙ্গিতে ঘোরাতে ঘোরাতে নেমে এল সীট থেকে।

'দেখো,' বোঝানোর চেষ্টা করল রবিন, 'এখন এসব ফালতু ঝগড়া করার সময় নেই। সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে গেছে ম্যানরে।'

'তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটে যাবে এখানে,' হগ বলল, 'তোমার

ওপর।'

ভয় পেতে আরম্ভ করল রবিন। অতিরিক্ত গিলে ফেলেছে দুই মস্তান। যুক্তি এখন মাথায় ঢুকবে না ওদের।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে.' দুহাত তুলে পিছিয়ে গেল সে। 'শান্ত হও। যা বলবে তাই করব।'

'আরি, এত নরম কেন? সাহস আর বাহাদুরি তো খুব দেখালে তখন। কোথায় উবে গেল?'

'দেখো,' পালানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল রবিন, 'তোমাদের সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নেই। আমাকে আমার পথে যেতে দিচ্ছ না কেন?'

'কে বলল নেই?' পেছন থেকে বলে উঠল রিজো। 'আছে তো।'

একেবারে হতাশ হয়ে পড়ল রবিন। এ দুটোকে কোনভাবেই বোঝানোও যাবে না, সরানোও যাবে না। পালাতেই হবে। আচমকা পাক খেয়ে ঘুরে গিয়ে, ভেজা, পিচ্ছিল মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়তে পড়তে একছুটে আবার গিয়ে ঢুকল কবরস্থানে।

ওর ঠিক পেছনেই লেগে রইল রিজো আর হগ। মাতাল অবস্থায়ও অবিশ্বাস্য দ্রুত দৌড়াচ্ছে ওরা।

লম্বা একটা রাস্তা ধরে ছুটছে রবিন। ওর লক্ষ্য কবরস্থানের দেয়ালের অন্যপাশের বনটা, ব্ল্যাকফরেস্টের কুখ্যাত বন, যেটা নিয়ে ভয়াল কাহিনী আর গুজবের সীমা-সংখ্যা নেই।

কিন্তু পৌছতে পারল না ওখানে। একটা শেকড়ে পা বেধে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কোনমতে উঠে দাঁড়াতেই পৌছে গেল দুই মস্তান।

'যাচ্ছ কোথায়, চাঁদ!' জড়িত স্বরে বলল মাতাল রিজো।

'গোরস্থানের মধ্যে দিয়ে এভাবে দৌড়ায় কেউ? মরা মানুষগুলো জেগে উঠবে যে,' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই খলখল করে হেসে উঠল হগ। ধরার জন্যে হাত বাড়াল।

ঝট করে মাথা নিচু করে ফেলল রবিন। দৌড় দেয়ার চেষ্টা করতেই আবার পা পিছলাল। মাথা ঠুকে গেল একটা পাথরের ফলকে।

মাথার মধ্যে দপ করে জ্বলে উঠল সূর্য। তারপর অসংখ্য লাল-নীল তারা। মলিন হয়ে গেল তারাগুলো। কালো একটা পর্দা টেনে দেয়া হলো যেন ওর মাথার ওপর।

তারপর অস্পষ্টভাবে কানে আসতে লাগল দুই মস্তানের কণ্ঠ। যেন বহুদূর থেকে কথা বলছে ওরা। বুঝল, কয়েক সেকেন্ডের জন্যে জ্ঞান হারিয়েছিল সে।

'কি করলে?' রিজোর কণ্ঠে ভয়।

'আমি কিছু করিনি,' কৈফিয়ত দিল হগ, 'ও নিজেই তো আছাড় খেয়ে পড়ে গেল!'

'পড়ল তো খুব জোরে। যদি মরে যায়?'

'আমাদের কি? আমরা তো মারিনি।'

'পুলিশ সেকথা বুঝবে না...'
নড়ল না রবিন। মরার মত পড়ে রইল।

ষোলো

'দোতলায় একবার দেখে এসেছি আমি,' ভিকিকে বলল মুসা। 'তুমি আবার দেখতে পারো, তাড়াহুড়োয় কোন জায়গা আমার চোখ এড়িয়ে গেল কিনা।'

'দাঁড়াও,' ইভা বলল, 'আমি যাচ্ছি মুসার সঙ্গে। বাড়ির কোথায় কি আছে তোমাদের চেয়ে ভাল জানি আমি। সুবিধে হবে। আমার বাড়িতে এসে একজন লোক হারিয়ে যাবে, আর আমি চুপ করে বসে থাকব, এ হতে পারে না।'

'গেলে চলো,' ভিকি বলল, 'কিন্তু আমার যেতে অসুবিধে কি?'

'দরকার নেই,' মিষ্টি হেসে বলল ইভা, 'তুমি লিভিং রুমেই বসে থাকো সবার সঙ্গে। যদি কিছু ঘটে সামাল দেয়ার চেষ্টা কোরো। একজনকে খোঁজার জন্যে আমরা দুজনই যথেষ্ট।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফায়ারপ্লেসের সামনে বসে পড়ল ভিকি। গজগজ করতে লাগল।

'আমি দোতলায় যাচ্ছি,' ইভা বলল। 'তুমি নিচতলায় খুঁজতে থাকো।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। সারা বাড়িটাই খুঁজেছে সে একবার, মাটির নিচের ঘরগুলো বাদে। কিন্তু ওখানে কি গেছে কিশোর? কেন যাবে? কিন্তু এ ছাড়া আর যাবেই বা কোথায়? বাড়ির বাইরে যে যায়নি এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। কোন কারণে গেলে ওকে কিংবা রবিনকে বলে যেত।

অন্ধকার, সরু সিঁড়িটার দিকে এগোতে শুরু করল সে। পেছনে শোনা যাচ্ছে অন্যদের নিচুস্বরে ভীত-সচকিত কথাবার্তা। কণ্ঠস্বর ফিসফিসের ওপরে তোলার আর সাহস পাচ্ছে না যেন কেউ।

বাড়িটার বেজমেন্টে এই প্রথম নামছে মুসা। প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাঁচকোঁচ করে যেন প্রতিবাদ জানাচ্ছে কাঠের সিঁড়ি। ভয় লাগছে ওর, ভেঙে পড়বে না তো?

টর্চের আলোয় প্রচুর মাকড়সার জাল চোখে পড়ল। কড়ি-বরগাগুলোর অবস্থাও শোচনীয়। বেশ কিছু ভেঙে খসে পড়েছে ছাত থেকে। বোঝা যাচ্ছে, এখানটায় হাত দেননি মিস্টার মেয়ার, কোন রকম মেরামত করা হয়নি।

চিলেকোঠার মতই এখানেও বাক্স-পেটরার ছড়াছড়ি, তবে জায়গা বেশি বলে সংখ্যাও অনেক বেশি। প্রচুর ভাঙা তক্তা পড়ে আছে। পেছনে কি যেন খসখস করে উঠল। লাফ দিয়ে সরে গেল সে। ইঁদুর নাকি? তাই হবে। নাকি অন্য...নাহ্, ওসব ভাবতে চায় না!

নিচটা দেখে আবারও দমে গেল। না, এখানে নামেনি কিশোর। নামার কোন কারণ নেই। ওর নাম ধরে চিৎকার করে ডাক দিল কয়েকবার।

জবাব এল না।

তবে একটা শব্দ শুনল মনে হলো। কান পাতল কোনখান থেকে আসছে বোঝার জন্যে। অন্ধকার ঘরের শেষ মাথা থেকে। টর্চের আলো ফেলল সেদিকে। বড় একটা দেয়াল-আলমারি দেখা গেল। হেনরির লাশটা আবিষ্কারের পর আলমারি দেখলেই এখন ভয় লাগে। তবু এগিয়ে গেল। দরজা খুলতে হাত বাড়িয়েও হাতটা সরিয়ে নিল। আবার বাড়াল। দ্বিধা করতে করতেই এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলল পাল্লাটা।

প্রথমে মনে হলো কম্বলের একটা বড় পোঁটলা পড়ে আছে।

তারপর নড়ে উঠল পোঁটলাটা।

কিশোর!

মুসার দিকে তাকাল সে। চোখে ঘোর লাগা দৃষ্টি।

হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসে পড়ল মুসা। টেনে বের করে আনল আলমারি থেকে। টর্চের আলো ফেলে মুখটা দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'ভাল আছ তো?'

'আছি কোথায় তাই তো বুঝতে পারছি না!' চারপাশে তাকাতে লাগল কিশোর।

'ইভাদের বাড়িতে মাটির নিচের ঘরে।'

'বেজমেন্ট! এখানে এলাম কি করে?'

'সেটা তো আমারও প্রশ্ন। কি হয়েছিল তোমার?'

'জানি না। কেউ মাথায় বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলেছিল বোধহয়।'

'বাড়ি মেরে!' কিশোরের কপালের একপাশে সুপারির মত গোল হয়ে ফুলে ওঠা জায়গাটা দেখতে পেল মুসা। কালচে নীল হয়ে আছে। জিজ্ঞেস করল, 'বেহুঁশ হওয়ার আগে কি করছিলে?'

আলমারির গায়ে হেলান দিয়ে বসল কিশোর। বালি ঝাড়ল কাপড় থেকে। 'তোমাদের সঙ্গে কথা বলে আবার ইভার ঘরে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছিল, কিছু একটা মিস করেছি। বের করতে পারলে ইভার রহস্যজনক আচরণের জবাব পাওয়া যাবে। আলমারির ভেতরের গুপ্ত আলমারিটা গিয়ে খুললাম আবার। একটা জুতোর বাক্সের ওপর নজর আটকে গেল। ওই একটা বাক্সই আছে দেখে খুললাম ওটা। জুতো নেই ভেতরে। আছে অন্য জিনিস– পুরানো রশিদ, ছবি, চ্যাপ্টা হয়ে যাওয়া শুকনো ফুল আর এই এটা...' ব্ল্যাকফরেস্ট থেকে বেরোনো খবরের কাগজের একটা পুরানো, হলদে হয়ে যাওয়া নিউজ কাটিং।

হাতে নিয়ে কাগজটায় আলো ফেলল মুসা। পড়তে শুরু করল:

মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় দম্পতি নিহত

জোসেফ ডব্লিউ· গ্রেভ, ২৬, এবং তাঁর স্ত্রী, মার্থা, ২০, কাল রাতে এক মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন। অন্য একটা গাড়ি ধাক্কা দিয়েছিল তাঁদের গাড়িকে। মারটি কার্টারিস নামে এক লোক চালাচ্ছিল সেই অন্য গাড়িটা।

গোস্ট লেন দিয়ে একটা নতুন মডেলের ফোর্ড গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন গ্রেভরা। হঠাৎ পাশের ওল্ড মিল রোড থেকে তীব্র গতিতে বেরিয়ে এসে গাড়িটার পেটে গুঁতো মারে মারটি কার্টারিসের শেভ্রলে স্টেশন ওয়াগন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওই সময় অন্য আরেকটা গাড়ি অর্থাৎ একটা করভেটের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল কার্টারিস। করভেটটা চালাচ্ছিল বব নামে ১৬ বছরের একটা ছেলে। গুঁতো খেয়ে গড়াতে গড়াতে গিয়ে পাশের খাদে উল্টে পড়ে আগুন ধরে যায় ফোর্ড গাড়িটাতে।

পরে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে কার্টারিস বলেছে, 'কুয়াশা ছিল। গাড়িটা প্রথমে দেখতে পাইনি। যখন দেখলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করেছি। পারিনি।'

কার্টারিসের গাড়িটারও সমূহ ক্ষতি হয়েছে। করভেটটার কিছুই হয়নি। কার্টারিস, ডাউনার কিংবা দুটো গাড়ির বাকি যাত্রীদের কেউই তেমন আঘাত পায়নি, জখম হয়নি। মারটির গাড়িতে যারা যারা ছিল তাদের নাম: অ্যানি গ্রেন, ১৫, কোরি হাওয়ার্ড, ১৫, নিকিটা অরলিনস, ১৬, এবং হ্যারি ম্যাকারন, ১৪। আর করভেটের মধ্যে ছিল: রাফাত আমান, ১৮, টুম্পা লিনটন, ১৬, এবং ব্রন হুফার, ১৫। এরা সকলেই ব্ল্যাকফরেস্টের লোক।

তানিয়া নামে গ্রেভদের ১ বছরের একটা মেয়ে আছে।

পুলিশী তদন্তে অপরাধ প্রমাণ করা যায়নি কার্টারিস কিংবা ববের বিরুদ্ধে। অতএব কোন শাস্তিও হবে না তাদের।

দ্রুত লেখাটা পড়া শেষ করল মুসা। 'তারমানে প্রাসাদের আসল মালিকেরা ওই মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছে। আহারে, বেচারারা! গাড়ির মধ্যে থেকে জ্যান্ত পুড়ে কয়লা হওয়া...ভয়ঙ্কর ব্যাপার!'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'ইভা যে এতটা খেপে গেছে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।'

'কি বলছ?'

'মুসা, সেরাতে গাড়িতে যে দুজন পুড়ে মারা গেছেন, তাঁরা ইভার বাবা-মা।'

হাঁ করে কিশোরের দিকে তাকিয়ে রইল মুসা। 'তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাব নাকি? মাথায় বাড়ি লাগলে তো অনেক সময়...'

'না, বাড়ি লাগলেও মাথা খারাপ হয়নি আমার। ঠিকই বলছি...'

'পত্রিকায় বলছে মেয়েটার নাম তানিয়া। তুমি বলছ ইভার বাবা-মা...নাহ্, মাথায় ঢুকছে না আমার!'

'কেন, মনে নেই? বলেছিলাম না ইভার বাথরুমে পাওয়া প্রেসক্রিপশনে কি নাম লেখা আছে? তা ছাড়া, এটা দেখো।' পকেট থেকে আরেকটা জিনিস বের করে দিল কিশোর। একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স। অবিকল ইভার ছবি। কিন্তু নিচে লেখা: তানিয়া গ্রেভ।

'হুঁ,' খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থেকে অবশেষে বলল মুসা, 'গ্রেভদের

দূর সম্পর্কের আত্মীয় নয় তাহলে ইভা, বাড়ির একেবারে আসল মালিক…কিন্তু সে যে অন্য কেউ এটা কেন বোঝাতে চাইছে আমাদের?'

'এখনও মাথায় ঢুকছে না তোমার? অ্যাক্সিডেন্টের জন্যে যারা দায়ী, তাদের নামগুলো খেয়াল করে দেখেছ?'

দ্রুত আবার পেপার-কাটিংটায় চোখ বোলাল মুসা। 'কার্টারিস, হুফার…এখানে যারা দাওয়াত পেয়ে হাজির হয়েছে তাদের নামের সঙ্গে মেলে। এমনকি একটা নাম আমার বাবার নামের সঙ্গেও মিলে যায়। তাতে কি?'

'মুসা, তোমার বাবার নামের সঙ্গে যে নামটার মিল আছে, তিনি তোমার বাবাই। সেদিন ববের গাড়িতে ছিলেন। ব্রন হুফার আর মারটি কার্টারিস, জুন আর হেনরির বাবার নাম।'

'বুঝলাম। কিন্তু বাকি নামগুলো, এই যেমন কোরি হাওয়ার্ড, নিকিটা আরলিনস…'

'কোরি জিমের মায়ের নাম, জানি আমি। জিজ্ঞেস করে দেখোগে। নিকিটাও এখানে উপস্থিত কারও না কারও মা, আমি শিওর।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে থেকে কিশোরের কথাগুলো হজম করার চেষ্টা করল মুসা। যা বোঝাতে চাইছে কিশোর, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে তার।

'আরেকটা জিনিস,' কিশোর বলল, 'অ্যাক্সিডেন্টের তারিখটা দেখেছ?'

'অ্যাঁ!…দেখি তো?' মনে মনে হিসেব করে নিল মুসা। 'আটাশ বছর। তাতে কি?'

'তাতে? ওই সময় যদি ইভার বয়েস এক হয়ে থাকে এখন কত?'

'উনত্রিশ!'

'হ্যাঁ, মুসা, ইভা মোটেও হাই স্কুলের ছাত্রী নয়। যা ভেবেছিলাম, আমাদের চেয়ে দু'তিন বছরের বড়, তা নয়, ও একজন পূর্ণবয়স্ক মহিলা। চেহারাটাই অল্পবয়েসীদের মত, কিংবা প্লাস্টিক সার্জারি করে অমন করে নিয়েছে। তবে উনত্রিশ বছরের মহিলাকে উনিশ বছরের টিনেজের মত দেখা যায় এমন অনেক মহিলা আছে। মেকাপ করে নিলে বয়েস আরও কম দেখানোও সম্ভব।'

মৃদু শিস দিয়ে উঠল মুসা। 'তুমি যে জেনে গেছ, এটা জানলে ইভা কি করবে ভাবছি।'

'ও বুঝে গেছে, আমি জেনে ফেলেছি। কিংবা অন্য কেউ জেনেছে। জুতোর বাক্সটা আলমারিতে রেখে সবে বন্ধ করেছি, এই সময় টের পেলাম কেউ এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে। ঘুরে দাঁড়াতেই বাড়ি লাগল মাথায়,' কপালের ফোলা জায়গাটায় আঙুল রাখল কিশোর। 'তারপর আর কিছু মনে নেই…'

'তোমার ভাগ্য ভাল বেঁচে আছ। হেনরির মত একেবারে যে শেষ করে দেয়া হয়নি তোমাকে…'

'কি বলছ!'

'কিশোর, অনেক ঘটনা ঘটে গেছে।' হেনরির লাশ আবিষ্কার আর

মেয়ারের রক্তমাখা জ্যাকেট পাওয়ার কথা বিস্তারিত জানাল মুসা। মেয়ারও যে নিখোঁজ, বলল। 'তাহলে বুঝতেই পারছ, তোমাকে খুঁজে না পেয়ে কতটা দুশ্চিন্তা হচ্ছিল। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, তোমাকেও খুন করে ফেলেছে...'

'শুধু বাড়ি মেরেই কেন ছেড়ে দিল আমাকে, বুঝলাম না!' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'বেহুঁশ করার পর সহজেই খুন করে ফেলতে পারত।'

'কার কাজ, অনুমান করতে পারছ?'

'ইভা!'

'বলো কি?'

'তাই তো। নইলে আর কে খুন করবে হেনরিকে? ওর ওপর আর কার আক্রোশ আছে? মুসা, একটু ভাল করে ভেবে দেখো, তাহলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। যাদের যাদের দাওয়াত দিয়েছে, তাদের নামের তালিকাটা...'

'তুমি বলতে চাও সেরাতে যাদের বাবা-মা'রা ওই অ্যাক্সিডেন্টের সময় দুটো গাড়িতে ছিল, তাদের ছেলেমেয়েদেরকেই কেবল দাওয়াত করেছে ইভা?'

'হ্যাঁ। স্কুলে এত ছেলেমেয়ে থাকতে, কেন শুধু আমাদের দিল; রিজো আর হগ এত চাপাচাপি করার পরেও কেন ওদের কার্ড দেয়নি ইভা, এখন বুঝতে পারছ?'

'তাহলে তোমাকে আর রবিনকে কেন? তোমাদের বাবা-মায়ের কারও নাম তো নেই পত্রিকার লিস্টে।'

'অন্য কোন কারণ নিশ্চয় আছে। নইলে কার্ড দিত না ইভা।'

'যা-ই বলো, মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে।'

'কিন্তু এটাই ঠিক। ভাবতেই পারবে না কেউ, হাসিখুশি মিষ্টি মেয়ে ইভা টিনএজ নয়, পুরোদস্তুর একজন মহিলা, ভয়ঙ্কর খুনী। জেনে যখন গেছি, ব্যবস্থা নিতেই হবে। আমাদেরকে এখানে দাওয়াত করে আনার কেবল একটা উদ্দেশ্যই আছে তার,' থেমে দম নিল এক মুহূর্ত কিশোর। পরের কথাটা বলতে গিয়ে কেঁপে উঠল গলা, 'প্রতিশোধ!'

সতেরো

'জলদি ওপরে চলো!' পরিস্থিতির গুরুত্ব এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে মুসা। 'রবিন গেছে পুলিশকে খবর দিতে। ইভা কিছু করলে, পুলিশ আসার আগেই করে বসবে।'

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়ি বেয়ে লিভিং রূমে উঠে এল দুজনে। যেভাবে যাকে যেখানে দেখে গিয়েছিল মুসা, সেভাবেই বসে আছে সবাই। ফায়ারপ্লেসের কাছে। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে। ভীত, অসহায় ভাবভঙ্গি। কারও মুখে হাসি নেই।

ইভা বাদে। একটা চেয়ারের কিনারে বসে আছে সে। চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। চেহারায় উত্তেজনা। মুসা আর কিশোরকে দেখে আন্তরিক হাসি হাসল।

'এসেছ!' যেন কিছুই হয়নি, এমনি ভঙ্গি। মুসার দিকে তাকাল, 'কিশোরকে তাহলে বের করেই ছাড়লে। মোটামুটি সবাই হাজির। পার্টি আবার শুরু করা যায়।'

'পার্টি শুরু!' বোকা হয়ে গেল যেন মুসা। 'এই অবস্থায় আবার পার্টি চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন কি করে আপনি? ইভা, আসল কথাটা জেনে গেছি আমরা। আপনি খুন করেছেন হেনরিকে।'

পরের কয়েকটা সেকেন্ড কেউ কারও কথা বুঝতে পারল না। একসঙ্গে কথা শুরু করেছে সবাই।

'টেনে এসেছ নাকি?' বলে উঠল জিম।

'ওরা কি করতে চায় বুঝে গেছি আমি,' বিজ্ঞের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ভিকি। 'শেষবারের মত আরেকটা চেষ্টা করে দেখতে চায় জিততে পারে কিনা। কিন্তু এই নাটকে আর কাজ হবে না, মুসা। ভজাতে পারবে না কাউকে। জেতার কথা ভুলে যাও।'

'দেখো, আমার কথা শোনো সবাই!' শান্তভাবে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর। 'আমার কাছে পুরানো খবরের কাগজের একটা কাটিং আছে। তাতে প্রমাণ করা যাবে...'

কিশোর কাগজটা বের করার আগেই হাততালি দিয়ে হেসে উঠল ইভা। সবাই ঘুরে গেল ওর দিকে।

'চমৎকার!' ইভা বলল। 'কিশোর, মুসা, তোমরা দুজনেই একেবারে নিখুঁত অভিনয় করছ। রিহারস্যল্ যা দিয়েছিলে, তারচেয়ে অনেক ভাল। ব্যাপারটা আমার জানা না থাকলে, নিজেরই সন্দেহ হয়ে যেত, বোধহয় সত্যি আমি খুন করেছি হেনরিকে। কিন্তু ভিকি যেহেতু ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা, চালিয়ে গিয়ে লাভ নেই। পয়েন্ট পাবে না।'

'তুমি বলছ,' ইভার দিকে তাকিয়ে আছে টম, 'এটা আরেকটা ধাপ্পাবাজি!'

'আরেকটা চমক। ধাপ্পাবাজি শব্দটা শুনতে ভাল লাগে না।'

'ওর কথা বিশ্বাস কোরো না কেউ!' নিজেকে আর শান্ত রাখতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'ও মিথ্যে কথা বলছে!'

'এটা ধাপ্পা নয়, আসল,' মুসা বলল। 'টম, তুমি অন্তত বিশ্বাস কোরো না ওর কথা। তুমি তো নিজের চোখে দেখেছ হেনরির লাশ। ওটা তো ধাপ্পাবাজি ছিল না।'

'ঠিক,' সন্দেহ জাগল টমের। ইভার দিকে তাকাল আবার। 'হেনরির ব্যাপারটা তাহলে কি?'

'খেলা,' সহজকণ্ঠে জবাব দিল ইভা।

'খেলা! একে আপনি খেলা বলছেন?' রেগে উঠল মুসা। 'একটা লোক খুন হয়ে গেল...চালায় ফেলে দেয়া হয়েছিল লাশটা। আমি আর টম দুজনে

মিলে ওকে তুলে এনেছি। কম্বলচাপা দিয়ে রেখেছি চিলেকোঠায়। ইচ্ছে করলে যে কেউ গিয়ে দেখে আসতে পারে।...আপনি ওকে খুন করেছেন।'

হো হো করে হেসে উঠল ইভা, যেন বছরের সেরা জোকটা শুনেছে। 'যথেষ্ট হয়েছে, মুসা, থামো। আর অভিনয়ের দরকার নেই। অনেক পয়েন্ট পেয়েছ...'

'আপনি কি অস্বীকার করছেন, আপনি ওকে খুন করেননি?'

'না, করিনি। চিলেকোঠায় যদি ওর লাশই পড়ে থাকবে,' হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছে ইভার, মুছে নিয়ে বলল ইভা, 'খানিক আগে কথা বলে এলাম কার সঙ্গে? হেনরির ভূত যদি বলো, আমার বলার কিছু নেই। তুমি তো আবার ভূত বিশ্বাস করো...'

'কিন্তু...'

'ইভা, আমি...' বলতে গেল কিশোর।

'হয়েছে, হয়েছে, থামো,' কথাই বলতে দিল না ওদের ইভা। 'আজ রাতের শেষ চমকটার জন্যে তৈরি হও সবাই। মুসা আর টম দেখেছে মরা হেনরিকে, আমি ওকে এখন জ্যান্ত করে দেখাব।'

আঠারো

'কল্পনাও করতে পারিনি এই কাজ করবে তোমরা!' রাগত স্বরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে উঠল জিম। 'আর আমরা গাধারাও সেটা বিশ্বাস করে বসে ছিলাম...!'

'তবে কি নম্বরা জিতল?' ডারবির সন্দেহ এখনও যায়নি।

'একে জেতা ধরা যাবে না,' ভিকি বলল। 'কারণ ইভার সাহায্য পেয়েছ তোমরা। পার্টির মালিকের সরাসরি সাহায্য পেলে আমরাও জিততে পারতাম।'

'ডারবি!' চিৎকার করে উঠল মুসা, 'তোমার গোবরপোরা মাথাটাকে দয়া করে একটিবারের জন্যে একটু খাটাবে! বললাম তো, এটা কোন খেলা নয়! আসল! ভয়ঙ্কর বাস্তব!'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ছে কিশোর। মুসা তাকাতে ফিসফিস করে বলল, 'সবগুলো বোকার হদ্দ! সবাই বিশ্বাস করেছে ইভাকে। ওদের বোঝাতে হবে কি ভয়ানক বিপদের মধ্যে রয়েছি আমরা।'

'পারব বলে মনে হয় না। চলো, বেরিয়ে পড়ি। রবিনের আশায় বসে না থেকে জলদি গিয়ে পুলিশ নিয়ে আসি।'

মাথা নাড়ল কিশোর, 'গিয়ে লাভ নেই। ওর আগে ফিরতে পারব না। হয়তো পথেই দেখা হয়ে যাবে। বোকাগুলোকে এখন কোনমতেই এই বিপদের মধ্যে ফেলে যাওয়া যায় না। ইভার কথা বিশ্বাস করে বসে আছে ওরা।

ইভা যা বলবে তাই করবে। করে নিজেদের মরণ ডেকে আনবে। ওদের বাঁচাতে হলে এখানেই থাকতে হবে আমাদের।'

চুপ হয়ে গেল মুসা।

'ইভা,' ওকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করল কিশোর, 'এসব যদি ফাঁকিবাজিই হয়ে থাকে, আপনার আঙ্কেলের ব্যাপারটা কি? তিনি এখন কোথায়?'

'কেন, ভুলে গেছ?' কিশোরের ফাঁদে পা দিল না ইভা, 'আরও সোডা আনতে গেছে।'

মুসার মনে হলো, এরচেয়ে হাস্যকর জবাব আর হয় না। কিন্তু বোকাগুলো তা-ও বিশ্বাস করল। ফাঁকিটা ধরতে পারল না। 'আপনি বললেন একটু আগে কথা বলে এসেছেন হেনরির সঙ্গে। তাহলে কোথায় এখন সে?'

'যাক, মনে তাহলে পড়ল। করলে শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটা,' উঠে দাঁড়াল ইভা। 'আমি তো ভাবছিলাম, ভুলে গেছ, করবেই না আর। ডাইনিং রুমে আছে ও। আমার শেষ চমকটাতে সাহায্য করার জন্যে সব সাজাচ্ছে।'

সবাই পা বাড়াতে গেল ডাইনিং রুমের দিকে। হাত তুলে বাধা দিল ইভা, 'এক মিনিট। দেখি, হেনরির হলো কিনা?'

ঘুরে গিয়ে ডাইনিং রুমে ঢুকল সে। দরজাটা সামান্য ফাঁক করে রেখেছে। খানিক পর তার কথা শোনা গেল। জোরে জোরে বলছে, 'খুব ভাল হয়েছে, হেনরি। এর চেয়ে ভাল আর হয় না। থ্যাংক ইউ।'

কিছুক্ষণ ধরে ওকে কথা বলতে শোনা গেল। ঘাড়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে মুসার। বিশ্বাস করতে পারছে না। চালা থেকে যে লাশটাকে তুলে আনল, সেটা তাহলে কার? সত্যি কি জোম্বি হয়ে গেল নাকি হেনরি?

আবার দরজার বাইরে বেরিয়ে এল ইভা। বলল, 'এসো। সব রেডি।'

ডাইনিং রুমে কার আগে কে ঢুকবে, হুড়াহুড়ি শুরু করে দিল ওরা। ডারবি আর জিমের কাঁধে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঢুকল জুন। ঘরের ঠিক মাঝখানে চকচকে একটা পালিশ করা টেবিল। মাঝখানে রাখা একটা মোমের ঝাড়বাতিদানে বাতি জ্বলছে। চারপাশ ঘিরে চেয়ার। প্রতিটি চেয়ারের সামনে টেবিলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে ছোট ছোট গিফট-বক্স।

টেবিলের মাথার কাছে বসে আছে হেনরি।

বড়, ডিম্বাকৃতি-কাঁচের সানগ্লাস পরেছে সে। মোমের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাঁচে।

ইভা বলল। 'প্রতিটি বাক্সের গায়ে একটা করে নাম লেখা আছে। যার যারটা খুঁজে নিয়ে ওটার সামনের চেয়ারে বসে পড়ো।'

কিন্তু কেউ তার কথা শুনল না। সবাই গিয়ে ঘিরে দাঁড়াল হেনরিকে।

মুঠো পাকিয়ে রসিকতার ঢঙে হেনরির মুখের কাছে হাত নিয়ে গেল জিম। 'আচ্ছা ভয় দেখিয়েছ আমাদের, যা হোক। তোমার জন্যে সত্যি কষ্ট হচ্ছিল আমাদের।'

'হ্যাঁ,' ভিকি বলল। 'তুমি বেঁচে আছ জানলে যে এত খুশি লাগবে,

বুঝতেই পারিনি।'
জবাব দিল না হেনরি।
'ভাল খেল দেখিয়েছ আমাদের,' টম বলল। 'কিন্তু নিজের দলের সঙ্গে ধোঁকাবাজি করলে কেন বুঝলাম না।'
জবাব দিল না হেনরি।
কাছে থেকে ওকে দেখতে লাগল মুসা। কোথায় যেন কি একটা গোলমাল হয়ে আছে। হেনরি নড়ছে না। সামান্যতমও না। জীবন্ত মানুষের এতটা আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকার কথা নয়। 'এই, হেনরি,' বলে কাঁধ ধরে ওকে ঠেলা দিতে গেল সে।
ধীরে ধীরে কাত হয়ে গেল হেনরির দেহ। চেয়ার থেকে পড়ে গেলে মেঝেতে। চশমাটা খুলে ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কাঁচ ভাঙল। খোলা, নিষ্প্রাণ চোখ দুটো শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে ওদের দিকে।
'এবার বিশ্বাস করলে তো!' চিৎকার করে উঠল মুসা। 'বললাম না, ও মরে গেছে!'
লাশ দেখে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল জুন।
ওয়াক-ওয়াক শুরু করল ডারবি। বমি ঠেকাতে কষ্ট হচ্ছে।
চরকির মত পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল মুসা। পলকের জন্যে দেখল একটা স্ফুলিঙ্গের মত বেরিয়ে গেল ইভা। দড়াম করে লাগিয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।
পরমুহূর্তে তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ হলো।
ওদেরকে যে বোকা বানিয়ে বন্দি করে রেখে গেল ইভা, বোঝার জন্যে দরজা ঠেলে দেখার প্রয়োজন বোধ করল না কিশোর।

উনিশ

ঘরের একমাত্র জানালাটায় মোটা লোহার শিক লাগানো। দরজা মাত্র ওই একটাই, যেটা দিয়ে ঢুকেছে ওরা।
দৌড়ে গিয়ে থাবা মারতে শুরু করল জিম। ভারী ওক কাঠের দরজা তাতে কাঁপলও না। চিৎকার করে বলতে লাগল সে, 'আমাদের বেরোতে দাও! আটকে দিয়েছ কেন?'
'একটা লাশের সঙ্গে ফেলে গেছে আমাদের! উফ্, মাগো!' তীক্ষ্ণ চিৎকার করে উঠল জুন।
ভিকি আর জিম গিয়ে শিক ধরে টানাটানি শুরু করল। সামান্যতম বাঁকানো গেল না শিক। কিছুই করা গেল না ওগুলোর।
'জুন, থামো, শান্ত হও,' কাঁধে হাত রেখে ওকে শান্ত করার চেষ্টা করল কিশোর।

'হ্যাঁ। চুপ হয়ে যাও। চেঁচিয়ে কোন লাভ হবে না,' টম বলল। 'মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে দাও আমাদের...'

এই সময় জানালার বাইরে থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ইভা, 'চমকটা কেমন লাগছে!' হাতে একটা টর্চ ওর। এমন করে ধরে রেখেছে যাতে ওর মুখটা দেখতে পায় সবাই।

জানালার কাছে ছুটে গেল সকলে। দেখল, বৃষ্টি থেমে গেছে।

'সবচেয়ে সেরা চমক এটা, তাই না?' হেসে হেসে বলল ইভা। নিজের কাজে খুব সন্তুষ্ট মনে হচ্ছে ওকে। 'হ্যালোউইন ট্রিক।'

'বেরোতে দিন আমাদের,' মুসা বলল। 'আপনার মনে কি আছে, কি করতে চান, জানি না। তবে উদ্দেশ্য যে ভাল নয় আপনার, বুঝে গেছি। কিছু করতে পারবেন না অবশ্য। যে কোন সময় পুলিশ নিয়ে এসে হাজির হবে রবিন।'

'আহা, তাই তো, ভুলেই গিয়েছিলাম,' ঘাবড়ে যাওয়ার ভঙ্গি করল ইভা। পরক্ষণে হাসল। নিষ্ঠুর, শীতল হাসি। টেনে টেনে বলল, 'কিন্তু তোমাদের জ্ঞাতার্থে অতীব দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, ও আসবে না। যাতে না আসে, সেই ব্যবস্থা করে রেখেছি। কি মনে হয় তোমার? খামোকাই খেপিয়ে রেখেছি রিজো আর হগকে? যে ভাবে কুত্তার মত পিটিয়ে বের করেছ ওদের, অপমান সহজে ভুলবে না ওরা। দেখোগে তোমাদের বেরোনোর অপেক্ষায় কোনখানে ওত পেতে বসে আছে। আমিও সেটাই চেয়েছি। রবিনকে দেখলেই ক্যাঁক করে ধরবে।...শোনো, আজ রাতের শেষ চমক এটা, বলেছিই তো। আমি চাই, যার যার টেবিলে গিয়ে বসে এখন গিফট বক্সগুলো খুলে ফেলো।'

'শুরু থেকেই বোকা বানিয়ে এসেছ আমাদের!' খেপে গেল ভিকি 'ধোঁকা দিয়েছ। তোমার কথা কেন শুনব আমরা?'

'না শুনলে, আমার খেলা নষ্ট করলে,' বরফের মত শীতল হয়ে উঠল ইভার কণ্ঠ, 'ভীষণ রেগে যাব আমি। তখন কি করে বসব কে জানে। যা বলছি, করো। বসে পড়ো যার যার জায়গায়।'

এক এক করে নাম দেখে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়তে লাগল সবাই। মিনিটখানেক ধরে চেয়ার টানাটানির শব্দ হলো। পায়ে ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠল জুন।

'সবাই রেডি?' ইভা বলল, 'গুড। এখন সত্যি কথা বলার সেই খেলাটা শেষ করি। আমি আমার কথা বলব, শাস্তিটা ভোগ করবে তোমরা সবাই।'

আবার হাসল সে। ভয়ঙ্কর সেই হাসি মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা স্রোত বইয়ে দিল অনেকের।

'আমার কথা শুরু করার আগে,' ইভা বলল, 'তোমাদের বাক্সগুলো খোলো।'

অপেক্ষা করতে লাগল সে।

সবার বাক্সেই একটা করে ছবি। সবারটাই এক রকম, একটা মূল ছবির

কপি। ষাটের দশকের পোশাক পরা দম্পতির ছবি। মহিলার চুল কালো, তবে ইভার চেহারার সঙ্গে আশ্চর্য মিল।

'এরা কারা জানো?' বলতে শুরু করল ইভা। 'জোসেফ আর মার্থা। আমি যতক্ষণ গল্প বলব, ছবির দিকে তাকিয়ে থাকবে তোমরা।' তার নির্দেশ পালন করা হয়েছে কিনা দেখল সে। তারপর বলল, 'খুব সুখী দম্পতি ছিল ওরা। হাসিখুশি, নিশ্চিন্ত, ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। কিন্তু আজ থেকে আটাশ বছর আগে ওদের সে-স্বপ্ন ধ্বংস করে দেয়া হয়।

'আটাশ বছর আগে আজকের রাতে, অর্থাৎ হ্যালোউইনের রাতে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল দুজনে। অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসছিল, তাদের একমাত্র মেয়ের কাছে। মেয়ের বয়েস তখন মাত্র এক বছর। ভীষণ ভালবাসত ওরা মেয়েকে। গোস্ট লেন ধরে এগিয়ে আসছিল তাদের গাড়ি।'

থামল ইভা। পুরো ঘটনাটা জানা থাকলেও ওর কথা শোনার জন্যে কান পেতে আছে মুসা।

'ওই সময় আরও দুটো গাড়ি ভর্তি ছেলেমেয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল। ওল্ড মিল রোড ধরে ছুটছিল ওরা। কার আগে কে যাবে, পাল্লা দিতে শুরু করেছিল দুটো গাড়ি। দুটো গাড়িতে মোট নয়জন ছিল ওরা।

'মিল রোডের মুখটা যখন পার হচ্ছে জোসেফের গাড়ি, এই সময় বেরিয়ে এল পাল্লা দিতে থাকা দুটো গাড়ির সামনের গাড়িটা। ধাক্কা দিয়ে রাস্তার পাশের খাদে ফেলে দিল জোসেফের গাড়িটাকে। মুহূর্তে আগুন ধরে গেল তাতে। বেরোনোর কোন সুযোগই পেল না স্বামী-স্ত্রী। গাড়ির সঙ্গে পুড়ে কয়লা হয়ে গেল দুজনে। দমকলের লোক খবর পেয়ে উদ্ধার করতে আসতে আসতে সব শেষ হয়ে গেল।'

ছবি থেকে মুখ তুলে ঘরের সবার মুখের ওপর নজর বোলাল মুসা। ওদের চেহারা দেখেই বোঝা গেল, ইভার কথা শুনে সত্যটা এতক্ষণে আঁচ করে ফেলেছে প্রায় সবাই। কাঁদতে শুরু করেছে জুন। গাল বেয়ে পানি গড়াচ্ছে।

ইভা কাঁদছে না। টর্চের আলোয় কঠিন, পাথরে খোদাই মনে হচ্ছে ওর মুখটা। 'এখন আমি তোমাদের চোখ বন্ধ করতে বলব। কল্পনা করতে থাকো সেরাতে কি রকম যন্ত্রণা পেয়ে মরেছিল জোসেফ আর মার্থা। বদ্ধ, জ্বলন্ত গাড়ির মধ্যে আটকা পড়া, ভয়াবহ উত্তাপ, পালানোর কোন পথ নেই। যত জোরেই আর্তনাদ করুক, বাঁচানোর আকুতি জানাক, কেউ আসছে না বাঁচাতে। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝে ফেলেছ, জোসেফ আর মার্থা ছিল আমার আব্বা-আম্মা। কিন্তু দুটো গাড়িতে যে নয়জন ছেলেমেয়ে ছিল, তাদের নাম আন্দাজ করতে পারোনি। বলছি, মন দিয়ে শোনো। দেখো চিনতে পারো নাকি।'

একটা একটা করে নাম বলল ইভা, আর অস্ফুট শব্দ করে উঠতে লাগল একেকজন; হয় কারও বাবার নাম বলছে সে, নয়তো মা'র। কেবল মুসা চমকাল না। সে আগে থেকেই জানে। দুটো নাম কারও বাবা কিংবা মায়ের

সঙ্গে মিলল না।

'ওদের কারোরই সামান্য ছড়ে-কেটে যাওয়া ছাড়া কোন ক্ষতিই হয়নি,' ইভা বলল। 'দিব্যি বহাল তবিয়তে বাড়ি ফিরে গেছে ওরা। এমনকি পুলিশও কোন শাস্তি দেয়নি। কিন্তু দুটো প্রাণকে অকালে ঝরিয়ে দেয়ার জন্যে যে ওরাই দায়ী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ওদেরকে কেউ কোন শাস্তি দেয়নি বলেই আমি ঠিক করেছি, আমি দেব। ওদের পাপের শাস্তি ভোগ করতে হবে ওদের ছেলেমেয়েকে।'

জুনের মৃদু গোঙানি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই ডাইনিং রূমে।

'শাস্তি ভোগ করার প্রথম সম্মানটা পেয়েছে হেনরি, কারণ ওর বাবাই সামনের গাড়িটা চালাচ্ছিল সেরাতে, যেটা গিয়ে গুঁতো মেরেছিল আমার আব্বার গাড়িকে,' বলে যাচ্ছে ইভা। 'বাকি সবাইকে এখন একসঙ্গে যেতে হবে।'

'কিন্তু একজনের শাস্তি আরেকজনকে দেবে এ কেমন কথা!' চেঁচিয়ে উঠল জুন। 'ঘটনাটা ঘটিয়েছে আমাদের বাবা-মা'রা, আমাদের জন্মেরও বহু আগে। তাদের শাস্তি আমরা পাব কেন?'

'কারণ এ ছাড়া তাদেরকে শাস্তি দেয়ার আর কোন উপায় নেই বলে। তোমরা মারা গেলে যে মানসিক শাস্তিটা পাবে তারা, অন্য কোনভাবেই অতটা পাবে না। অতএব তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে বলি হতে হবে তোমাদের।'

'সবই বুঝলাম,' কিশোর বলল, 'কিন্তু আমাকে কেন? আমার বাবা কিংবা মা'তো সেরাতে কোন গাড়িতে ছিল না। আপনার আব্বা-আম্মাকে খুন করার জন্যে কোন দিক থেকেই দায়ী ছিল না তারা। আপনি বোধহয় জানেন না, তারাও এক কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে।'

'জানি আমি। তোমাকে আমার সমবেদনা জানাই। তোমার মৃত্যুর জন্যে তোমার বন্ধু মুসা আমানকে দায়ী করতে পারো। তোমাকে আর রবিনকে দাওয়াত করেছিলাম তোমাদের ফেলে একা যদি মুসা না আসতে চায়, সেজন্যে। তবে তোমাদের খুন করার কোন ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই সুযোগ পেয়েও তোমাকে খুন না করে, বেহুঁশ করে ফেলে রেখে এসেছিলাম বেজমেন্টে, যাতে বেঁচে যাও। রবিন যখন বেরিয়ে গেল, বাধা দিইনি সেকারণেই। আমি চেয়েছি, সে-ও বেঁচে যাক। রিজোরা ধরতে পারলে আচ্ছামত একটা ধোলাই দেবে ওকে, কিন্তু প্রাণে মেরে ফেলবে না।...বিনা কারণে কোন মানুষের মৃত্যু কামনা করি না আমি।'

'অ্যাই, ওঠো সবাই,' জিম বলল। 'চলো, এখানে আর এক মুহূর্তও নয়...'

হেসে উঠল ইভা, 'বেরোনো কি এতই সহজ?'

চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে মুসার কপালে। কিশোরের দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো। কোন রকম আশার আলো দেখতে পেল না কিশোরের চোখে। কিভাবে

ওদের খুন করতে চায় ইভা, জানে না এখনও; তবে ভয়ঙ্কর কোন উপায়ে যে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'ওকে কথা বলাতে থাকো,' ছবির দিক থেকে নজর না সরিয়ে ফিসফিস করে বলল কিশোর। 'সময় নষ্ট করাও।'

মুসা ভাবছে, কতক্ষণ লাগবে পুলিশ আসতে? রবিন তো গেছে, সে-বহুক্ষণ আগে। 'ইভা?'

'বলো?'

'একটা কথা কি বলবেন আমাদের? এভাবে সবাইকে বোকা বানালেন কি করে? অনেক ভাবনা-চিন্তা করে, হিসেব করে প্ল্যানটা বানিয়েছিলেন আপনি!'

খুশি হলো ইভা। 'যাক, বুঝতে যে পেরেছ সেজন্যে ধন্যবাদ। বহু সময় নিয়ে প্ল্যান করেছি আমি। জানতাম, ব্যর্থ হব না।'

'তাহলে এই পার্টি, এতসব চমক...সব আপনার প্ল্যানেরই অংশ?'

'নিশ্চয়। যা যা ভেবেছি, এখন পর্যন্ত কোনটাই ব্যর্থ হয়নি। ঠিক যেভাবে যেভাবে চেয়েছি, সেভাবেই ঘটেছে।'

কথা হারিয়ে ফেলল মুসা। কোন প্রশ্ন খুঁজে পাচ্ছে না।

মুখ তুলল কিশোর, 'কিন্তু একা একা করলেন কি করে এতসব? যেমন ধরুন, আমার মাথায় বাড়ি মেরে আমাকে বেহুঁশ করা, নিচতলায় বয়ে নিয়ে যাওয়া, সবার অলক্ষে। আপনি একা করেননি। নিশ্চয় আপনার কোন সহকারী আছে...কে, মেয়ার?'

'না, কেউ নেই। আমি একাই করেছি সব,' হাসিমুখে জবাব দিল ইভা।

'কিন্তু বেজমেন্টে বয়ে নিলেন কি করে আমাকে? আশ্চর্য! আমি জানি আপনার গায়ে অনেক জোর, ওয়েইট লিফটিং করেন, কিন্তু তাই বলে আমার ওজনের একজন মানুষকে একা একা এতখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া...'

'আমি বয়ে নিইনি। পুরানো ধরনের একটা ডাম্বওয়েইটার সিসটেম রয়েছে এবাড়িতে। তোমাকে ওটাতে তুলে দিয়েছি। বয়ে নিয়ে গেছে ওটা।'

'রেলিংটা কে কেটেছিল?' জিজ্ঞেস করল মুসা। 'আপনি?'

হেসে উঠল ইভা। 'তো আর কে? পার্টি দেয়ার আগেই সব কথা ভেবে রেখেছি আমি। জানতাম, সবাইকে বোকা বানানো সম্ভব হবে না আমার পক্ষে। কেউ না কেউ সন্দেহ করে বসবেই। বিশেষ করে কিশোর পাশাকে একটুও আন্ডারএস্টিমেট করিনি আমি। ও যে ধরে ফেলবে সহজেই, জানতাম। শুধু ওকে বোকা বানানোর জন্যেই কষ্ট করে ওই সাজানো অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটাতে হয়েছিল আমাকে। রেলিং কেটে, তার নিচে এমনভাবে সোফা রেখে দিয়েছিলাম, যাতে সোজা ওতে গিয়ে পড়ি। ব্যথা না পাই।'

'কিন্তু তারপরেও বোকা বানাতে পারেননি ওকে।'

'সে তো দেখলামই। কিন্তু তোমার বোকামির জন্যে শেষ পর্যন্ত বোকা বনতেই হলো ওকে। তোমাদের সঙ্গে অকারণে বেচারাকে মরতে হচ্ছে বলে সত্যি খারাপ লাগছে আমার। এখন আর ওকে বাঁচানোর কোন উপায় দেখছি না

আমি।'

কথা শেষ। কথা ফুরিয়ে গেলে সময়ও শেষ হয়ে যাবে। আর কি জিজ্ঞেস করা যায়? ভাবতে লাগল মুসা। কাফের কথা মনে পড়ল। 'উহ্‌হো, একটা কথা, সেদিন কাফেতে কার কাছে ফোন করে বলেছিলেন খেসারত দিতেই হবে? আমাদের কথাই বলেছিলেন, না?'

'তোমাদের চোখে দেখা যাচ্ছে কোন কিছুই এড়ায় না।' মাথা ঝাঁকাল ইভা, 'হ্যাঁ, তোমাদের কথাই বলেছি। এক বন্ধুর কাছে। সে আমাকে অবশ্য এসব করতে নিষেধ করছিল...'

'বন্ধুর নামটা বলবেন?'

'নাম জেনে এখন আর কোন লাভ নেই তোমাদের। ওকে চেনোও না তোমরা...যাই হোক, কথা অনেক হয়েছে...'

'এক মিনিট,' আঙুল তুলল কিশোর। 'স্কুলের লকারে ওসব নোটফোট আপনিই রেখে আসতেন, তাই না? পরস্পরের বিরুদ্ধে আমাদের খেপিয়ে তোলার জন্যে?'

'বুঝে ফেলেছ? তা তো বুঝবেই। তোমার বুদ্ধির ওপর শ্রদ্ধা আছে আমার।'

আবার ফুরিয়ে গেল কথা। মনের অলিগলি সব হাতড়েও আর কোন প্রশ্ন খুঁজে পেল না মুসা।

তবে কিশোর চুপ করে থাকল না। জিজ্ঞেস করল, 'হেনরির ব্যাপারটা কি?'

'ব্যাপারটা কি মানে?' বুঝতে পারল না ইভা।

'এখানে ঢুকে ওর সঙ্গে কি যেন বলাবলি করছিলেন শুনলাম?'

এটা ফালতু প্রশ্ন, বুঝতে পারল মুসা। অহেতুক কথা বলে ইভাকে থামিয়ে রাখতে চাইছে কিশোর।

হেসে উঠল ইভা। করুণার হাসি। 'কথা তো একাই বলেছি, ও আর বলল কোথায়। সবাইকে বুঝিয়েছি, হেনরি আছে, নইলে কি আর ফাঁকি দিয়ে একসঙ্গে এনে ঢোকাতে পারতাম এঘরে?' ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল তার হাসি। 'কিন্তু সময় ফুরিয়ে আসছে। ওপর দিকে তাকালেই দেখতে পাবে তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে কি চমৎকার সব স্পীকার লাগিয়ে রেখেছি।'

প্রায় একইসঙ্গে সবার চোখ ওপর দিকে উঠে গেল। বড় বড় চারটে স্পীকার লাগানো হয়েছে দেয়ালে, ছাতের সামান্য নিচে।

'ব্যাটারি-চালিত একটা ক্যাসেট ডেকের সঙ্গে কানেকশন দেয়া আছে ওগুলোর। ডেকটা আছে আমার নাগালে,' ইভা বলল। 'তোমাদের শাস্তি শুরু হোক এখন।'

'কিন্তু...' বলতে যাচ্ছিল মুসা।

'উঁহুঁ, আর কোন কথা নয়। চুপচাপ বসে বসে দেখো কি খেলা আমি দেখাই,' আবার হাসল ইভা। মিষ্টি হাসিটা দেখে এখন মুসার মনে হলো, ওতে

মধু নেই, আছে কেউটের বিষ মেশানো।

'তোমাদের শাস্তি দেয়ার কথা যখন মাথায় ঢুকেছে, তখন থেকেই ভাবতে আরম্ভ করলাম কি করে যতটা সম্ভব বেশি ভোগানো যায় তোমাদের, আমার বাবা-মাকে যেমন ভুগিয়েছে তোমাদের বাবা-মা'রা,' বলল ইভা। 'কিন্তু ওভাবে কার অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোর ব্যবস্থা করতে পারব না। হঠাৎ করেই মনে পড়ল, অ্যাক্সিডেন্টের পর যেভাবে ভোগে মানুষ, সেটা তো করতে পারব।' জানালার ওপাশে নিচু হলো সে। আবার সোজা হয়ে বলল, 'টেপটা চালু করে দিলাম। তোমাদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি করেছি।'

ভারী গোঁ গোঁ শব্দ বেরোতে শুরু করল স্পীকারগুলো থেকে। শক্তিশালী গাড়ির এঞ্জিনের শব্দ।

'আসল দুর্ঘটনার ব্যবস্থা যেহেতু করতে পারিনি,' বলতে থাকল সে, 'নকলটাই দেখো কেমন লাগে। ধাক্কা লাগা, ধাতব বডি দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া, মানুষের চিৎকার-চেঁচামেচি অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়ে শোনাব তোমাদের। ভয়ঙ্কর সে-শব্দ সহ্য করতে না পেরে যখন তোমরা গলা ফাটিয়ে অসহায় চিৎকার করতে থাকবে, মহাআনন্দে সেগুলো রেকর্ড করব আমি, টেপগুলো পাঠিয়ে দেব তোমাদের বাবা-মায়ের কাছে। আমার বাবা-মাকে কয়েক সেকেন্ডের বেশি কষ্ট ওরা দিতে পারেনি, আমি ওদের ভোগাব চিরটাকাল...'

এঞ্জিনের শব্দ বাড়ছে। নতুন শব্দ যুক্ত হলো তার সঙ্গে–টায়ারের তীক্ষ্ণ, কর্কশ আর্তনাদ। তীব্র গতিতে মোড় ঘুরতে গেলে যে রকম শব্দ করে গাড়ির চাকা।

ও কি শুধু এইটুকুই করবে নাকি?–অবাক হয়ে ভাবল মুসা। অ্যাক্সিডেন্টের শব্দ শোনাবে? আর কিছু না?

যেন তার মনের কথা পড়তে পেরেই বলে উঠল ইভা, 'শুধু শব্দ সহ্য করেই পার পাবে না। প্রচণ্ড ব্যথা, যন্ত্রণা সবই ভোগ করবে তোমরা। ওরা যেমন করেছিল।' খশ্ করে একটা সিগারেট লাইটার জ্বালল সে।

'ডাইনিং রুমের চারপাশের কাঠের দেয়ালে মোটা মোটা কম্বল লাগিয়ে দিয়েছি আমি। পেট্রলে ভিজিয়ে রেখেছি ওগুলো। আগুন দিলেই দপ করে জ্বলে উঠবে। এই যে, লাগাতে যাচ্ছি আগুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে তোমাদের কাছে। আমার বাবা-মা কতটা কষ্ট পেয়ে মরেছিল, সেটা অনুভব করবে, চিৎকার করতে থাকবে তোমরা। সেই সব বাস্তব চিৎকারের রেকর্ড শুনে তোমাদের বাবা-মায়েরাও হাড়ে হাড়ে অনুভব করবে ওভাবে অ্যাক্সিডেন্ট করে মরার কষ্টটা।'

আবার নিচু হয়ে একটু পর সোজা হলো ইভা। সরে গেল জানালার কাছ থেকে।

কিশোরের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল মুসা। মুক্তি পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা। কিন্তু এত জোরে শব্দ করছে স্পীকারগুলো, ওর নিজের কথাই নিজের কানে পৌঁছবে না। আর কিশোর তো কানেই খাটো।

ব্রেক কষার পর রাস্তায় চাকা ঘষার শব্দ হলো। প্রচণ্ড একটা আঘাতের শব্দ...দুমড়ে-মুচড়ে যেতে শুরু করল গাড়ির ধাতব শরীর, কাঁচ ভাঙার শব্দ, যন্ত্রণা আর আতঙ্ক মেশানো চিৎকার...

ফুল ভলিয়্যুমে বার বার একই শব্দ বাজতে থাকল স্পীকারে। কানের জন্যে প্রচণ্ড পীড়াদায়ক। কান চেপে ধরেও রেহাই পেল না কেউ, এতই জোরে বাজছে। ভয়াবহ শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে যেন ঘরের ভেতরটা। কাঁপছে দেয়ালগুলো।

সহ্য করতে না পেরে প্রথম চিৎকার শুরু করল জুন। তারপর ডারবি...তারপর জিম...

এরচেয়ে খারাপ কোন অত্যাচারের কথা আর ভাবতে পারছে না মুসা।

এই সময় ধোঁয়ার গন্ধ পাওয়া গেল। বন্ধ দরজার ফাঁক দিয়ে ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে ঘরে।

বিশ

সাংঘাতিক এক দুঃস্বপ্ন।

দুঃস্বপ্নটা বাস্তব।

কিশোর দেখছে, যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে একেকজনের চেহারা, শরীর মোচড়াচ্ছে, হাঁ করে চিৎকার করছে। চোখের পাতা টিপে বন্ধ করে, হাত দিয়ে কান চেপে ধরে রেখেও শব্দের অত্যাচার থেকে বাঁচতে পারছে না, ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে। ওর কান নষ্ট হওয়ায় এই অত্যাচার থেকে অনেকটাই বেঁচে গেছে।

ঘরে ধোঁয়া ঢোকা শুরু হলে উন্মাদের মত আচরণ শুরু করল কেউ কেউ। ভিকি আর জিম গিয়ে শিক টানাটানি করতে লাগল। শিকের গোড়ার কাঠ খামচে কেটে ফেলার চেষ্টা করল। নখ ভেঙে রক্ত বেরোতে লাগল। রক্তাক্ত হলো হাতের তালু। পরোয়াই করল না। যে কোন মূল্যে এখন শুধু বেরোতে চায়।

দরজার নিচ দিয়ে আসা ধোঁয়া ঘন হচ্ছে। হাতে সময় বিশেষ নেই। দরজায় তালু ঠেকিয়ে দেখল কিশোর, গরম হয়ে গেছে।

বেরোনোর কি কোন পথ নেই? সবাই মিলে ধাক্কা দিলে কি দরজাটা ভাঙা যাবে না?

মুসার কাঁধে হাত রেখে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে চিৎকার করে বলল সে, 'কিছু একটা করা দরকার!'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল শুধু মুসা। চোখে-মুখে অসহ্য যন্ত্রণার ছাপ। কথা বুঝতে পারল না।

ভিকির কানের কাছে গিয়ে চিৎকার করে কথা বলল কিশোর। সে-ও বুঝল না কিছু। আবার গিয়ে জিমকে নিয়ে শিক বাঁকানোর চেষ্টা করতে লাগল।

'মাথা খারাপ হয়ে গেছে সবগুলোর!' মনের ভাবনাটা চিৎকার করে বলল কিশোর।

অনেকটা তা-ই হয়েছে। এককোণে গিয়ে মুখ ঢেকে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে জুন। শব্দ শোনা যাচ্ছে না, তবে বোঝা যাচ্ছে। দরজায় পাগলের মত থাবা মারছে, আর চিৎকার করে কি যে বলছে ডারবি, সে-ই জানে।

কারও কাছ থেকেই এখন সাহায্য পাওয়ার আশা নেই, বুঝতে পারল কিশোর। একমাত্র সে-ই মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছে, সম্ভবত শব্দের অত্যাচার অন্যদের মত অত পীড়া দিচ্ছে না বলেই।

রবিনের আশাও ছেড়ে দিয়েছে সে। ইভা প্ল্যান করেই সমস্ত কিছু করেছে। রিজো আর হগ যদি ঘাপটি মেরে বসে না-ও থাকে, যেহেতু হগের মোটর সাইকেলটা নষ্ট করে দেয়া হয়েছে, কবরস্থানের অন্যপাশে রেখে আসা গাড়িগুলোর বারোটা বাজিয়ে প্রতিশোধ নেবে সে, তাতে একবিন্দু সন্দেহ নেই কিশোরের। আর গাড়ি নষ্ট থাকলে ফোন করতে যেতে পারবে না রবিন। হেঁটে গিয়ে সাহায্য নিয়ে ফিরে আসতে আসতে অনেক সময় লেগে যাবে। ততক্ষণ ওরা বাঁচবে না।

নিজে বাঁচার, সবাইকে বাঁচানোর ব্যবস্থা এখন ওকেই করতে হবে।

মনকে বোঝাল, আতঙ্কিত হওয়া চলবে না। ঘন হয়ে ওঠা ধোঁয়াকে অগ্রাহ্য করল। যুক্তিসঙ্গত চিন্তা করতে বাধ্য করল মনকে।

দরজাটা অতিরিক্ত ভারী। ভাঙা যাবে না। জানালার কাছে এসে ভিকি আর জিমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেও টেনে দেখল শিকগুলো। শক্ত। অনড়। এমন জায়গাতেই বন্দি করেছে ওদেরকে ইভা, যাতে কোনমতেই ভেঙে বেরোতে না পারে।

জানালার শিকের ফাঁকে নাক ঠেলে দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানল কিশোর। তাজা বাতাস টেনে নিল ফুসফুসে। ততক্ষণে কুয়াশার মত ঘন হয়ে গেছে ঘরের ধোঁয়া। মাথা গরম হয়ে গেছে সব কজনের, খেপা হয়ে গেছে একেকজন।

প্রতিশোধটা ভালই নিচ্ছে ইভা।

ইস্, যদি খালি আরেকটা পথ থাকত! যদি কোন রাস্তা– স্কাইলাইট, হীটিং ভেন্ট, বা···চোখ পড়ল দেয়াল থেকে বেরিয়ে থাকা একটা হাতলের ওপর। আশার আলো ঝিলিক দিয়ে উঠল যেন মনের কোণে। সাধারণ আলমারিই হবে হয়তো ওটা। কিংবা···

হাতলে টান দিয়ে ছোট পাল্লাটা খুলেই চিৎকার করে উঠল। আনন্দে।

পুরানো ডাম্বওয়েইটার সিসটেমের একটা অংশ এটা, যার কথা ইভা বলেছিল। ডাম্বওয়েইটার বাস্কেটটা খুব ছোট। ঠেসেঠুসে একজন মানুষের

কোনমতে জায়গা হবে।

একটা কথা মনে হতেই আশা উবে গেল কর্পূরের মত। কারও সাহায্য ছাড়া একা একা ওই ঝুড়িতে বসে নামতে পারবে না। পুলিতে লাগানো দড়ি টেনে নামানো হয় এই ঝুড়ি। সে বসলে অন্য আরেকজনকে দড়ি টানতে হবে। তাহলেই নামতে পারবে। কাকে রাজি করাবে? মুসা পর্যন্ত উন্মাদের মত আচরণ করছে। দুই হাতে কান চেপে ধরে চোখ বন্ধ করে বসে আছে। বিষাক্ত ধোঁয়ায় দম নিতে নিতে খাঁটি অক্সিজেনের অভাবে মগজটাও বোধহয় গুবলেট হয়ে গেছে ওর।

কাছে গিয়ে কাঁধ খামচে ধরে জোরে জোরে ঠেলতে শুরু করল কিশোর।

মুখ তুলে চোখ মেলে তাকাল মুসা।

গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলল কিশোর, 'মুসা, এসো আমার সঙ্গে!'

শূন্য দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল মুসা।

'মুসা!' আবার চিৎকার করল কিশোর। 'প্লীজ! এসো!'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে চোখ মিটমিট করল মুসা। হঠাৎ করেই পরিষ্কার হয়ে গেল দৃষ্টি। উঠে দাঁড়িয়ে মাথা ঝাড়া দিতে লাগল। 'কি?'

স্পীকারের প্রচণ্ড শব্দে ভাল কান যাদের তারাই শুনতে পাচ্ছে না, কিশোরের তো শোনার প্রশ্নই ওঠে না। তবে মুসার ঠোঁট নড়া দেখেই বুঝতে পেরেছে ও কি বলছে। ওর হাত ধরে ডাম্বওয়েইটারের দরজার কাছে টেনে নিয়ে চলল কিশোর। প্রথমে নিজের বুকে হাত রেখে ইশারা করল, তারপর দেখাল ঝুড়িটা, সবশেষে দড়ি টানার ভঙ্গি করে বোঝাতে চাইল কি করতে হবে। ইতিমধ্যে ভিকিরও চোখ পড়েছে ওদের ওপর। এগিয়ে এল সে। এমন ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে কিশোরের দিকে যেন পাগল হয়ে গেছে কিনা বুঝতে চাইছে।

মুসা বলল, 'পারবে না। মারা পড়বে।'

ওর ঠোঁট নড়া দেখে সহজেই কথা বুঝে নিল কিশোর। বোবাদের মত আকারে-ইঙ্গিতে বোঝানোর চেষ্টা করল, এমনিতেও তো মরেই গেছি, চেষ্টা করতে দোষ কি? ডাইনিং রুমের দরজার নিচ দিয়ে আসা ধোঁয়ার দিকে ইঙ্গিত করল। গলগল করে ঢুকছে এখন ঘন ধোঁয়া। ক্রমেই আরও ঘন হচ্ছে।

'ও ঠিকই বলছে!' কিশোরের কথাকে সমর্থন জানিয়ে চিৎকার করে উঠল ভিকি। 'এটাই আমাদের একমাত্র সুযোগ!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে সায় জানাল মুসা।

যাক, রাজি তো করানো গেল। কিন্তু কাজ করবে তো ডাম্বওয়েইটার?

ভিকি আর মুসা মিলে কিশোরকে তুলে ধরে ফোকরটা দিয়ে ঠেলে দিল ঝুড়ির কাছে। লম্বা দম নিয়ে ঝুড়িতে বসে পড়ল কিশোর। থুতনিতে হাঁটু ঠেকিয়ে পিঠ বাঁকা করে শরীরটাকে এঁটে নিল ছোট্ট ঝুড়িতে। বুক কাঁপছে। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুসা আর ভিকিকে ইশারা করল ওকে নামিয়ে দেয়ার জন্যে।

দড়ি টানতে শুরু করল ভিকি। পুলির ক্যাঁচকোঁচ, দড়ির পটপট আর নানা রকম বিচিত্র শব্দ করছে পুরানো মেকানিজম। শেষ পর্যন্ত টিকবে তো দড়িটা? না ছিঁড়ে পড়বে তার ভারে?

যা হয় হোকগে। অত ভেবে লাভ নেই।

নামতে নামতে হঠাৎ করে থেমে গেল ঝুড়ি। আটকে গেছে কিসে যেন। ওপরে তাকিয়ে দেখল জট ছাড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছে মুসা আর ভিকি। খুলতে পারছে না দড়িটা।

স্থির হয়ে আছে ঝুড়ি।

গরম হয়ে গেছে শ্যাফটের বাতাস। ধোঁয়ার গন্ধ। দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে আগুন। শীঘ্রি যদি আবার চলতে শুরু না করে ঝুড়িটা, পুরানো বাড়ির মান্ধাতার আমলের পাইপের মত শ্যাফটে দম আটকে মরতে হবে তাকে।

সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়ে ঝুড়িটাকে দোলাতে শুরু করল সে। ঝাঁকি লেগে যদি দড়ির জট খোলে। এরকম করতে থাকলে একটা কিছু ঘটবেই, এভাবে আটকে অন্তত থাকবে না। হয় ছুটে যাবে, নয়তো দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে ঝপাৎ করে নিচে পড়বে ঝুড়ি। যদিও তাতে হাড় ভাঙার শতকরা একশো ভাগ সম্ভাবনা।

আচমকা ওর পিলে চমকে দিয়ে হড়হড় করে কয়েক ইঞ্চি নেমে গেল ঝুড়ি।

ধড়াস করে উঠল বুকের মধ্যে। হাতুড়ির মত পিটাতে শুরু করল যেন হৃৎপিণ্ডটা। স্বাভাবিক হয়ে এল আবার যখন মসৃণ গতিতে ধীরে ধীরে নিচে নামতে শুরু করল ঝুড়ি।

থামল অবশেষে। ডাম্বওয়েইটারের আলমারির পাল্লা ঠেলে খুলল কিশোর। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল।

ওপরের তুলনায় বাতাস এখানে অনেক পরিষ্কার। বদ্ধ বাতাসে এক ধরনের ভাপসা গন্ধ। তা-ও ধোঁয়ার চেয়ে অনেক ভাল। কয়েকটা সেকেন্ড কিছুই না করে বসে বসে দম নিল কেবল। তারপর টর্চ জ্বেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলতে লাগল অন্ধকার ঘরটায়।

স্বাভাবিক কোন আকৃতি নেই মাটির নিচের এই ঘরটার। প্রচুর খাঁজ, ঘুপচি আর দেয়াল আলমারি। ভেবে অবাক হলো, এখান থেকে ওকে খুঁজে বের করেছিল কি করে মুসা!

সিঁড়িটা চোখে পড়ল। ছুটে গেল ওটার দিকে। তাড়াহুড়ো করে উঠতে যেতেই মচমচ করে উঠল কাঠের ধাপ। ভেঙে পড়ার ভয়ে থমকে গেল সে। তারপর সাবধানে এক পা এক পা করে উঠে চলল। মাথায় পৌঁছে দেখল আগুনের মত গরম হয়ে আছে দরজা। খুলতে গেলে হাত পোড়াবে। খোলার পর ভয়াবহ গরম বাতাসের ঝাপটায় প্রথমেই ঝলসে যাবে চোখমুখ।

এদিক দিয়ে বেরোতে পারবে না। অন্য কোন পথ খোঁজা দরকার।

আবার টর্চের আলো ফেলে দেখতে লাগল। ব্যাটারি ফুরিয়ে আসছে। কালচে, রোমশ একটা প্রাণী পায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে গেল। ইঁদুর কিংবা

ছুঁচোটুচো হবে। চমকে লাফ দিয়ে সরে গেল সে।

একটা জানালা চোখে পড়তে ছুটে গেল ওটার দিকে। তক্তা লাগিয়ে বন্ধ করা। হতাশায় কাঁদতে ইচ্ছে করল। এত কষ্ট করে ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়েও লাভ হলো না। মরতেই হলো···

খবরদার! ধমক লাগাল নিজেকে। মরোনি এখনও! আতঙ্কিত হওয়া চলবে না! তাহলে সত্যি সত্যি মরবে!

ডাইনিং রুমে সবাই এখন বাঁচার আশায় তার ওপর নির্ভর করে বসে আছে। মুসা তো নিশ্চয় ধরে নিয়েছে, এ যাত্রা বেঁচে গেল। ওর ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। ভাবছে, কিশোর যখন নেমেছে, বেরোনোর কোন না কোন উপায় করে ফেলবেই।

জানালার তক্তার ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে টানতে শুরু করল সে। নখ ভাঙল। রক্ত বেরোতে লাগল। তবুও থামল না। দমলও না। শেষ পর্যন্ত আলগা হতে শুরু করল পুরানো, নরম হয়ে যাওয়া তক্তা। বাইরে অযত্নে বেড়ে ওঠা ঝোপ চোখে পড়ল।

দ্বিগুণ উদ্যমে আবার তক্তা খোলার চেষ্টা চালাল সে। খুলে এল একটা তক্তা। বেরোতে হলে আরও দুটো খুলতে হবে।

ধরার সুযোগ পেয়ে গেছে। খোলাটা সহজ হবে এখন। তবে কতক্ষণ লাগবে কাজ শেষ করতে বলা যায় না। ওপরে ওর বন্ধুরা সব মারা যাওয়ার আগেই বেরিয়ে গিয়ে সাহায্য করতে পারবে কিনা, তা-ও জানে না···

ভাবনাগুলো মাথা থেকে দূর করে দিয়ে আরেকটা তক্তার কিনার চেপে ধরল সে।

টেনে টেনে প্রায় খুলে ফেলেছে, হঠাৎ গোড়ালি চেপে ধরল কে যেন।

একুশ

চিৎকার দিয়ে জানালার কাছ থেকে সরে যেতে চাইল কিশোর। নরম কিছুতে পা বেধে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

ইভা নাকি!

ওকে খুন করতে এল!

কিন্তু অত সহজে সেটা ঘটতে দেবে না।

টর্চের ম্লান আলোয় দেখল, ইভা নয়। ওর পা চেপে ধরেছেন ইভার আঙ্কেল মেয়ার। যে হাত দিয়ে ধরেছেন, ওই হাতটার কব্জি বাঁধা রয়েছে অন্য হাতের কব্জির সঙ্গে। পা দুটোও বাঁধা। নীল-সাদা শার্টে রক্ত লেগে আছে।

আরও আগেই কথা বললেন না কেন তিনি? নাকি বলেছেন, তার কান নষ্ট বলে শুনতে পায়নি?

টর্চের ব্যাটারি প্রায় শেষ। তাঁর একেবারে মুখের কাছে আলো ধরল সে। মুখে কাপড় গোঁজা। কথা না বলতে পারার কারণ বোঝা গেল। গোঁ গোঁ হয়তো করেছেন, কিন্তু নষ্ট কান নিয়ে উত্তেজনার মাঝে সেটা শুনতে পায়নি কিশোর।

টান দিয়ে মুখের কাপড়টা খুলে দিল সে।

'আমাকে বাঁচাও!' সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন তিনি। ভাঁড়ের সাজে সজ্জিত মুখটাকে কেমন বিকৃত লাগছে। 'প্লীজ! দড়ি খুলে দাও!'

'দিচ্ছি। আপনাকে পেয়ে ভালই হলো। আপনার সাহায্য দরকার এখন আমার।'

দ্রুতহাতে দড়ি খুলতে খুলতে সংক্ষেপে জানাল সে, ইভা ওদের নিয়ে কি করতে চেয়েছে। আগুন লাগানোর কথা শুনে চমকে গেলেন মেয়ার। 'ও, এজন্যেই ধোঁয়ার গন্ধ পাচ্ছিলাম। কল্পনাই করতে পারিনি ও...'

শেষ গিঁটটা খুলে দিয়ে কিশোর বলল, 'উঠুন। কথা বলার সময় নেই এখন। তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন মেয়ার। অনেকক্ষণ পায়ে দড়ি বাঁধা থাকাতে ঝিঁঝি ধরে গেছে। কয়েক সেকেন্ড বসে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিলেন। ওই কয়েকটা সেকেন্ডকেই কয়েক যুগ মনে হলো কিশোরের। ওপরে ওরা কি করছে এখন কে জানে!

দৌড়ে গিয়ে একটা আলমারি থেকে শাবল বের করে আনলেন মেয়ার। খুব দ্রুত খুলে ফেললেন জানালার তক্তা। ওরকম রোগাটে শরীরের তুলনায় বিস্ময়কর শক্তি।

বাইরে বেরিয়ে লোভীর মত হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল কিশোর। বুক ভরে টেনে নিল তাজা, বিশুদ্ধ বাতাস।

দেরি করা যাবে না। বাড়ির সামনের দিকে দৌড় দিল মেয়ারের সঙ্গে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে আগুন দেখতে পেল। ডাইনিং রুমের জানালার কাছে এসে দেখল সবাই এখন শিকের কাছে হুড়াহুড়ি করছে ফাঁক দিয়ে আসা বাতাসে দম নেয়ার জন্যে।

শাবল দিয়ে চাড় মেরে শিক ভাঙতে চেষ্টা করলেন মেয়ার।

নাহ্, কিছুই তো হচ্ছে না! আতঙ্কে গলার কাছে দম আটকে গেল যেন কিশোরের। চাপ বাড়ানোর জন্যে মেয়ারের সঙ্গে গিয়ে হাত লাগাল।

দুটো শিকের ফাঁকে শাবল ঢুকিয়ে চাড় দিতে দিতে একটু যেন বাঁকা হলো একটা শিক। ভরসা পেয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি একত্র করে চাপ দিতে লাগল দুজনে।

মোটা লোহার শিককে পরাস্ত করা গেল না, তবে চৌকাঠ ভেঙে বেরিয়ে এল একটা শিকের গোড়া। তাতে বরং সুবিধেই হলো। পটাপট বাকি শিকগুলোও খুলে ফেলা গেল সহজে।

প্রথমেই বেরিয়ে এল জিম। ভিকিকে বলল জুনকে তুলে ধরে পার করে

দিতে। মুসা আর ভিকি জুনকে তুলে ধরল। বাইরে থেকে তাকে ধরে আলতো করে মাটিতে নামিয়ে দিল জিম আর কিশোর। ওখানেই মাটিতে বসে পড়ে হাঁপাতে লাগল জুন।

এক এক করে বেরিয়ে এল সবাই। হাঁ করে দম নিচ্ছে। টকটকে লাল চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে অনবরত।

ওরা বেরোনোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আগুন ধরে গেল ডাইনিং রুমের দরজায়। দুই পাশের কাঠের দেয়ালে যে হারে দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল, দেখে শিউরে উঠল মুসা। বেরোতে আর মিনিটখানেক দেরি হলেই কেউ বাঁচত না।

এখানে থাকা নিরাপদ নয়। দৌড়ে সরে যেতে লাগল ওরা। জুনকে প্রায় বয়ে নিয়ে ছুটল ভিকি আর মুসা। সামনের চত্বরে এসে দাঁড়াল।

পুরো বাড়িটায় আগুন ছড়িয়ে পড়ছে।

উগ্র-নম্র দলাদলি আর ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি শুরু করল ওরা। বাঁচার আনন্দে অভিনন্দন জানাতে লাগল। কিশোরকে তো মাথায় নিয়ে নাচতে বাকি রাখল।

প্রচণ্ড উত্তাপ এসে লাগছে গায়ে। আরও দূরে সরে গেল ওরা। বাড়িটাকে পুড়তে দেখছে। কালো আকাশের অনেক ওপরে উঠে যাচ্ছে কমলারঙ আগুনের শিখা।

পুবের আকাশ ফ্যাকাসে হতে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ চড়চড় আওয়াজ তুলে ভেতর দিকে বাঁকা হয়ে গেল ছাতটা। আতশবাজির মত আগুনের ফুলকি ছিটিয়ে দিতে শুরু করল চতুর্দিকে। লনের ওপর ঝরে পড়ল ফুলকি।

এই সময় বনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল রবিনকে।

★

'আমি মরে গেছি ভেবে ভয়ে পালাল রিজো আর হগ,' কি ঘটেছে সবাইকে বলছে রবিন। 'তারপরেও পড়ে রইলাম কিছুক্ষণ, দূরে গিয়ে যদি খেয়াল রাখে, এই ভয়ে। কিন্তু ওরা আর ফিরল না। টলতে টলতে উঠে দাঁড়ালাম। চলে গেলাম কবরস্থানের কোণের বাড়িটায়। পুলিশকে ফোন করলাম।'

কপালে গোল হয়ে ফুলে উঠেছে ওর। কেটে গেছে অনেকখানি জায়গা। রক্ত লেগে শুকিয়ে আছে। গালেও রক্ত। তবে অসুস্থ লাগছে না।

টম আর ডারবি মাটিতে বসে বাড়িটাকে পুড়তে দেখছে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে যেন কিছুই ঘটেনি। লম্বা ভেজা ঘাসের ওপর বসেছে জিম আর জুন। কাপড় ভিজছে, কেয়ারই করছে না।

একা, নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে ভিকি। বিষণ্ন চেহারা। ওর সুন্দর রূপালী রাজকুমারের পোশাকটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা। পানি, কাদা, কালিতে মাখামাখি।

এক রাতের মাত্র কয়েকটা ঘণ্টায় এত কিছু ঘটে গেছে বিশ্বাস হতে চাইছে না মুসার।

দূরে সাইরেনের শব্দ শোনা গেল।

সবার সামনে এসে দাঁড়ালেন মেয়ার। চোখে পানি। 'তোমরা আমাকে মাপ করে দাও। বিশ্বাস করো, এই কাণ্ড ঘটাবে মেয়েটা, কল্পনাই করতে পারিনি আমি। তাহলে কিছুতেই রাজি হতাম না ওর কথায়।'

'আরেকটু হলেই গেছিলাম আজ আমরা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভিকি।

'কিন্তু আমি বুঝতেই পারিনি ও প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে আছে। আমাকে বলল, সামান্য একটু ভয় দেখাতে চায়...'

'তারমানে আপনার বুদ্ধিতেই হয়েছে এসব?' ভুরু কোঁচকাল মুসা, 'এই ভয়ঙ্কর নাটকের ব্যবস্থা আপনিই করেছিলেন!'

'বললাম তো, সামান্য একটু ভয় দেখাবে তোমাদের, বলেছিল ইভা,' লজ্জিত কণ্ঠে বললেন মেয়ার। 'ও যে সত্যি সত্যি তোমাদের...' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বললেন, 'ইভার বাপ ছিল আমার বড় ভাই। দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমার। ও চলে গেলে ইভাকে এমনভাবে মানুষ করতে চেয়েছিলাম যাতে ও বাপ-মা কারোরই অভাব না বোঝে। অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠ হতে গিয়েই বোধহয় ভাইয়ের প্রতি আমার ভালবাসা, যারা খুন করেছে তাদের প্রতি আমার মনের ক্ষোভগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছিলাম ওর মনেও। আমি সহ্য করেছি সব, মাপ করে দিয়েছি খুনীদের, কিন্তু ও ছেলেমানুষ, সেটা করতে পারেনি। বার বার বুঝিয়েছি ক্ষমার মধ্যেই আছে মহত্ত্ব, মনের শান্তি। কিন্তু ওর মনের মধ্যে তৈরি হয়েছে কেবল তীব্র ঘৃণা, প্রতিশোধের নেশায় পাগল হয়ে গিয়েছিল, আমি বুঝতে পারিনি।'

হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন তিনি। 'গত বছর হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। বাড়ির জন্যে মন কেমন করতে লাগল। ভাবলাম, বহু ঘোরাঘুরি হয়েছে, আর না। এবার বাড়ি গিয়ে, শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই।

'বহুকাল পর ফিরলাম। প্রতিবেশীরা চিনতে পারল না আমাকে। প্রচার করে দিলাম আমি গ্রেভদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়, যাতে কেউ এসে আমাকে বিরক্ত না করে, শান্তিতে থাকতে পারি। কিন্তু যেই ইভা শুনল, আমি এখানে এসে থাকতে চাই, কাজকর্ম সব ফেলে আমার সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির হলো। আমার কানের কাছে সারাক্ষণ ঘ্যানর ঘ্যানর করতে থাকল ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিলে ওর আত্মা কোনদিন শান্তি পাবে না, আমাকেও শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

আতঙ্কিত চোখে মেয়ারের দিকে তাকিয়ে আছে মুসা। যেন এক দুঃস্বপ্নের গল্প শোনাচ্ছেন তিনি, অথচ সব কিছু ঘটে গেছে বাস্তবে।

'বাকিটা তো তোমরা জানোই,' মেয়ার বললেন। 'বয়েস কমিয়ে স্কুলে গিয়ে ভর্তি হলো ইভা। চেহারা আর শরীরের গঠন এ ব্যাপারে বিরাট সাহায্য করল ওকে। উনত্রিশ বছর বয়েসেও দেখতে লাগে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ের মত...। আমাকে বাধ্য করল, যারা যারা সেরাতে গাড়ি দুটোতে ছিল, তাদের খুঁজে বের করতে। সে নিজেও এ কাজে সাহায্য করতে লাগল

আমাকে। তারপর তোমাদের ডেকে এনে সামান্য ভয় দেখিয়ে চিৎকার রেকর্ড করে ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব দিল। আমার কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে দাওয়াতের কার্ড পাঠাল তোমাদের।'

'কিন্তু আপনি বুড়ো মানুষ হয়ে এরকম একটা প্রস্তাবে রাজি হলেন কি করে?' ফুঁসে উঠল ভিকি। 'কি ক্ষতি করেছি আমরা আপনার? ওই সময় তো জন্মই হয়নি আমাদের...'

'জানি,' আবার কপাল ডললেন মেয়ার। 'আর লজ্জা দিয়ো না আমাকে। ইভার চাপাচাপিতে আমারও বোধহয় মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, নইলে কি আর এসবে জড়াই। তারপরেও, বিশ্বাস করো, দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি ও সত্যি সত্যি তোমাদের খুন করতে চায়। তবু স্বীকার করছি, যেটুকু করতে চেয়েছি সেটাও করা উচিত হয়নি। কাউকে আতঙ্কিত করে কষ্ট দেয়াটাও অপরাধ, তার ওপর একেবারেই নিরপরাধ কয়েকটা ছেলেমেয়েকে...সত্যি মাথাটা বিগড়ে গিয়েছিল আমার! নইলে একাজ করলাম কি করে!'

'তারমানে আপনার স্নেহ-ভালবাসার সুযোগ নিয়ে পুরোপুরিই আপনাকে বোকা বানিয়েছিল ইভা,' কিশোর বলল সহানুভূতি নিয়ে। সবার মত রাগল না সে। মেয়ারকে দোষারোপ করল না।

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার। 'তোমাদের বন্ধু হেনরির লাশটা দেখার পর আমার ভুলটা ভাঙল। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম ইভার কাজ। ওকে থামানো দরকার। নইলে সর্বনাশ করে ফেলবে। পার্টি বন্ধ করে দিতে বললাম। পুলিশকে ফোন করতে যাচ্ছিলাম...পারলাম না...'

'নিশ্চয় মাথায় বাড়ি দিয়ে বেহুঁশ করে ফেলেছিল,' কিশোর বলল। 'জানি আমি। আমাকেও তাই করেছে।'

মাথা ঝাঁকালেন মেয়ার। 'পুরো উন্মাদ হয়ে গেছে ও। বেহুঁশ করে বেজমেন্টে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছিল...'

'আপনি বলতে চাইছেন সব একা একা করছে ইভা! হেনরিকে খুন...আপনাকে পেটানো...কিশোরকে...' বিশ্বাস করতে পারছে না ভিকি।

'হ্যাঁ, ও একাই করেছে সব। ওর গায়ে কি পরিমাণ শক্তি আন্দাজ করতে পারবে না। ব্যায়াম আর ওয়েইট লিফটিং করে করে শরীরটাকে গঠনই করেছিল সে এজন্যে, বহুদিন থেকেই প্রতিশোধ নেয়ার প্ল্যান করে বসে আছে মনে মনে, আমি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারিনি। ফাঁকি দেয়ার অসাধারণ ক্ষমতা ওর, তার প্রমাণ তো তোমরাও পেলে আজ...'

'তা তো পেয়েছে!' হিসহিস করে উঠল একটা কণ্ঠ। 'তবে বেঁচে গেল ওরা তোমার জন্যে! আগে জানলে হেনরির সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও শেষ করে দিতাম...'

বাগানের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে ইভা। রাগে, উন্মাদনায় বিকৃত হয়ে গেছে ওর সুন্দর চেহারাটা।

'ইভা! তুই বেঁচে আছিস। আমি তো ভাবলাম...' কেঁদে ফেললেন

মেয়ার। কতটা ভালবাসেন ওকে এখনও তিনি, বুঝতে কারও অসুবিধে হলো না। হাত নেড়ে ডাকলেন, 'আয়, মা!'

'আমি আসব তোমার কাছে!' রাগে চিৎকার করে উঠল ইভা। 'তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ! শুধু আমার সঙ্গেই নয়, আমার বাবা-মায়ের আত্মার সঙ্গেও করেছ।...তোমার বেঈমানীর কারণেই আমার সব আশা শেষ হয়ে গেল...'

ঘৃণার আগুন আর গোক্ষুরের বিষ যেন একই সঙ্গে ঝরতে লাগল ইভার চোখ থেকে। ওর পান্না-সবুজ চোখে বদ্ধ উন্মাদের দৃষ্টি।

তাকিয়ে থাকতে পারল না মুসা। চোখ সরিয়ে নিল।

আচমকা ছুটতে শুরু করল ইভা।

বোকা হয়ে তাকিয়ে আছে সবাই। কি করতে চায় ও? আবার কোন্ চমক দেখাতে চায়?

একছুটে জ্বলন্ত বাড়িটার কাছে চলে গেল সে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

বাইশ

'না না, ইভা, না!'

মেয়ারের তীক্ষ্ণ চিৎকার চিরে দিল যেন ভোরের বাতাস।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নড়ে উঠল মুসা। কোন রকম চিন্তা-ভাবনা না করেই দৌড় দিল ইভার পেছনে। প্রচণ্ড তাপ লাগছে গায়ে চোখের কোণ দিয়ে দেখল ভিকিও দৌড়াতে শুরু করেছে।

সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় লক্ষ করল মুসা, মাত্র কয়েক গজ তফাতে আছে ভিকি।

গতি কমাল না মুসা। কয়েক লাফে উঠে এল জ্বলন্ত বারান্দায়

হলঘরে ঢোকার দরজার কাছে চলে গেছে ইভা। টলছে আগুন ধরে যাচ্ছে কাপড়ে। শব্দ শুনে ফিরে তাকাল। মুসা আর ভিকিকে পিছু নিতে দেখে অবাক হয়ে গেল। ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ফেলেছে। আবার ঘুরল হলঘরের দিকে। জ্বলন্ত এক অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে ওটা।

'ধরো ওকে! ধরো!' পেছন থেকে চিৎকার করে উঠল ভিকি। 'ঢুকতে দিয়ো না!'

ডাইভ দিল মুসা। পা চেপে ধরল ইভার। হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে।

টেনে সরিয়ে আনার চেষ্টা করতে লাগল মুসা। কিন্তু ইভার গায়েও সাংঘাতিক জোর। তার ওপর খেপা। খেপে গেলে মানুষের শক্তি এমনিতেই অনেক বেড়ে যায়। পারল না মুসা। টানতে টানতে ওকে ঘরের মধ্যে প্রায়

ঢুকিয়ে ফেলল ইভা।

চোখের কয়েক ইঞ্চি সামনে আগুনের শিখা নাচছে। চিৎকার করতে লাগল মুসা। কিন্তু ইভার পা ছাড়ল না। টের পেল কে যেন তার পা-ও চেপে ধরে টেনে বের করে নিচ্ছে ঘরের ভেতর থেকে। টানের চোটে ইভাও বেরিয়ে আসছে এখন।

বারান্দায় বের করে মুসাকে সিঁড়িতে ঠেলে দিল ভিকি।

গড়াতে গড়াতে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ল মুসা। ভয়াবহ গরম থেকে ঠাণ্ডা কাদায়। জুড়িয়ে গেল শরীর। উঠে বসে দেখল ইভাকেও বের করে নিয়ে এসেছে ভিকি। ছেঁড়া রূপালী জ্যাকেট দিয়ে ক্রমাগত বাড়ি মারছে ইভার গায়ে, কাপড়ের আগুন নেভানোর জন্যে।

ফোঁপাতে শুরু করল ইভা। খেপামি কমেছে। কাঁদছে আগুনে পোড়ার যন্ত্রণা আর পরাজয়ের গ্লানিতে।

মুসার পাশে এসে বসল ভিকি। ভয়ে, উত্তেজনায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। হাঁপাচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, 'কোথাও লেগেছে?'

মাথা নাড়ল মুসা, 'না, আমি খুব ভাল আছি। তুমি আমাকে বাঁচালে, ভিকি। থ্যাংকস।'

'আর তুমি যে আমাদের সবার জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করেছ,' মুসার কাঁধে হাত রাখল ভিকি। 'ইভার মায়াজালে জড়িয়ে গাধা বনে গিয়েছিলাম আমরা সবাই। তখন যদি তোমার কথা বিশ্বাস করতাম, এই ভোগান্তিটা আর হত না।'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চেয়ে রইল দুজন দুজনের দিকে। ভিকির চোখে আবার দেখল সেই পুরাতন চাহনি, যখন বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি ওদের।

হাসল মুসা।

ভিকিও হাসল। উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে দিল মুসাকে কাদা থেকে টেনে তোলার জন্যে।

পুরো চত্বরটা কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। ত্রস্ত পায়ের ছোটাছুটি, টর্চের আলো, সাইরেনের শব্দে ভরে গেল চারদিক। দমকল বাহিনীর লোকেরা ছুটল আগুন নেভাতে। অ্যাম্বুলেন্স থেকে দৌড়ে এলেন ডাক্তার আর তাঁর সহকারী। মুসা, ভিকি আর ইভাকে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন কতটা পুড়েছে।

কাছে এসে দাঁড়াল কিশোর আর রবিন। মেয়ারও এলেন ওদের সঙ্গে।

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়েই চলেছে ইভা।

মেয়ারের দিকে ফিরল কিশোর, 'এখন কি হবে ওর?'

'আরও আগেই যা হওয়া দরকার ছিল। চিকিৎসা।' মেয়ার বললেন, 'অনেক আগেই মানসিক রোগের হাসপাতালে পাঠানো উচিত ছিল ওকে। কিন্তু বিন্দুমাত্র বুঝতে পারিনি আমি।'

পুলিশের অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হলো ইভাকে। মেয়ার উঠলেন তাতে। জুনকেও তোলা হলো। হেঁটে যাওয়ার সাধ্য নেই তার। সাইরেন বাজিয়ে চলতে শুরু করল গাড়ি।

বুম করে কি যেন ফাটল প্রাসাদের ওপরে। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল আবার আগুনের ফুলঝুরি। ক্ষণিকের জন্যে আলোকিত করে দিল গ্রেভ ম্যানশনের পোড়া কঙ্কালটাকে।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তিন গোয়েন্দা। কাছাকাছিই রয়েছে হ্যালোউইন পার্টির অন্য চার মেহমান-জিম, টম, ভিকি আর ডারবি।

কালো ধোঁয়ার ওপাশে দিগন্তে উঁকি দিচ্ছে তখন লাল টকটকে সূর্য। হ্যাপি এনডিংই হতে পারত। কিন্তু হলো না। হেনরির মৃত্যু বিষণ্ন করে রেখেছে ওদের সবাইকে।

* * *

খেপা কিশোর

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৯

সাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছে কিশোর।

ঘোরাও হবে, ব্যায়ামও হবে। ছুটির দিন। হাতে কোন কাজ নেই। কোন রহস্যও নেই। মুসা আর রবিনের দেখা নেই। একা একা ইয়ার্ডে বসে থাকতে ভাল লাগছিল না। সকালটা কাটানোর জন্যে বেরিয়ে পড়েছে তাই।

রোদেলা দিন। প্যাসিফিক কোস্ট রোড ধরে এগিয়ে চলল সে। একপাশে প্রশান্ত মহাসাগর। আরেক পাশে পাহাড়। সাগর-থেকে ফুরফুরে হাওয়া এসে লাগছে ঘাড়ে, মুখে। গালে লাগছে রোদ। কড়া মোটামুটি মন্দ না, তবে বাতাসের জন্যে চামড়ায় কামড় বসাতে পারছে না। পরিবেশটা খুব ভাল লাগছে ওর।

পাইরেট'স হিলের কাছে হঠাৎ কালো রঙের একটা বুলেট আকৃতির গাড়ি আশি মাইল বেগে পাশ দিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল দমকা হাওয়ার মত।

ধাক্কা থেকে বাঁচতে গিয়ে কাত হয়ে পথের পাশের ঝোপের ওপর পড়ে গেল কিশোর। 'পাগল হয়ে গেলে নাকি!' চিৎকার করে উঠল ড্রাইভারের উদ্দেশে।

গাড়ি চালাচ্ছে যে ছেলেটা, বয়েস আঠারো-উনিশ হবে। চোখে কালো চশমা। সাদা একটা গলা-খোলা শার্ট গায়ে। কিশোরকে পড়ে যেতে দেখে পাশের খোলা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়েছিল। দাঁত বেরোনো হাসি দেখতে পেয়েছে কিশোর।

'বেয়াদব কোথাকার!' মেজাজ ঠিক রাখতে কষ্ট হচ্ছে কিশোরের। উঠে দাঁড়াল। বুনো জামের বেগুনী রস লেগে গেছে কাপড়ে। সাইকেলের দুটো স্পোক ছিঁড়েছে। হ্যান্ডেল ধরে সোজা করে ঠেলে নিয়ে এল রাস্তায়। চড়ে বসল আবার। রাগ পড়েনি এখনও। স্কুলের ম্যাগাজিনে এই বেপরোয়া গাড়ি-চালকদের বিরুদ্ধে কড়া করে একটা প্রতিবেদন লিখবে ভাবছে। মনে মনে হেডিংও ঠিক করে ফেলল :

খেপা চালকদের দৌরাত্ম্য
সাইকেল চালক আর পথচারীদের
নিরাপত্তা ব্যবস্থা
জোরদার করা প্রয়োজন

একটা মোড় ঘুরে অন্যপাশে আসতেই দেখতে পেল গাড়িটাকে। তীব্র গতিতে হারিয়ে যাচ্ছে সামনের বাঁকের আড়ালে। কয়েক সেকেন্ড পরেই

ব্রেকের তীক্ষ্ণ শব্দ কানে এল।
বিপদে পড়ল নাকি গাড়িটা!
দ্রুত দ্বিতীয় মোড়টাও ঘুরে এল সে। ব্রেক কষার কারণ বোঝা গেল। সরু রাস্তায় অতিরিক্ত গতিতে মোড় ঘুরতে গিয়ে সামলাতে পারেনি ড্রাইভার, রাস্তার যে পাশে সাগর, সেদিকের আধমানুষ সমান উঁচু একটা দেয়ালে গুঁতো মেরে, সেটা ভেঙে পড়ে যাচ্ছে।
কিশোর যখন দেখল, ভাঙা ফোকর দিয়ে গাড়ির পেছনটা তখন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে চেপে বসল ওর আঙুল। পাগলের মত প্যাডাল করতে করতে ছুটল সে। দেয়ালের সদ্য ভাঙা জায়গাটার কাছে পৌঁছে লাফ দিয়ে নামল। সাইকেলটা পথের পাশে শুইয়ে রেখে দৌড়ে এসে দাঁড়াল দেয়ালের কাছে। দেয়ালের অন্যপাশে ঢাল। ঝোপঝাড়ে ভরা। ঝাঁকি খেতে খেতে নেমে যাচ্ছে গাড়িটা।
কয়েক গজ গিয়েই ঢাল শেষ। তারপর পাহাড়ের খাড়া দেয়াল যেন ঝপ করে নিচে নেমে গেছে।
ঢালের কিনারে গিয়ে একটা বড় পাথরে গুঁতো খেল গাড়িটা। ধাতুর পাত ছেঁড়ার আর বাঁকাচোরা হওয়ার বিশ্রী শব্দ হলো। পাথর ঠেকিয়ে রাখতে পারল না ওটাকে। ঢালের বাইরে চলে গেল গাড়ি। নাক নিচু করে ডিগবাজি খেল। তারপর ঘুরে ঘুরে নিচে পড়তে লাগল। ঝোপ থেকে চিৎকার করে উড়ে গেল একটা পাখি।
হৃৎপিণ্ডটা যেন গলার কাছে উঠে চলে এসেছে কিশোরের। গাড়িটা কোথায় পড়ে দেখার জন্যে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে দৌড় দিল। হোঁচট খেয়ে পড়লে গাড়িটার মতই উড়ে গিয়ে নিচে পড়ার ভয় যে আছে, সে-খেয়ালও রইল না।
রাস্তার অন্যপাশে একটা গোলাবাড়িতে কাজ করছে একজন কৃষক। তারও চোখে পড়েছে ব্যাপারটা। দৌড়ে এল সে-ও। কিশোরের হাত ধরে টান দিল, 'আরে করো কি! মরবে তো!'
সাবধানে কিনার দিয়ে নিচে উঁকি দিল দুজনে। পাথরের ওপর পড়েছে গাড়িটা। পেছনটা উঁচু হয়ে আছে ওপর দিকে, বিশাল, অসহায় এক গুবরে পোকার মত। চাকা দুটো ঘুরছে। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল কিশোরের পাশে দাঁড়ানো লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাস। এমনিতে মোটামুটি নীরবই এখানটায়। বেশ অনেকটা দূরে সাগরের ঢেউয়ের একটানা ভারী গুঞ্জনের মত শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। এঞ্জিনের গর্জন, ব্রেকের আর্তনাদ, ধাতুর পাত ছেঁড়া আর পাথরে গাড়ির নাক ঠোকর খাওয়ার শব্দের পর শুধু ঢেউয়ের শব্দটা কেমন অবাস্তব লাগছে এখন।
'এখানেই থাকো!' বলে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া একটা খাড়া পথ ধরে নামতে শুরু করল লোকটা। কোথাও কোথাও পথ এত খাড়া, ঝোপের গোড়া কিংবা ঘাসের গুচ্ছ ধরে নামতে হচ্ছে।
এখনও ঘুরে চলেছে গাড়িটার চাকা দুটো।

লোকটা থাকতে বলে গেলেও এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন যুক্তি খুঁজে পেল না কিশোর। এগিয়ে গিয়ে লোকটার পিছু পিছু নামতে শুরু করল। প্রায় একসঙ্গে নিচে নামল দুজনে।

এক সময় পাথরের খনি ছিল ওখানটায়। পাথরের ওপর পড়ে থাকা গাড়িটার দোমড়ানো বডির দিকে তাকিয়ে আছে কিশোর। কালো কাঁচ তুলে দেয়া জানালাগুলোকে লাগছে মড়ার খুলির শূন্য কোটরের মত। ঘুরেই চলেছে পেছনের চাকা দুটো। দামী, শক্তিশালী এঞ্জিন। এত ওপর থেকে পড়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতেও বন্ধ হয়নি।

ছেলেটার কথা ভাবছে কিশোর। 'ড্রাইভার বেঁচে আছে কিনা দেখা দরকার···বের করার চেষ্টা করি, আসুন।' বলে লোকটার অপেক্ষা না করেই এগিয়ে গেল সে।

লম্বা ঘাস মাড়িয়ে গাড়িটার দিকে এগোল দুজনে।

'এঞ্জিন এখনও চালু, আগুন ধরে যেতে পারে,' সাবধান করল লোকটা। 'বোমার মত ফাটবে···'

কান দিল না কিশোর। চলার গতি বাড়িয়ে দিল আরও। ছেলেটা বেঁচে থাকলে আগুন ধরার আগেই ওকে বের করে আনতে হবে।

ঘুরেই চলেছে চাকা দুটো। নীরবতার মাঝে ওগুলোর মৃদু কিরকির শব্দ কানে আসছে। ড্রাইভারের পাশের দরজাটা খোলার জন্যে হাত বাড়াল কিশোর। হাতল ধরে টান দিল।

আটকে গেছে। এমন করে দুমড়ে গেছে বডিটা, দুই পাশের কোন দরজাই হাতল টেনে খোলা সম্ভব না। তবুও খোলার চেষ্টা চালিয়ে গেল দুজনে। ভেতরের মানুষটা মরে গেলে কিছু করার নেই, কিন্তু যদি জখম হয়েও বেঁচে থাকে?

হাল ছেড়ে দিল কৃষক। ঘামছে। হাঁপাচ্ছে। কাঁটাঝোপে লেগে ছড়ে গেছে চামড়া। 'নাহ্, দুজনে পারব না। আরও লোক ডেকে আনা দরকার। পুলিশকে ফোন করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। সে নিজেও হাঁপাচ্ছে। 'যান, আপনি ব্যবস্থা করুন। আমি আছি এখানে।'

'সরে থেকো। ফাটলে মরবে।'

'আমার কথা ভাবতে হবে না। আপনি যান জলদি।'

একটা মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরে দাঁড়াল।

আবার গাড়ির দিকে ফিরল কিশোর। কড়া রোদ লাগছে ঘাড়ে। বাতাসে পেট্রল আর ঘষা খাওয়া টায়ারের গন্ধ। পেট্রলের গন্ধ, তারমানে ট্যাংক থেকে পেট্রল বেরিয়ে যাচ্ছে। গড়িয়ে গিয়ে গরম এঞ্জিনে ছোঁয়া লাগলেই জ্বলে উঠবে। ঘটবে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। কিন্তু পরোয়া করছে না কিশোর। ছেলেটার কি অবস্থা হয়েছে, দেখতেই হবে। জানালার ভেতর দিয়ে কিছুই দেখা যায় না। সেফটি গ্লাস ভেঙে পড়েনি, কিন্তু এত বেশি ফাটল হয়েছে, মাকড়সার জালের

মত চুরচুর হয়ে গেছে। এর ভেতর দিয়ে দৃষ্টি চলে না। হঠাৎ মনে পড়ল, রাস্তায় চলার সময় জানালাটা খোলা ছিল, নইলে ছেলেটাকে দেখতে পেত না সে। বন্ধ করল কখন?

ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাল না বিশেষ। বাড়ি মেরে জানালা ভাঙার কথা ভাবল। ভাবার পর আর দেরি করল না, একটা পাথর তুলে নিয়ে বাড়ি মারতে শুরু করল কাঁচে। ভেঙে সরিয়ে দিল বেশ অনেকটা জায়গার কাঁচ। ভেতরে উঁকি দিল।

অন্ধকার। পেট্রলের তীব্র গন্ধ যেন ধাক্কা মারল এসে নাকে। অসুস্থ বোধ করতে লাগল সে। মাথা চক্কর দিয়ে উঠল। এই অবস্থার মধ্যে ভেতরে কেউ থেকে থাকলেও বাঁচবে না। কিন্তু মুখ বের করল না সে। দম বন্ধ করে গলা বাড়িয়ে লাশটা খুঁজতে লাগল, গাড়িটার মতই বাঁকাচোরা, দুমড়ানো একটা রক্তাক্ত দেহ দেখার জন্যে অধীর হয়ে আছে চোখ।

কিছুই চোখে পড়ল না। কেউ নড়ল না। ড্রাইভিং সীটে কেউ নেই। মেঝেতে নেই। ছিটকে গিয়ে পেছনের সীটেও পড়েনি। মোট কথা, কোন মানুষই নেই গাড়ির ভেতর।

জানালা থেকে মুখ সরিয়ে আনল কিশোর। 'কিছুই তো নেই!' বিড়বিড় করে আপনমনে নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'গেল কোথায়!' তাজা বাতাসে বুক ভরে দম নিয়ে আবার মুখ ঢুকিয়ে দিল জানালায়।

এবারও কাউকে দেখতে পেল না। স্পষ্ট মনে আছে ড্রাইভিং সীটে বসা ছেলেটার চেহারা। কালো কাঁচের চশমা। জানালার কাঁচ নামানো ছিল। এখন ওঠানো।

ছিটকে পড়ে যায়নি তো? পাথরে ঠোকর খেয়ে ড্রাইভিং সীটের পাশের দরজাটা হয়তো খুলে গিয়েছিল। ঝাঁকুনিতে বাইরে পড়ে গিয়েছে ছেলেটা। পরে আবার ঝাঁকুনি খেয়েই লেগে গেছে দরজা। যুক্তিটা বড় বেশি কাকতালীয় মনে হলেও একেবারে বাতিল করে দিল না। বাইরে পড়লে এতক্ষণে মরে গেছে ছেলেটা নির্ঘাত। লাশটা কোথায়? ঢালের ওপরে? নাকি আশেপাশে কোথাও? নিচে পাথরের ওপর পড়লে নিশ্চয় ভর্তা হয়ে গেছে। দৃশ্যটা কল্পনা করে গায়ে কাঁটা দিল ওর। রোদের মধ্যেও শীত শীত লাগল।

গাড়িতে মানুষ নেই। ঝুঁকি নিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আর কোন মানে হয় না। নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে সবে পাথরের ওপর বসতে গেছে এই সময় ঘটল বিস্ফোরণ। ভাগ্যিস সরে এসেছিল! বিকট, ভয়ঙ্কর শব্দ। মুহূর্তে ধাতব শরীরটাকে ঘিরে লাফিয়ে উঠল কমলা আগুন। কাঁচ আর ধাতুর টুকরো ছিটকে গেল চতুর্দিকে। পাথরের ওপরই শুয়ে পড়ল কিশোর। দেখল কমলা আগুনের ওপরে বিশাল ব্যাঙের ছাতার রূপ নিয়েছে কালো ধোঁয়া।

চিৎকার শুনে ফিরে তাকাল। পাহাড়ের মোড় ঘুরে সৈকত ধরে ছুটে আসছে কৃষক। সঙ্গে আরেকটা ছেলে। কাছে এসে কিশোরকে দেখতে পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ভাল আছ!'

'আছি,' উঠে বসল কিশোর।

হাত বাড়িয়ে দিল ছেলেটা, 'আমার নাম জ্যাক।' কৃষককে দেখিয়ে বলল, 'আমার বাবা।'

'আমি কিশোর পাশা,' জ্যাকের হাতটা ধরল কিশোর।

গাড়িটা পুড়ছে ওদিকে।

ওপরের রাস্তায় সাইরেন বাজাতে বাজাতে এসে হাজির হলো পুলিশের গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স আর দমকলের লোক। ঢালের ওপরে জড় হতে লাগল ইউনিফর্ম পরা দমকল-কর্মীরা। কাজে লেগে গেল। সাপের মত গড়িয়ে নেমে আসতে লাগল ওদের দমকলের পাইপ। রেডিও ফোন, ইস্পাতের বিরাট আঁকশির মত যন্ত্র আর শ্বাস নেবার যন্ত্র লাগানো মুখোশ হাতে নেমে এল কয়েকজন পুলিশ আর দমকল-কর্মী। গাড়িটার দিকে ছুটে গেল।

একজন পুলিশ অফিসারকে বলল কিশোর, 'গাড়িতে কেউ নেই।'

ওর দিকে ফিরে তাকাল অফিসার।

'আগুন ধরার আগেই দেখে নিয়েছি আমি গাড়ির ভেতরটা। পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে জানালা ভেঙে ফেলেছিলাম। কাউকে দেখিনি ভেতরে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকিয়ে রইল অফিসার। মাথায় গোলমাল হয়ে গেল কিনা ভাবছে। ভাবছে গাড়ির মধ্যে বিকৃত লাশটা দেখে সহ্য করতে পারেনি কিশোর। স্নায়ুতে পড়েছে প্রচণ্ড চাপ। উল্টোপাল্টা বকছে। ইঙ্গিতে কিশোরকে দেখিয়ে জ্যাককে বলল, 'অ্যাই, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে।'

ভঙ্গিটা বুঝতে পারল কিশোর। প্রতিবাদের সুরে বলল, 'আমার কিছু হয়নি তো।'

জ্যাক কি বুঝল কে জানে। কিশোরের হাত ধরে টান দিল, 'এসো।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল কিশোর, 'গাড়ি থেকে ছিটকে পড়েছে ছেলেটা। আশেপাশেই কোথাও পড়ে আছে হয়তো। মরে না গিয়ে থাকলে বিশ্রীভাবে জখম হয়েছে।'

'সেটা দেখার জন্যে তো ওরাই আছে,' পুলিশকে দেখাল জ্যাকের বাবা। 'আমাদের দায়িত্ব শেষ। চলো, চলে যাই।'

দুদিক থেকে চেপে ধরে কিশোরকে নিয়ে চলল জ্যাক আর তার বাবা।

*

আধঘণ্টা পর খামার বাড়িতে কিশোরের সাক্ষাৎকার নিতে এল সেই পুলিশ অফিসার।

কিশোরকে ওখানেই বসিয়ে রেখেছে জ্যাক আর তার বাবা। সাধ্যমত তার সেবা-শুশ্রূষা করতে চাইছে। তাতে খুশি না হয়ে বরং রেগে যাচ্ছে কিশোর।

ড্রাইভিং করছিল যে ছেলেটা তার চেহারার বর্ণনা দিল পুলিশের কাছে।

নোটবুকে লিখে নিল অফিসার–

বয়েস: উনিশ।

চুল: কালো, পেছন দিকে টেনে টেনে আঁচড়ানো।

পরনে ছিল: সাদা শার্ট, কালো চশমা।

'হুঁ,' মাথা ঝাঁকাল পুলিশ অফিসার। 'ভেতরে লাশটা এমনভাবে পুড়েছে, কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিশেষজ্ঞ এনে খোঁজাতে হবে...যাই হোক, নম্বর প্লেটটা কোনমতে পড়া গেছে। রেজিস্ট্রেশন অফিসে খোঁজ নিয়ে এখন মালিকের নাম-ঠিকানা জানতে হবে।...বলো তো, কি ঘটেছিল?'

'ভীষণ জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল সে,' কিশোর বলল।

মাথা ঝাঁকাল অফিসার, 'তা তো চালাবেই। এ বয়েসের ছেলে, এ রকম শক্তিশালী গাড়ি পেলে কি আর আস্তে চালায়। পড়ল কি করে?'

কিভাবে কি ঘটেছে, খুলে বলল কিশোর। বলার পর বলল, 'লাশটা কিন্তু সত্যি ছিল না গাড়ির মধ্যে...'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে অফিসার বলল, 'সেটা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। কোন সম্ভাবনাই বাদ দেব না আমরা।'

দুই

সন্ধ্যার কাগজে ছাপা হলো খবরটা।

'রকি বীচ নিউজ' পত্রিকার একজন রিপোর্টার কিশোরের সাক্ষাৎকার নিতে চেয়ে ফোন করল।

ফোনটা ধরলেন মেরিচাচী। সাফ মানা করে দিলেন, 'না, এখন কথা বলতে পারবে না ও। অসুস্থ। সকালের ধাক্কাই সামলাতে পারেনি।'

রিপোর্টারকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ফোন রেখে দিলেন।

বসে বসে কাগজ পড়ছিল কিশোর। মুখ তুলে বলল, 'মানা করলে কেন? এলে আসত, যা যা দেখেছি বলে দিতাম।'

'দরকার নেই। কি লিখতে কি লিখে দেবে...পুলিশ তো বলাই শুরু করেছে তোকে পাগল...বাদ দে ওসব পত্রিকা-ফত্রিকা...তোর শরীর সত্যি ভাল না।'

'ও, তারমানে তোমারও বিশ্বাস...এ জন্যেই সকাল থেকে নজরবন্দী করে রেখেছ।...পুলিশ এসে কি বলে গেল, আর...'

'শুধু পুলিশের কথায় কি আর সাবধান হই? একবার তো সত্যি সত্যি তোর মাথা খারাপ হয়েছিল...'

'ওই একবার নিয়েই পড়ে থাকো,' ফোনের দিকে হাত বাড়াল কিশোর। 'দেখি, দাও ফোনটা।'

'কাকে করবি? রিপোর্টারকে?' ভুরু কুঁচকে ফেললেন চাচী। 'ওদের করতে যাসনে...'

'মুসা আর রবিনকে।'

ভুরু আবার স্বাভাবিক হলো মেরিচাচীর। টেবিলের ওপর দিয়ে ঠেলে দিলেন যন্ত্রটা।

*

মুসার এক মিনিট পরেই এল রবিন। তিন গোয়েন্দার ওঅর্কশপে ঢুকল।

ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে কিশোর।

টেলিভিশন দেখে খবরটা আগেই জেনেছে রবিন। মুসাকেও জানাল।

ট্রে'তে করে গরম গরম কেক আর চকলেট ড্রিংক দিয়ে গেলেন মেরিচাচী। রবিন আর মুসাকে বললেন, 'ওকে বেশি কথা বলাবে না। ওর শরীর খারাপ।'

চাচী চলে যেতেই ভুরু নাচাল রবিন, 'ঘটনাটা কি?'

'চাচীর ধারণা, আবার উল্টোপাল্টা দেখা শুরু করেছি আমি,' কিশোর বলল। 'পুলিশ বলে গেল চাচীকে। চাচীও বিশ্বাস করল।'

এক টুকরো কেক তুলে নিল মুসা। 'উল্টোপাল্টা দেখছ মানে?'

'গাড়িটা যখন চলছিল, তখন দেখেছি ড্রাইভিং সীটে বসে আছে একটা ছেলে...পড়ার পর দেখলাম, নেই। বেমালুম গায়েব। ভেতরে তখন কোন মানুষই ছিল না। বলেছি পুলিশকে। বিশ্বাস করল না। ভাবল, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'গায়েব-মানে?' মুখে কেকের টুকরো নিয়েই হাঁ করে আছে মুসা।

'গাড়িটা নিচে পড়ার পর জানালা ভেঙে ভেতরে দেখেছি আমি। জানালা বন্ধ ছিল, দরজা বন্ধ ছিল, অথচ ভেতরে লাশটাশ দেখিনি। কোন মানুষই ছিল না। গেল কোথায় লোকটা? আরও একটা ব্যাপার, চলন্ত অবস্থায় ড্রাইভারের পাশের জানালাটা খোলা ছিল, পড়ার পর দেখি বন্ধ।'

'খাইছে! ভূতের কারবার। পাইরেট'স হিল তো? ওখানে ভূতের উপদ্রব আছে বহুকাল থেকেই।'

'থাক, পুলিশের সামনে গিয়ে আর বোলো না এ কথা। তাহলে তোমাকেও পাগল ভাববে,' হাত বাড়িয়ে গ্লাস তুলে নিল কিশোর।

'মনে হচ্ছে রহস্য একটা পেয়ে গেলাম,' রবিন বলল। 'কাজটাজ তো কিছু নেই হাতে। চলো, কাল গিয়ে জায়গাটা একবার দেখে আসি। কোন সূত্র পাওয়া যায় কিনা।'

'কি দেখবে? গাড়ির মধ্যে লাশের চিহ্ন খুঁজবে?' মুসার প্রশ্ন।

'নাহ্,' জবাব দিল কিশোর। 'গাড়িটা কি আর এতক্ষণ আছে নাকি ওখানে? ওটার পোড়া কঙ্কালই নিশ্চয় তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ।'

'কি খুঁজবে তাহলে?'

'দেখব সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে কিনা। দেয়ালের ভাঙা জায়গাটা দেখব, ঢাল দেখব, গাড়িটা যেখানে পড়েছে সেখানটা দেখব। তা ছাড়া...'

'তা ছাড়া কি?'

'নাহ্, থাক। পরে বলব। আরেকটু ভেবে নিই।'

একটু চুপ থাকার পর মুসা বলল, 'গাড়িটা তাহলে গেল, না?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'দাম জানো কত ওটার? আন্দাজ করতে পারো?' ভুরু নাচাল রবিন।

ওর দিকে তাকাল মুসা। 'কেন খুব দামী নাকি?'
'খবরটা টেলিভিশনে শোনার পর বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।'
'কত বললেন?'
'চমকে যাবে। পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার!'
সত্যি চমকে গেল মুসা আর কিশোর। দাম শুনে ভুরু উঁচু হয়ে গেল কিশোরের। মুসা হাঁ। ঢোক গিলে বলল সে, 'এত্ত দাম!'
'তাহলেই বোঝো।' কিশোরের দিকে তাকাল রবিন। 'দাম শোনার পর থেকে আমি একটা কথা ভাবছি।'
'কি?'
'গাড়িটা ইচ্ছে করে নষ্ট করেনি তো?'
'বীমার টাকার জন্যে?'
রবিন জবাব দেয়ার আগেই দরজার কাছ থেকে বলে উঠল একটা কণ্ঠ, 'কি ব্যাপার, রহস্য পেয়ে গেছ নাকি?'
আলোচনায় এতই মগ্ন ছিল তিনজনে, দরজার দিকে নজর ছিল না। ফিরে তাকিয়ে দেখল ডন দাঁড়িয়ে আছে।
ডন মেরিচাচীর বোনের ছেলে। ওর বাবা আইব্রাম হেনরি স্টোকার অনেক বড় বিজ্ঞানী।
অ্যারিজোনায় থাকে ডনরা।
ওর বয়েস অল্প। মাত্র আট। বয়েসের তুলনায় ব্যাপক পড়াশোনা ছেলেটার। বুদ্ধিও আছে। আর আছে কথার হুল।
কিশোর বলল, 'আরি, ডন, তুমি কখন এলে?'
'এই তো, মিনিট পাঁচেক আগে। ব্যাগটা রেখেই মেরিখালার কাছে শুনলাম, তোমরা এখানে আড্ডা মারছ। দেখা করতে চলে এলাম।'
'ভাল করেছ। তা সেবারের মত একাই এলে নাকি?'
'হ্যাঁ। এত সুন্দর বাস থাকতে সঙ্গী নিতে যাব কোন্ দুঃখে? তা ছাড়া পাবই বা কোথায়?'
'তা বটে।'
'তো, কিসের তদন্ত করছ? পত্রিকায় দেখলাম একটা গাড়ি থেকে নাকি দিনে-দুপুরে ড্রাইভার গায়েব। তার ব্যাপার নাকি?'
'ও, পড়া হয়ে গেছে খবরটা!...হ্যাঁ, ওর কথাই বলছি। যাও, হাতমুখ ধোওগে। চাচীকে নাস্তা দিতে বলো। ভাল কেক বানিয়েছে। আমাদের এখানে শেষ,' শূন্য ট্রে-টা দেখাল কিশোর।

তিন

'বুঝলে মা, অ্যাক্সিডেন্টটা মোটেও অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না! সাজানো ঘটনা!'

পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে মা'কে বলল রবিন। 'বীমার টাকার জন্যে এ কাজ করেছে ছেলেটা।'

কর্নফ্লেকের প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াল সে। দৌড়ে আসায় খিদেটা বেড়েছে। সকালবেলা ইদানীং রোজই ব্যায়াম করতে বেরোয়।

একটা চটের বস্তায় প্লাস্টিকের খালি বোতল, মলাটের বাক্স আর অন্যান্য আবর্জনা ভরছেন মিসেস মিলফোর্ড। কাজের জন্যে ঘর পরিষ্কার করছেন। 'এই বয়েসেই এত চালাক! কি যে হচ্ছে আজকালকার ছেলেমেয়েগুলো...'

'বয়েস কম দেখলে কোথায়? উনিশ।'

বস্তার মুখ বাঁধতে মাকে সাহায্য করল রবিন।

'ওসব সাধারণ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাসনে। যা ভাবছিস, রহস্য, পাবি না।'

মা'র এখন কাজের সময়। বাড়িতেই একটা নার্সারি চালু করেছেন। তাতে বাচ্চাদের হাতেখড়ি দেয়া থেকে শুরু করে ছবি আঁকা, কাগজ আর মলাটের বাক্স দিয়ে খেলনা বানানো, সবই শেখানো হয়।

গেটে কথা শোনা গেল। আসতে শুরু করেছে বাচ্চারা। কয়েক মিনিটের মধ্যে বারোজন ছেলেমেয়ে এসে হাজির। সবারই বয়েস পাঁচ বছরের নিচে।

'সাধারণ ব্যাপার!' মা'র কথার মানে বুঝতে পারল না রবিন।

'হ্যাঁ। একটু আগে টেলিভিশনের খবর শুনলাম। কাল রাতে ফিরে এসেছে ছেলেটা। শহরের রাস্তায় ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশ দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে বাড়িতে দিয়ে এসেছে।'

'ঘোরাঘুরি করছিল মানে?'

'স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে ওর। কোন কথা মনে করতে পারছে না। ডাক্তারের ধারণা, গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে মাথায় বাড়ি খেয়েছিল। তাতে মগজে চোট লেগেছে। বাড়িতে আছে এখন। শরীর সুস্থই আছে। সুতরাং তোদের রহস্য খুঁজতে যাওয়ার আশা বাদ।' হাত নেড়ে ব্যাপারটাকে যেন উড়িয়ে দিয়ে বস্তা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মিসেস মিলফোর্ড।

'ও কিছুই বলেনি? নামটা কি ওর?' পেছন থেকে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল রবিন। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। শুনতে পাননি মা। সুইং ডোরটা কেবল হাত নাড়ার মত করে এ পাশ ওপাশ নড়ে নড়ে যেন বলতে লাগল, 'না-না, না-না!'

★

'বাবা, এখনও কি বীমা কোম্পানি গাড়ির টাকা শোধ করবে?' জিজ্ঞেস করল মুসা। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টোস্ট চিবাচ্ছে।

বাবার সঙ্গে বসে সকালের টিভি নিউজটা শুনেছে সে, দৌড়াতে গিয়েছিল বলে রবিন সেটা শুনতে পায়নি।

'কোন্ গাড়ি?' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে বললেন মিস্টার আমান। একটা ক্যামেরা খুলে পরিষ্কার করছেন।

'এই তো, এক্ষুণি যে বলল। অনিক ম্যাকডোনাল্ডের গাড়ি...'

'ও, অ্যাক্সিডেন্ট করেছে যে ছেলেটা। অ্যামনেশিয়া হয়েছে, কিছু মনে করতে পারে না···হুঁ! ফিল্ম আটকে গেছে। তাই তো বলি···'

'এই বাবা, তোমাকে কি জিজ্ঞেস করলাম? বীমার টাকাটা কি পাবে এখনও?'

'পাবে,' এক কথায় সেরে দিলেন মিস্টার আমান।

'কেন পাবে? প্রশ্ন তুলবে না বীমা কোম্পানি? গাড়িটাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে বীমার টাকা দাবি করা···যে কেউ করতে পারে এ নাটক। স্রেফ জালিয়াতি।'

'জালিয়াতি নয়, ঠগবাজি,' মিস্টার আমানের নজর ক্যামেরার দিকে।

'ঠগবাজি হোক আর যা-ই হোক, টাকা পাবে কেন?'

'নিয়ম আছে, তাই।'

বুঝল বাবার সঙ্গে কথা বলে এখন লাভ হবে না। আলোচনা বাদ দিয়ে খাওয়ায় মন দিল মুসা।

★

কিশোর তর্ক করছে ওদিকে মেরিচাচীর সঙ্গে। চাচা থাকলে তার সঙ্গেই করত। কিন্তু তিনি ভোরে উঠেই বোরিস আর রোভারকে নিয়ে পুরানো মাল কিনতে চলে গেছেন।

'বোকার মত কথা বলিসনে তো, কিশোর,' কফির কাপে চুমুক দিয়ে জোরে নিঃশ্বাস ফেললেন মেরিচাচী। 'এত সুন্দর একটা গাড়ি ইচ্ছে করে নষ্ট করতে যাবে কেন?'

'টাকার জন্যে, তা ছাড়া আর কি?' সকালের কাগজেও বেরিয়েছে খবরটা। গতরাতে ফিরে এসেছে অনিক ম্যাকডোনাল্ড। স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে ওর, অ্যামনেশিয়া হয়েছে। কোন কথা মনে করতে পারে না। পত্রিকায় প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটা ছবিও ছেপেছে।

কাপটা ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন মেরিচাচী। 'আমি বাজারে যাচ্ছি।' ঘড়ি দেখলেন. 'কন্ট্রাকটর আসছে না কেন এখনও? এলে দেখিয়ে দিস কোন্ জায়গাটা মাপতে হবে।'

কিশোরদের বাড়িটার একপাশ ভেঙে আরও বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সেটা নিয়ে মাথা ঘামাল না সে। শুধু বলল, 'আচ্ছা।' পত্রিকাটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'শোনো,' চাচীকে বলার ছুতোয় যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, 'ও অ্যাক্সিডেন্টটা করেছে একটা নির্জন রাস্তায়। নির্জন জায়গা, বুঝো। কেন? কিভাবে করল? কেউ জানে না। স্রেফ গায়েব হয়ে গেল। কোথায়? তা-ও কেউ জানে না। ফিরে এসে এমন ভঙ্গি দেখাচ্ছে তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। মজার ব্যাপার হলো, এখনও টাকাটা ক্লেইম করতে পারবে সে। পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার!'

জ্যাকেট গায়ে দিলেন চাচী। টেনেটুনে ঠিক করলেন স্কার্টের নিচের অংশটা। 'তোর চাচা যদি ফোন করে, বলবি, আমি বাজারে গেছি। আর কন্ট্রাকটারের কথা যা বলে গেলাম শুনলিই তো।'

'হুঁ।'

মেরিচাচী বেরিয়ে গেলেন। পত্রিকার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল কিশোর।

'খবরটা আজকেও ছেপেছে, তাই না?' দরজা দিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল ডন। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে। মুখ-হাত ধুয়ে ওপরতলা থেকে নেমে এসেছে নাস্তা করার জন্যে।

জবাব দিল না কিশোর। তাকিয়ে আছে কালো চশমা পরা ছেলেটার ছবির দিকে–অনিক ম্যাকডোনাল্ড। মাথায় বাড়ি লেগে মগজে চোট খেলে মানুষের স্মৃতিশক্তি নষ্ট হতেই পারে, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু এই বিশেষ ক্ষেত্রটিতে কেন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে না। কোথাও একটা গোলমাল অবশ্যই রয়েছে।

পেছনে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল সে। টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল। মুসা আর রবিনকে ফোন করবে।

★

বেলা এগারোটায় স্যালভিজ ইয়ার্ডের জঞ্জালের নিচে তিন গোয়েন্দার হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসল ওরা।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে,' আনমনে নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর, 'ছেলেটা যেহেতু ফিরে এসেছে, আর কোন রহস্য নেই।'

'মানে!' কিশোরের কথা বুঝতে পারল না রবিন।

'আপাতদৃষ্টিতে তাই কি মনে হয় না? আর কোন রহস্য নেই? সবাইকে আসলে ধোঁকা দিতে চাচ্ছে।'

'আমার তো মনে হচ্ছে রহস্যটা আরও ঘনীভূত হচ্ছে।'

'আসলেও কিন্তু তাই।'

'আসল লোকটাই ফিরে এসেছে তো?' মুসা বলল।

'কোন সন্দেহই নেই তাতে,' কিশোর বলল। 'অন্য কেউ হলে পরিবারের লোকেরা কি তাকে গ্রহণ করত?'

'হুঁ! পাইরেট'স হিলের কোন্ জায়গাটায় পড়েছে, বলো তো? মোড়টা কি খুব খারাপ?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'না, তেমন খারাপ আর কোথায়? একটু সাবধান থাকলেই পড়ত না। ওশনসাইড ফার্মটা আছে না, ওখানে। মোড় থেকে সামান্য সামনে গিয়ে পড়েছে, পাথরের খনিগুলোর কাছে।'

'চোখে রোদ লেগেছিল হয়তো।'

মাথা নাড়ল কিশোর। 'উঁহু। সূর্য পেছনে ছিল তখন।'

'এখানে বসে কিছু বুঝব না,' রবিন বলল। 'চলো, ঘুরে দেখে আসি।'

'চলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'ওশনসাইড ফাঁড়িতেও একবার যাওয়া দরকার। দেখি, ওখানকার পুলিশ কি ভাবছে।'

'কথা বলবে ওরা তোমার সঙ্গে?'

'বলবে। আমি ওদের আই উইটনেস–গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট করতে

দেখেছি। বীমা কোম্পানিকে ঠকানোর ধারণাটা ওদের মাথায় ঢোকানোর চেষ্টা করব।'

চার

বিরক্ত হয়ে কম্পিউটারের মনিটরের দিক থেকে চোখ ফেরাল ডিউটিরত পুলিশম্যান। রিপোর্ট টাইপ করছে। 'কি চাই?'

'আমি কিশোর পাশা,' উজ্জ্বল একটা হাসি উপহার দিল সে।

কাজ হলো না তাতে। মুখটা আগের মতই গম্ভীর রেখে টাইপ করে চলল লোকটা।

'অনিক ম্যাকডোনাল্ডের কেসের আমি আই উইটনেস।'

জবাব নেই। শুধু কী-বোর্ডে দ্রুত আঙুল চালনার খটাখট শব্দ।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার বলল কিশোর, 'আপনি নিশ্চয় জানেন, কেসটার তদন্ত চলছে এখন।'

হাসিটা বাড়াল সে। সেটার জোর বাড়ানোর জন্যেই যেন মুসা আর রবিনও হাসল।

দায়সারা ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল লোকটা। 'কেসটা ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে,' এমন করে হাত নাড়ল, যেন মাছি তাড়াতে চাইছে।

'ক্লোজ! তারমানে তদন্ত করা হচ্ছে না আর? তা কি করে হয়?'

'তা-ই হয়েছে।'

'কেন?'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল পুলিশম্যান। কী-বোর্ডে থেমে গেল আঙুল। 'কেন, শোনোনি, কাল রাতে ছেলেটা বাড়ি ফিরে গেছে? অ্যাক্সিডেন্টে কারও কোন ক্ষতি হয়নি, কোন মানুষ মারা যায়নি, সন্দেহজনক কিছু নেই। সুতরাং কেস ক্লোজ করা ছাড়া উপায় কি? কিসের তদন্ত করবে?'

'কেন, বেপরোয়া ড্রাইভিং? রাস্তার পাশের দেয়াল ভেঙে ফেলা...'

'কোন সাক্ষী নেই।'

'আছে। আমি। নিজের চোখে দেয়ালটা ভাঙতে দেখেছি।' রেগে যাচ্ছে কিশোর। গলা চড়ছে।

অস্বস্তি বোধ করছে রবিন। শার্টের কোণা টানছে।

'তুমি বাদে মাথা সুস্থ আছে এমন কোন সাক্ষী পাওয়া যায়নি, তাই কেসটা খোলা রাখারও কোন মানে নেই।'

'মাথা সুস্থ আছে' বলে কি বোঝাতে চেয়েছে পুলিশম্যান, বুঝতে পেরে রাগটা আরও বাড়ল কিশোরের। ওর মাথা খারাপ, উল্টোপাল্টা দেখে, অতএব আই উইটনেস হিসেবে সে নির্ভরযোগ্য নয়, এটাই বোঝাল।

কম্পিউটারের সুইচ অফ করে দিল পুলিশম্যান। কাঁচের দরজা ঠেলে

অন্যপাশে চলে গেল। টেবিলে রাখা কাগজপত্র, ফাইল গোছানোর ভান করল। কয়েকবার করে ফিরে তাকাল। দেখল ওরা গেছে কিনা। যখন দেখল যাচ্ছে না, ফিরে এল আবার।

'শোনো, অনিক ম্যাকডোনাল্ডের কেসটা এখন ডাক্তারদের হাতে। ডাক্তার বলেছেন, তার স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে গেছে। আঘাতজনিত কারণে ট্রমা–এ ধরনের কি কি সব খটমটে শব্দ লিখে দিয়েছেন রিপোর্টে। দুর্ঘটনায় অন্য কেউ আঘাত পায়নি, কোন সম্পত্তি নষ্ট হয়নি–ওই দেয়ালটা ছাড়া...' কিশোরের দিকে তাকিয়ে হাসল পুলিশম্যান। 'সুতরাং ভুলে যাও কেসটার কথা।'

ভুলে যাবে! এত সহজে! কিশোর পাশাকে চিনতে তখনও বাকি আছে তার। 'দেখুন, আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আরও কিছু আছে কেসটাতে।'

কঠোর হয়ে উঠল পুলিশম্যানের দৃষ্টি। রবিনের শার্টের কোণা টানা বেড়ে গেল। মুসা চুপ। কিশোরের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে দুজনে।

পুলিশের কড়া দৃষ্টি দমাতে পারল না কিশোরকে। 'দেখুন, গাড়িটা ইচ্ছে করে ফেলে দিয়েছে সে, বীমার টাকার জন্যে। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা! সব সাজানো : দুর্ঘটনা, স্মৃতিশক্তি হারানোর অভিনয়–সব। ও একটা ঠগ।'

ধৈর্য হারাল পুলিশম্যান। মোটা বাহু দুটো বুকের ওপর আড়াআড়ি রেখে দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। কিশোরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'শার্লক হোমস, তাই না?'

'আপনার যা ইচ্ছে বলতে পারেন। কিন্তু কথাটা ঠিক। ও একটা ঠগ।'

ওদের কথা কাটাকাটি শুনেই বোধহয় একপাশের দরজা খুলে বেরিয়ে এল একজন পুলিশ অফিসার। কিশোরকে দেখে দাঁড়িয়ে গেল। সেই লোকটা, দুর্ঘটনার দিন যার সঙ্গে কথা বলেছিল কিশোর। 'হাল্লো,' হাসল সে। 'এসো।'

মুসা আর রবিনের দিকে তাকাল কিশোর। অফিসারের দিকে তাকিয়ে ইতস্তত করল।

'ঠিক আছে, ওরাও আসুক।'

অফিসারের পেছন পেছন তার অফিসে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। কিশোর যা যা বলল, সব লিখে নিল অফিসার। সারাক্ষণ হাসি লেগে রইল মুখে। লেখা শেষ করে মুখ তুলে তাকাল, তখনও মুখে হাসি। 'গাড়িটা কে চালাচ্ছিল, জানো তুমি?'

'জানি। অনিক ম্যাকডোনাল্ড,' জবাব দিতে এই প্রথম দ্বিধা করল কিশোর। কি বলতে চাইছে অফিসার?

'শুধু অনিক নয়, ম্যাকডোনাল্ড ফ্যামিলির অনিক।' 'ম্যাকডোনাল্ড ফ্যামিলি' কথাটার ওপর জোর দিল অফিসার।

'ম্যাকডোনাল্ড ফ্যামিলি মানে?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ভুরু নাচাল কিশোর।

ঘামতে শুরু করেছে রবিন। মুসাও অস্বস্তি বোধ করছে।

অফিসারের হাসিটা আরও বাড়ল। ছড়িয়ে গেল সারা মুখে। 'ও, তুমি জানো না। ওশনসাইডের ম্যাকডোনাল্ডরা আর যা-ই করুক, গাড়ি দুর্ঘটনার নাটক করে বীমার টাকা আদায় করতে যাবে না কোনদিন। প্রয়োজনই পড়বে

না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল অফিসার। তারপর হাসিমুখে জানতে চাইল, আগের দিনের আঘাতটা সামলে নিয়েছে কিনা কিশোর। জবাবের অপেক্ষা না করে বলল, 'আমি জানি, ওরকম একটা অ্যাক্সিডেন্ট চোখের সামনে ঘটতে দেখলে যে কারও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে।'

রাগ লাগল কিশোরের। এই লোকটা এখনও পাগল ভাবছে তাকে। গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমার মাথা ঠিকই আছে।'

'তোমার সেটা মনে হচ্ছে বটে,' ছড়িয়ে পড়া হাসিটা এখন স্থির হয়ে আছে অফিসারের মুখে, 'তবে ডাক্তারের কাছে গেলে অন্য কথা শুনতে হতে পারে। শিওর হয়ে নেয়া উচিত তোমার। ঠিকমত চিকিৎসা আর প্রচুর বিশ্রাম নিলে এ সব সমস্যা থাকে না, সেরে যায়।'

গা জ্বলে গেল কিশোরের। একটা সেকেন্ড আর বসতে ইচ্ছে করল না। উঠে দাঁড়াল। বেরিয়ে এল। পেছনে রবিন আর মুসা। ডেস্কে বসে থাকা পুলিশম্যানের দিকে তাকাল না। সোজা এগোল দরজার দিকে।

বাইরে বেরিয়েই বলে উঠল মুসা, 'এই ম্যাকডোনাল্ড লোকটা কে?'

'ম্যাকডোনাল্ডের নাম বলতে গিয়ে অত গদগদ হয়ে গেল কেন অফিসার?' রবিনেরও প্রশ্ন।

ভারী দম নিল কিশোর, রাগ তাড়ানোর চেষ্টা করছে। 'জানি না!'

'একটা ব্যাপার পরিষ্কার,' মুসা বলল, 'ম্যাকডোনাল্ডরা এখানে প্রভাবশালী। টাকা আছে।'

'তারমানে ক্ষমতাও আছে,' রবিন বলল।

'সুতরাং আমাদের কথা এখানে কেউ বিশ্বাস করবে না,' কিশোর বলল। 'আর আমাকে তো পাগলই ভাবছে। তবে আমিও ছাড়ব না। অনিক ম্যাকডোনাল্ড যত বড় বাপের বেটাই হোক, ওর শয়তানি ফাঁস করে না দিয়েছি তো আমার নাম কিশোর পাশা নয়।'

'কি করে করবে?' জানতে চাইল রবিন।

'তদন্ত করে,' আবার ভারী দম টানল কিশোর। 'এখন প্রথমেই জানতে হবে আমাদের, এই অনিক ম্যাকডোনাল্ডটি কে? তারপর জানব, পত্রিকাওয়ালারা কেন শুধু তার নামটা উল্লেখ করেই ছেড়ে দিয়েছে, আর কোন পরিচয় দেয়নি কেন? পুলিশ যে রকম করে বলল, তাতে তো বোঝা যাচ্ছে সে কোনও বিখ্যাত বাপের ছেলে। সেই কথাটা কেন এড়িয়ে গেল পত্রিকার প্রতিবেদক?'

'কাগজের কথা বাবাই ভাল বলতে পারবে,' বলে উঠল রবিন। 'চলো, তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করি।'

জ্বলজ্বল করে উঠল কিশোরের চোখ, 'ঠিক! পাওয়া যাবে এখন বাড়িতে?'

'আসার সময় তো দেখে এলাম, আছে। চলো, গিয়ে দেখা যাক।'

পাঁচ

ওরা ঢুকতে আর কয়েক সেকেন্ড দেরি করলেই বেরিয়ে যেতেন মিস্টার মিলফোর্ড। গেটের কাছে চলে এসেছে তাঁর গাড়ি। পথ জুড়ে দাঁড়াল তিন গোয়েন্দা। সবার আগে কিশোর। হাত তুলে চিৎকার করে বলল, 'আঙ্কেল, এক মিনিট।'

গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভিং সীটের পাশের জানালা দিয়ে মুখ বের করলেন তিনি, 'কি ব্যাপার?'

'একটা জরুরী কথা ছিল...'

'তাড়া আছে। দুই মিনিট সময় দিলাম। জলদি শেষ করো।'

'দুই মিনিটেই হয়ে যাবে। কিছু তথ্য জানা দরকার। কাল যে ছেলেটা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছিল, সেই অনিক ম্যাকডোনাল্ডটি কে বলতে পারেন?'

মুচকি হাসলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'তদন্ত তাহলে শুরু করে দিয়েছ? ভাল।...অনিক ম্যাকডোনাল্ড হলো রস ম্যাকডোনাল্ডের একমাত্র ছেলে। স্ত্রী গত হয়েছেন, তারপর আর বিয়ে করেননি। একমাত্র ছেলেকে নিয়ে ওশনসাইডের বাড়িতে থাকেন।'

'ধনী?'

'বিরাট ধনী,' হাসছেন মিস্টার মিলফোর্ড।

'কতটা বিরাট?'

'ওশনসাইড তো বটেই, লস অ্যাঞ্জেলেসের সেরা ধনীদের একজন রস ম্যাকডোনাল্ড। সাতটা বড় বড় দৈনিক আর সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক। হলিউডে সবচেয়ে অভিজাত পাড়ায় অনেক বড় বাড়ি আছে। একটা ইয়ট আছে। ওশনসাইডে পাহাড়ের ওপর বিশাল প্রাসাদ আছে। বাস করেন ওই বাড়িটাতে। আরও অনেক সম্পত্তি আছে। সেগুলোর ফিরিস্তি দেয়ার নিশ্চয় প্রয়োজন নেই।'

'এত্ত টাকার মালিক!'

'হ্যাঁ, এত টাকার মালিক। ওশনসাইডে যে প্রাসাদটা আছে, ম্যাকডোনাল্ড ম্যানর, ওররুম একটা বাড়ি থাকলেই যথেষ্ট। রাজা-রাজড়াদেরই থাকে।'

'ম্যানর? তারমানে পুরানো ধাঁচের বাড়ি?'

'হ্যাঁ। মধ্যযুগীয় স্টাইলের। সতেরোশো শতকে তৈরি। বিশাল এলাকা জুড়ে। বড় বড় জানালা। বিরাট বাগান। না দেখলে বুঝবে না।'

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা।

ঘড়ি দেখলেন মিস্টার মিলফোর্ড। 'দুই মিনিট হয়ে গেছে। চলি।'

তাঁর গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসা বলল, 'চলো, এখনই দেখে আসিগে ম্যাকডোনাল্ড ম্যানর।'

★

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠে গেছে পথ। আকাশের পটভূমিতে প্রায় দুর্গের মত লাগছে ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরকে। পাথরে তৈরি সিংহদরজার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। পাথরের বড় বড় দুটো সিংহ বসে আছে দুই পাশে। লম্বা গাড়িপথ চলে গেছে গেটের কাছ থেকে। দু'ধারে ল্যাভিন্ডার গাছের ঝোপ। শেষ হয়েছে গিয়ে চওড়া গাড়িবারান্দায়। ড্রাইভওয়েতে বড় বড় গাড়ি। পাথরে খোদাই নানা রকম মূর্তি আর খোপ খোপ করা দেয়াল জুড়ে জন্মেছে আইভি লতা। সামনের বাগানটা এত বড়, ঘোড়দৌড়ের মাঠ বানানো যাবে।

'বাপরে! এ তো সাংঘাতিক ধনীর ধনী!' মুসা বলল। 'ঢুকে দেখা যায় না?'

'ও কথা মুখেও এনো না,' হাত তুলে বলল রবিন। 'ওই দেখো।'

কিশোর আর মুসাও দেখল, গেটের ভেতরে একপাশে লাল-সাদা গোলাপ ঝাড়ের ধারে শুয়ে আছে দুটো বিশালদেহী গ্রেট ডেন কুকুর।

'বড় শান্তির জায়গা,' বিড়বিড় করে বলল কিশোর।

'সে তো বটেই,' রবিন বলল।

'কেন অনিক ম্যাকডোনাল্ডের কথা বিশ্বাস করেছে পুলিশ, এখন বুঝতে পারছি,' মুসা বলল।

'ঠিকই,' একমত হলো কিশোর, 'এ সবের মালিক যারা, তাদের কেউ বীমার টাকা আদায় করার জন্যে গাড়ি ভাঙবে, কে বিশ্বাস করবে এ কথা?'

কাঁচি দিয়ে পাতা কাটার খচ্ খচ্ আওয়াজ শোনা গেল। সুড়ুৎ করে গেটের সামনে থেকে পাশে সরে গেল তিন গোয়েন্দা। কিন্তু দেরি করে ফেলেছে। ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসা মালী দেখে ফেলেছে ওদের। সরে যেতে দেখে বোধহয় সন্দেহ হলো, এগিয়ে এল আরও। গলা বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঘাপটি মেরে আছ কেন?'

জেগে গেল কুকুর দুটো। চোখের পলকে লাফ দিয়ে উঠে ছুটে এল গেটের কাছে। ঘেউ ঘেউ শুরু করল। যেমন শরীর, তেমনি কণ্ঠ। বিকট শব্দ।

একটা মুহূর্তও আর থাকার সাহস পেল না ওখানে গোয়েন্দারা। কুকুর দুটোকে বের করে দেয়ার আগেই ঢাল বেয়ে দিল দৌড়।

★

সেদিনই কিছুক্ষণ পর আবার সাইকেল নিয়ে বেরোল ওরা। রওনা হলো ওশনসাইডে। এবার আর ম্যানরে নয়, গাড়িটা যেখানে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে সেখানে যাবে। সূত্র পাওয়া যায় কিনা দেখতে।

রকি বীচ শহর থেকে বেরিয়ে সাগরের কিনারের রাস্তা ধরল ওরা। কিছুদূর এগোতেই রাস্তাটা ক্রমশ উঠে যেতে লাগল ওপর দিকে। সাইকেল চালাতে পরিশ্রম হয়।

আগে আগে চলেছে কিশোর। দুই পাশে চলে এল মুসা আর রবিন।

'দারুণ জায়গা!' রাস্তার পাশে পাহাড়ের নিচে তাকিয়ে বলল মুসা। 'খুব

সুন্দর। এ দিকটায় আসতে এ জন্যেই আমার ভাল লাগে।'

'আমারও,' কিশোর বলল।

'এখন বলো দেখি, তোমার প্ল্যানটা কি?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কি করতে চাও?'

'জায়গামত যাই চলো আগে, তারপর বলছি।'

আরও কিছুটা ওপরে উঠতে খাড়াই কমে গিয়ে অনেকটা সমতল হয়ে এল পথ। সাইকেল চালানো সহজ হলো। পাহাড়ের শৈলশিরা ধরে এগিয়ে যাওয়া রাস্তা ধরে ছুটে চলল দ্রুত।

এক জায়গায় এসে গতি কমাল কিশোর। দেখাল, 'এই যে এখানে সাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগতে যাচ্ছিল গাড়িটার।' যে ঝোপটার ওপর পড়ে গিয়েছিল সে, সেটা দেখে ব্রেক কষল। 'দাঁড়াও। কিছু মাপজোক আছে।'

'কিসের মাপজোক?' ভুরু ওপরে উঠে গেল মুসার।

তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'তোমাকে যা যা আনতে বলেছিলাম, এনেছ?'

পকেট থেকে ক্যালকুলেটর টেনে বের করল রবিন। 'হ্যাঁ। কি করব...'

'এখান থেকে সাইকেল চালিয়ে আমি দেয়ালের ভাঙা ফোকরটার কাছে যাচ্ছি। আমার পেছন পেছন আসবে তোমরা। ঘড়ির দিকে চোখ রাখবে। দেখবে, কতক্ষণ সময় লাগে আমার যেতে।'

মাথা ঝাঁকাল মুসা, 'তাতে কি হবে?'

এবারও প্রশ্নের জবাব না দিয়ে রবিনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রবিন পেডোমিটার লাগিয়ে নাও।'

'কি মিটার?' চোখ মিটমিট করল মুসা।

'ব্যায়াম করো, পেডোমিটার চেনো না? যন্ত্রটা পায়ে বেঁধে নিতে হয়। দৌড়ে কিংবা হেঁটে গেলে তখন মিটার দেখে বুঝতে পারবে কতখানি এগোলে।'

'সত্যি! চাকা না গড়ালে মিটারটা রীডিং দেবে কি করে?'

'দেয়। এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রের যুগে এর চেয়ে কত কঠিন কঠিন কাজ করে ফেলছে যন্ত্র...'

মোটর সাইকেলের মাইল-মিটারের মত দেখতে, তার চেয়ে ছোট একটা যন্ত্র আরেক পকেট থেকে বের করল রবিন। 'হেঁটে গেলাম। তারপর? আসলে কি করতে চাইছ তুমি?'

'দেখতেই পাবে। যা বলছি করো আগে।' পকেট থেকে নোটবুক বের করে খসখস করে কিছু লিখল কিশোর।

রবিন ততক্ষণে পায়ে বেঁধে ফেলল যন্ত্রটা।

দুজনের দিকে তাকাল কিশোর, 'রেডি...আমি শুরু করলাম।'

সাইকেল চালাতে শুরু করল সে। তার পেছন পেছন দৌড়ে আসতে লাগল দুই সহকারী।

দেয়ালের ফোকরের কাছে এসে থামল কিশোর। রবিনের দিকে তাকাল।

'কয় মিনিটে কতখানি এলাম, দেখে, হিসেব করে বের করো কতটা জোরে এসেছি।'

ক্যালকুলেটরে হিসেব শুরু করল রবিন। 'ঘণ্টায় বারো মাইল গতিতে এগিয়েছ।'

'অনিক ম্যাকডোনাল্ডের গাড়ির গতি শুরুতে ছিল কমপক্ষে আশি মাইল। আমাকে ফেলে দেয়ার পর গতি কিছুটা কমিয়েছিল। ধরা যাক বিশ কমিয়েছিল। হলো, ষাট। তাহলে এইটুকু রাস্তা আসতে কত সময় লেগেছে তার?'

'তিরিশ সেকেন্ড,' ক্যালকুলেটরের দিকে তাকিয়ে বলল রবিন।

'সাইকেলে করে আমার আসতে লেগেছে কতক্ষণ?'

'আড়াই মিনিট।'

রাস্তার কিনারে ঘাসের ওপর বসে পড়ল কিশোর।

হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। কিছুই বুঝতে পারছে না।

'অথচ আমি বাঁক পেরিয়ে দেখলাম,' কিশোর বলল, 'গাড়িটা দেয়াল ভেঙে ঢালে নেমে যাচ্ছে। ঢালের কিনারে ওই যে ওখানটায় একটা গাড়ির গড়িয়ে নামতে কত সময় লাগতে পারে?'

'পনেরো সেকেন্ড,' জবাবটা দিল এবার মুসা।

'তাহলেই বোঝো!' উত্তেজিত হয়ে উঠল কিশোর। 'মিলছিল না এজন্যেই। কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। আমাকে ফেলে দিয়ে এসে, দেয়াল ভেঙে, ঢাল পেরিয়ে খনিতে পড়তে ওটার বড় জোর পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড লাগার কথা। আড়াই মিনিট তো লাগতেই পারে না।'

'দাঁড়িয়ে থেকেছিল বলতে চাও?' রবিনও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

'হ্যাঁ। এত দেরি করেছে, তারমানে স্বাভাবিক অ্যাক্সিডেন্ট করেনি ওটা। গাড়ি ঘুরিয়ে গুঁতো মেরে দেয়াল ভেঙেছে আগে। হ্যান্ডব্রেক সেট করেছে। জানালার কাঁচ তুলে দিয়েছে। এঞ্জিন চালু রেখে নেমে এসে ব্রেক ছেড়ে দরজাটা লাগিয়ে দিয়েছে আবার।'

চুপ করে আছে মুসা আর রবিন।

'আমাকে আসতে দেখে লুকিয়ে পড়েছে দেয়ালের আড়ালে,' আবার বলল কিশোর। 'তারপর আমার আর জ্যাকের বাবার অলক্ষে এক সময় সরে পড়েছে। লুকিয়ে থেকেছে কোথাও। রাত দুপুরে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছে স্মৃতিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভান করে।'

উত্তেজনায় কথা আটকে গেছে যেন রবিনের। কিছুই বলছে না।

মুসারও চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। বলল, 'চলো, পুলিশকে গিয়ে জানাই। অকাট্য যুক্তি। এবার! বিশ্বাস না করে যাবে কোথায়?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'পুলিশকে বলার সময় এখনও আসেনি। আরও প্রমাণ দরকার।'

ছয়

বিকেল বেলা বাস্কেট বলের প্র্যাকটিস সেরে এসে ডুগানের কফি শপে ঢুকল মুসা আর বিড ওয়াকার। জানালার কাছের একটা টেবিলে গিয়ে বসল। ওয়েইট্রেসকে ডেকে কোক আর মিল্কশেকের অর্ডার দিল মুসা।

বিড তিন গোয়েন্দার পুরানো বন্ধু। মুসাদের টীমের খেলোয়াড়।

ঘরটা পুরানো স্টাইলে সাজানো। হালকা রঙ করা জানালার কাঁচ, দেয়ালে ইনডিয়ানদের মোষ শিকারের দৃশ্য, ভারী কাঠের তাকে রাখা বিচিত্র দর্শন অ্যানটিক চায়ের কাপ।

বিড জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কি কেস শুরু করলে তোমরা?'

'ওশনসাইডে পাহাড় থেকে একটা গাড়ি পড়তে দেখেছে কিশোর...'

'ও, ওই গাড়িটা। পত্রিকায় পড়লাম।'

জবাব দিতে গিয়েও দরজার দিকে চোখ পড়তে থেমে গেল মুসা। ভুরু উঠে যাচ্ছে কপালের কাছে। 'খাইছে!'

'কি হলো?'

'ওই দেখো, কে ঢুকেছে!'

'কে? ফিল্ম স্টার নাকি?' বলতে বলতে ফিরে তাকাল বিড।

ওদের চেয়ে কয়েক বছরের বড় একটা সুদর্শন ছেলে ঢুকেছে ঘরে। গায়ে নীল রঙের জ্যাকেট। সঙ্গে একটা লোক, বিশালদেহী, বডি বিল্ডারদের মত শরীর। কোথাও দেখেছে লোকটাকে, কিন্তু মনে করতে পারল না মুসা।

'অনিক ম্যাকডোনাল্ড!' ফিসফিস করে ছেলেটার কথা বলল সে। 'চিনতে পারছ না?'

'কে?'

'অনিক ম্যাকডোনাল্ড। কাল গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে যে ছেলেটা।'

দুজনের দিক থেকে চোখ সরাচ্ছে না মুসা। হেসে হেসে কথা বলছে অনিক।

'ও, হ্যাঁ, তাই তো মনে হচ্ছে,' বিড বলল। 'লোকটা কে?'

'জানি না!' মাথা নাড়ল মুসা। 'চিনি চিনি মনে হচ্ছে, কিন্তু...'

কালো রঙের ফতোয়ার মত গেঞ্জি গায়ে দিয়েছে লোকটা। গালের একপাশে গভীর একটা কাটা দাগ। নাকটা ভোঁতা। ঘুসি খেয়ে হাড় ভেঙে বসে গেছে, সেটাকে আর ঠিক করতে পারেনি। এক কানে একটা রিঙ। হাতে মেয়েদের মত সোনার বালা।

'ভাঁড়টা কে?' বিড বলল। 'লাগছে তো ছাগলের মত। অনিক ম্যাকডোনাল্ডের বন্ধু নাকি?'

'নাহলে কি আর সঙ্গে এসেছে। ছাগল বলছ কেন? আমার কাছে খুবই

বিপজ্জনক লোক মনে হচ্ছে–গুণ্ডাপাণ্ডা।...কিন্তু আমি সেকথা ভাবছি না,' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে বলল মুসা। 'ভাবছি, হেসে হেসে কথা বলছে অনিক...তারমানে লোকটা তার পরিচিত, তারমানে ওকে চিনতে পেরেছে...এবং তারমানে...খাইছে! ওর না অ্যামনেশিয়া! স্মৃতি নষ্ট হয়ে গেলে পরিচিতজনকেই বা চেনে কিভাবে?'

'কই, আমার কাছে তো সুস্থই মনে হচ্ছে ওকে,' বিড বলল, 'রোগীটোগি না।'

কারও দিকে তাকাচ্ছে না দুজনে। আপনমনে কথা বলছে, আর প্রচুর হাসাহাসি করছে।

'বিড। বসো তুমি। আমি আসছি।' উঠে দাঁড়াল মুসা।

'কোথায় যাচ্ছ?'

'চোখ রাখো ওদের ওপর। আমি কিশোরকে ফোন করে আসি।'

'কিন্তু আমার দেরি হয়ে যাবে। বাবা বলে দিয়েছে...'

'দুই মিনিট,' বলেই দরজার দিকে রওনা হয়ে গেল মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়েই একপাশে ফোন বুদ। স্যালভিজ ইয়ার্ডে ফোন করল মুসা। ধরল ডন। জানাল, কিশোর গেছে রবিনদের বাড়িতে। ওখানে ফোন করল মুসা। ধরলেন রবিনের আম্মা।

'আন্টি, রবিন কোথায়?'

'বাগানে পাতা কাটছে।'

'কিশোর আছে না?'

'আছে।'

'একটু ধরতে বলবেন?'

'ধরো। দিচ্ছি।'

কিশোর এসে 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজিত কণ্ঠে মুসা বলল, 'দৌড় দাও! যত তাড়াতাড়ি পারো চলে এসো ডুগান'স কফি শপে। আমি বসে রইলাম।'

লাইন কেটে দিয়ে ঘরে এসে ঢুকল মুসা। টেবিলে ফিরে এল।

'পেলে?' জিজ্ঞেস করল বিড।

'আসছে।'

কোণের টেবিলের দিকে তাকাল মুসা। আগের মতই বসে আছে অনিক আর লোকটা। কফি খাচ্ছে। কথা বলছে। হাসাহাসি করছে।

'তুমি বসো,' উঠে দাঁড়াল বিড। 'তাড়া না থাকলে আমিও থাকতাম। দেখে যেতে ইচ্ছে করছে।'

'যাও। পরে জানাব কি হলো।'

'জানিয়ো কিন্তু।'

মিল্কশেকের গ্লাস হাতে বসে রইল মুসা। বার বার ঘড়ি দেখছে। এত দেরি করছে কেন কিশোর? এক মিনিট...দুই মিনিট...তিন...

ওয়েইটারকে ডেকে বিল দিতে বলল অনিক।

লোকটা উঠে চলে গেল টয়লেটের দিকে।

পুরো পাঁচ মিনিট হয়ে গেল। কিশোররা আসছে না কেন?

টয়লেট থেকে ফিরে এল লোকটা। উঠে দাঁড়াল অনিক। টেবিল থেকে বিলটা তুলে নিয়ে এগোল ক্যাশ ডেস্কের দিকে।

অনেক দেরি হয়ে গেল! আফসোস করতে লাগল মুসা। একটা বিরাট সুযোগ হারাল ওরা।

★

পকেট থেকে টাকা বের করে দিল অনিক। হাত ধরাধরি করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ঠিক এই সময় হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকল কিশোর। পেছনে রবিন। পথ থেকে সরে দাঁড়াল অনিক। তাকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে মুখের দিকে তাকিয়েই থমকে গেল কিশোর। দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে রইল। অনিক ম্যাকডোনাল্ডের মুখোমুখি।

একটা মুহূর্ত যেন ঝুলে রইল সময়টা। বিস্ময় ফুটল কিশোরের চেহারায়। ওই তো দাঁড়িয়ে আছে রক্ত-মাংসে গড়া অনিক ম্যাকডোনাল্ড। মাত্র দুই ফুট দূরে। চুলগুলো টেনে পেছনে আঁচড়ানো। হালকা-পাতলা শরীর। শীতল, হিসেবী চোখ। এই প্রথম ওর চোখ দেখতে পেল কিশোর।

সামনে এসে দাঁড়াল ওর বন্ধু। জ্বলন্ত চোখে একবার কিশোরের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

দ্বিধা করছে অনিক। সরু হয়ে গেছে চোখের পাতা। বাঁকা হয়ে গেল একপাশের ঠোঁটের কোণ।

বাইরে অস্থির হয়ে অপেক্ষা করছে ওর বন্ধু। অবশেষে কিশোরের ওপর থেকে চোখ সরাল অনিক। ক্যাশিয়ারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল পাশ কেটে।

ভারী সবুজ কার্পেট মাড়িয়ে দৌড়ে এল মুসা। তিনজনেই এত বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছে, কথাই বেরোতে চাইল না। কিশোর ভাবতেও পারেনি এভাবে মুখোমুখি হয়ে যাবে অনিক ম্যাকডোনাল্ডের। গাড়ির মধ্যে চশমায় ঢাকা অবস্থায় কিংবা ছবিতে দেখে অতটা বোঝা যায় না। কিন্তু এখন দেখে পরিষ্কার ধারণা হলো তার, ছেলেটা অনেক বেশি শীতল, কঠিন, নিষ্ঠুর।

'তোমাকে চিনে ফেলেছে,' কানের কাছে ফিসফিস করে বলল অবশেষে মুসা। 'কোন সন্দেহ নেই। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম আমি।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল কিশোর। চিন্তায় ডুবে আছে।

'কি, টেবিল লাগবে?' ডেকে জিজ্ঞেস করল ক্যাশিয়ার। 'তিনজন একসঙ্গে বসার জায়গা করে দিতে পারি।'

মাথা নেড়ে দুই বন্ধুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল মুসা।

'ও তোমাকে চিনে ফেলেছে,' একই কথা রবিনও বলল কিশোরকে। রাস্তার দিকে তাকাল। অনিক বা তার সঙ্গী, কেউ নেই। চলে গেছে। 'এর মানেটা কি বুঝতে পারছ?'

'পারছি। আমাদের ধারণাটাই ঠিক,' বলল কিশোর, 'ও মিথ্যে কথা

বলেছে। আমাকে চিনতে পেরেছে, তারমানে ওর স্মৃতিফিতি কিচ্ছু নষ্ট হয়নি। ডাক্তারও ভুল করেছে। পুলিশ ভুল করেছে। সবাইকে ঠকিয়েছে ও।'

'তাহলে আর কি,' মুসা বলল। 'চলো এখন গিয়ে পুলিশকে জানাই সব।'

'অত সহজ না ব্যাপারটা।'

'কেন?'

'আমরা জেনেছি, আমাদের চিনেছে। সে-ও সেটা বুঝে ফেলেছে। কিন্তু পুলিশ জিজ্ঞেস করলেই না চেনার ভান করবে। আরও সতর্ক হয়ে যাবে। এক ভুল আর দ্বিতীয়বার করবে না।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারছে কিশোর, বিপদটা বেড়ে গেছে ওর। যে ছেলে শান্ত মাথায় প্ল্যান করে বীমা কোম্পানিকে ফাঁকি দেয়ার কথা ভাবতে পারে, গাড়ি ধ্বংস করতে পারে, গুণ্ডাপাণ্ডার সঙ্গে ভাব করতে পারে, বয়েস তার যতই কম হোক না কেন, সে বিপজ্জনক। পথের কাঁটা সরিয়ে দেয়ার জন্যে যদি কাউকে খুন করার পরিকল্পনা আঁটে, তাহলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।

সাত

'খুন করার পরিকল্পনা করলেও আমাকে চেনে না ও। খুঁজে বের করবে কি করে?' নিজের ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আপনমনেই বলল কিশোর।

কিন্তু কেন করছে এ সব? নিশ্চয় টাকার জন্যে। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে ও। কেন?

প্রশ্নটার জবাব খুঁজতে লাগল কিশোর। এত টাকার কি দরকার ওর? বান্ধবীকে দামী উপহার দেবে? কারও কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে ফেরত দিতে পারছে না? নাহ্, এ সব কোন কারণই নয়। ধনীর একমাত্র ছেলের জন্যে এত সাধারণ ব্যাপারে টাকার সমস্যায় পড়ার কোন যুক্তিই নেই। এ রকম কোটিপতির ছেলের জন্যে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার কোন টাকাই না। খুব ঠেকায় পড়েছে বলে বাপের কাছে চাইলেই দিয়ে দেবে।

বিছানায় বসে আয়নার দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিশোর, এই সময় ঘরে ঢুকল ডন। বিকট শব্দে মুখ দিয়ে ঠা-ঠা-ঠা-ঠা করে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে চমকে দিল কিশোরকে। কাছে এসে পেটের কাছে হাতটা ধরল বেয়োনেট দিয়ে খোঁচা মারার ভঙ্গিতে।

'কি ভাবছ?' কিশোর তাকাতেই বড়দের ভঙ্গিতে ভুরু নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'রহস্যটার সমাধান হলো?'

বিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল কিশোর, 'তুমি এখন যাও তো, ডন। আমি চিন্তা করছি।'

'সে তো দেখতেই পাচ্ছি। কি চিন্তা? পুলিশ তোমাদের কথা বিশ্বাস

করছে না?'

ভুরু কুঁচকে গেল কিশোরের। 'পুলিশ যে বিশ্বাস করছে না তুমি জানলে কি করে?'

রহস্যময় হাসি হাসল ডন। চোখ উল্টে, হাত নেড়ে একটা বিশেষ ভঙ্গি করে জবাব দিল, 'আরব্য রজনীর দৈত্যটা আমার পোষা। সে-ই এসে সব জবাব দিয়ে যায়।'

'তারমানে আমি, মুসা আর রবিন যখন আলোচনা করছিলাম, আড়ি পেতেছিলে...'

'আমি কি কোন সাহায্য করতে পারি?'

'পারো। তোমার চলে যাওয়াটাই আমার জন্যে এখন বিরাট সাহায্য।'

ভুরু কোঁচকাল ডন। 'বেশ, যাচ্ছি। যদি কখনও দরকার মনে করো, ডেকো। পরামর্শের জন্যে পয়সা নেব না।'

দোয়েল পাখির মত শিস দিতে দিতে দরজার দিকে এগোল সে। ঘর থেকে বেরোতে গিয়েও থেমে ফিরে তাকাল, 'আব্বা বলে, যাকে নিয়ে সমস্যা, তার সঙ্গে সরাসরি কথা বলা সবচেয়ে ভাল।'

বেরিয়ে গেল ডন।

ওর শেষ কথাটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তুড়ি বাজাল কিশোর। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে নামল। ফোন বুকটা রয়েছে নিচতলায়। যা খুঁজছিল পেতে দেরি হলো না। ম্যাকডোনাল্ড নিউজপেপার গ্রুপ, হেড অফিস; হলিউড ৬৩৩১১০৭। ফোন তুলে ডায়াল করে অপেক্ষা করতে লাগল।

'ম্যাকডোনাল্ড নিউজপেপারস,' অন্যপাশ থেকে বলল একটা মহিলাকণ্ঠ।

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। কি বলবে চিন্তা করছে।

'কি সাহায্য করতে পারি, বলুন?' খুব ভদ্রভাবে মোলায়েম গলায় প্রশ্ন করল মহিলা।

'আমি কিশোর পাশা, রকি বীচ হাই স্কুলের ছাত্র। সাংবাদিকতার ওপর একটা কোর্স করছি আমি।'

'বলো?' পেশাদার ধৈর্যশীল কণ্ঠ।

'মিস্টার রস ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করার খুব ইচ্ছে ছিল!' কণ্ঠস্বরটাকে বিনীত আর অসহায় করে তুলল কিশোর, মহিলাকে নরম করার জন্যে। 'একটা অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন আমাদের টীচার। বলেছেন, স্থানীয় একজন পত্রিকা মালিকের সাক্ষাৎকার নিতে। যিনি খুব সফল ব্যবসায়ী। এ ক্ষেত্রে মিস্টার রস ম্যাকডোনাল্ডের চেয়ে উপযুক্ত লোক ওশনসাইডে আর কে আছেন! সেজন্যেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইছিলাম। করা যাবে?'

চুপ হয়ে গেল মহিলা। ওর প্রস্তাবটা ভেবে দেখছে সে, বুঝতে পারছে কিশোর। এক মুহূর্ত পর আবার কথা শোনা গেল, 'তুমি ধরো। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলে দেখি। কি নাম বললে যেন?'

'কিশোর পাশা।'

'হ্যাঁ, ধরে রাখো।'

আছি! মনে মনে বলতে লাগল কিশোর, খোদা, যেন 'হ্যাঁ' বলে। একমাত্র এভাবেই ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরের পাথরের দেয়াল অতিক্রম করে ভেতরে ঢুকতে পারবে, যদি রস ম্যাকডোনাল্ড সাক্ষাৎকার দিতে রাজি হন।

ওপাশে আবার রিসিভার তোলার শব্দ হলো। 'হালো, কিশোর? মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে কথা বললাম। কাল সকালে আধঘণ্টা সময় দিতে রাজি হয়েছেন তিনি। তারপর কয়েক দিনের জন্যে নিউ ইয়র্ক চলে যাবেন।'

'ওহ্, টেরিফিক! অনেক ধন্যবাদ আপনাকে! থ্যাংক ইউ!'

'কাল সকাল সাড়ে ন'টায় তাহলে চলে যেয়ো ম্যানরে। আমার কথা বোলো। আমি ওখানে থাকব।'

'আপনার নামটা, প্লীজ!'

'আমি এনিড কফার। কোথায় আসতে হবে জানো নিশ্চয়? ওশনসাইড হিলে এসে ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরটা কোথায় যাকে জিজ্ঞেস করবে সে-ই দেখিয়ে দেবে।'

'আমিই চিনি। থ্যাংক ইউ, মিস কফার…'

'এনিড।'

'এনিড, থ্যাংক ইউ! ও, আরেকটা কথা। আমি কি দুজন বন্ধুকে সঙ্গে আনতে পারব? ওরাও একই ক্লাসের ছাত্র। এই অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করছে। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড কি মাইন্ড করবেন?'

জবাব দেয়ার আগে ভেবে নিল এনিড। 'না, ঠিক আছে এনো। ব্যবস্থা একটা হবে। তবে মনে রেখো, আজেবাজে প্রশ্ন করা চলবে না। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড ব্যস্ত মানুষ। তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছেন কেবল সাংবাদিকতায় আগ্রহ আছে শুনে। এ লাইনে যারা আসতে চায় তাদেরকে সাহায্য করতে তিনি সদাপ্রস্তুত। যাই হোক, ঠিক তিরিশ মিনিট সময় পাবে। তোমার জায়গায় আমি হলে প্রশ্নগুলো সব লিখে নিয়ে আসতাম।'

'তা তো বটেই, লিখেই আনব…এনিড, থ্যাংক ইউ!'

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে। এ মুহূর্তে ডনকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে। ওর কথাতেই আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল।

আট

পরদিন সকালে পনেরো মিনিট আগেই এসে ম্যানরের গেটে হাজির হলো তিন গোয়েন্দা।

'কি করব?' ভেতরে তাকিয়ে উসখুস করছে মুসা। কুকুর দুটোকে খুঁজতে লাগল তার চোখ।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই ড্রাইভওয়ে ধরে আসতে দেখা গেল এক

তরুণীকে। বয়েস বাইশ-তেইশের বেশি হবে না। হালকা বাদামী চুল। চোখা চিবুক। চোখের ওপর হাত রেখে সকালের রোদ আড়াল করে গেটের দিকে তাকাল সে। ছেলেরা আছে দেখে এগিয়ে আসতে থাকল। প্রায় পায়ের সঙ্গে ঘেঁষে থেকে আসছে সেই কুকুর দুটো।

কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কিশোর পাশা কে?'

'আমি,' সামনে এগিয়ে গেল কিশোর।

গেট খুলে দিল তরুণী। হাত বাড়াল, 'আমি এনিড কফার,' হালকা, মিষ্টি হাসি হাসল। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সেক্রেটারি।'

পথ দেখিয়ে তিন গোয়েন্দাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল সে। বর্গাকার একটা হলঘরে ঢুকল। গাঢ় রঙের কাঠের সিলিং। ওক কাঠের ভারী ভারী দরজা। খোদাই করে অলঙ্করণ করা মোটা একটা রেলিঙ উঠে গেছে দোতলায়। সিঁড়ির মাথার কাঠের দেয়াল সাজানো হয়েছে বড় বড় রঙিন কাঁচ বসিয়ে। ঘরের দেয়াল পাথরে তৈরি। নীল আর সাদা চীনামাটির ভাঙা টুকরো দিয়ে ফুল এঁকে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

বাড়ির পেছনে একটা অফিস ঘরে নিয়ে আসা হলো ওদের। লন আর আঙিনার অনেকখানি চোখে পড়ে এখান থেকে। দেয়ালের সারি সারি তাকে গাদাগাদি করে রাখা পুরানো বই। বিরাট কাঠের টেবিলে রাখা একটা কম্পিউটার আর তিনটে টেলিফোন। জানালায় পুরানো আমলের কাঁচ। ওক কাঠের চেয়ার-টেবিলগুলো ভারী ভারী, সবগুলোই খোদাই করে অলঙ্করণ করা। লেভেন্ডার পালিশের গন্ধ। গাঢ় লাল কার্পেট। পুরানো আর নতুনের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ।

বসকে ডেকে আনতে গেল এনিড। অস্বস্তি বোধ করতে লাগল তিন গোয়েন্দা। প্রায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমার গা ছমছম করছে!' ফিসফিস করে বলল মুসা। 'এ রকম ঘরে আর ঢুকিনি কখনও। দেখিওনি জীবনে। সিনেমায় ছাড়া।'

হাত মুঠো করে রেখেছে রবিন। হাতের তালু ঘামছে। এ রকম একটা বাড়িতে সারাক্ষণ বাস করার কথা, রাতে ঘুমানোর কথা ভাবতেও কেমন লাগছে তার। কিশোরের দিকে কাত হয়ে নিচু গলায় বলল, 'মিথ্যে কথা বলে তো এসেছ, কাজটা কি ঠিক হয়েছে?'

'এখন আর ওসব ভাবার সময় নেই। যা হয় হবে…আসছে!'

দরজার নব ঘুরল। খুলে গেল পাল্লা। খয়েরী স্যুট পরা লম্বা একজন বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছেন দোরগোড়ায়। ধূসর চুল। তীক্ষ্ণ চেহারা। চোখা চিবুক। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। কিন্তু হাসিটা যান্ত্রিক। হাত মেলালেন, তাতেও কোন প্রাণ নেই।

ঘুরে গিয়ে বসলেন বিশাল ডেস্কের ওপাশের চেয়ারে। টেবিল ল্যাম্পের আলোয় দুই ভুরুর ওপরে আর চোখের কোণের গভীর ভাঁজগুলো দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার।

'কিশোর সাংবাদিক,' ভরাট গমগমে কণ্ঠস্বর, 'স্কুল থেকে

অ্যাসাইনমেন্ট...আইডিয়াটা ভালই লাগছে আমার।...বসো।'

ঢোক গিলল কিশোর। 'আপনার স্কুল জীবন থেকেই শুরু করা যাক। কিছু বলবেন?'

কাগজ-কলম নিয়ে তৈরি হলো কিশোর।

'বলব,' মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের হাসিটা আগের মতই আছে। ঘরের চারপাশে দ্রুত ঘুরে এল তাঁর চঞ্চল চোখের দৃষ্টি। 'কি জানতে চাও?'

একের পর এক প্রশ্ন করে গেল কিশোর। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড তার জবাব দিতে লাগলেন। কোন প্রশ্নই তাঁকে থমকে দিতে পারল না। দ্বিধা করলেন না। এতে অবশ্য অবাক হওয়ার কিছু নেই। দ্বিধা থাকলে সফলতার এ পর্যায়ে পৌঁছুতে পারতেন না।

'আপনার সফলতার চাবিকাঠি কি—এ ব্যাপারে কিছু বলুন,' কিশোরের এ কথার জবাবে তিনি বলতে লাগলেন, 'সফলতার চাবিকাঠি হলো কঠোর পরিশ্রম। কোন কিছুতে লেগে থেকে যদি তুমি পরিশ্রম করে যাও, সফলতা আসতে বাধ্য। চল্লিশ বছর আগে লস অ্যাঞ্জেলেস স্টার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন লেখকের কাজ দিয়ে শুরু করেছিলাম। আর এখন দেখো আমার অবস্থা। এর পেছনে ছিল আমার নিষ্ঠা আর কঠোর শ্রম। দিনরাত পরিশ্রম করে আজ এই পর্যায়ে উঠে এসেছি আমি। সফলতার জন্যে আরও একটা জিনিস খুব দরকার, শৃঙ্খলা। উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যত পরিশ্রমই তুমি করো, এগোতে পারবে না। আজ আমাকে দেখে কেউ ভাবতেও পারবে না শহরতলির অখ্যাত এক এলাকায় অন্ধকার ঠাণ্ডা একটা ঘরে একদিন জন্ম হয়েছিল আমার।'

ঝড়ের গতিতে লিখতে লিখতে মুখ না তুলেই কিশোর বলল, 'একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, যতদূর জানি, সব সফলতার জন্যেই বড় ধরনের খেসারত দিতে হয় মানুষকে। আপনি কি দিয়েছেন?'

দুই ভুরুর মাঝের ভাঁজগুলো আরও গভীর হলো মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের। এই প্রথম জবাব দিতে সামান্য দ্বিধা করলেন তিনি। 'কোন্ খেসারতের কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি?'

মুখ তুলল কিশোর। 'আমি জানতে চাইছি, ব্যবসায় উন্নতির সাথে সাথে পারিবারিক শান্তিও কি বজায় ছিল আপনার?'

আবার দ্বিধা করলেন তিনি। 'বুদ্ধি আছে তোমার। বেশ ভেবেচিন্তে প্রশ্ন সাজিয়েছ।' কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করলেন। 'আমার দুর্ভাগ্য, আমার স্ত্রী মারা গেছে পনেরো বছর আগে, যখন আমার ছেলের বয়েস মাত্র সাড়ে তিন। ঝামেলার ভয়ে আর দ্বিতীয় বিয়ে করিনি। পারিবারিক জীবন বাদ দিয়ে শুধু ব্যবসাতেই মনোনিবেশ করেছি।'

উঠে জানালার কাছে চলে গেলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে; বাগানের দিকে, গাড়িবারান্দায় রাখা রোলস রয়েস আর মার্সিডিজ গাড়িগুলোর দিকে। 'পরিবার বলতে এতগুলো বছর ছিল শুধু আমার একমাত্র ছেলে, অনি। ওকেই আমার পারিবারিক সফলতা বলতে পারো।' শেষের দিকে তাঁর কথাগুলো অনিশ্চিত শোনাল। ব্যবসায়ীক সফলতার কথা

বলার সময় যেমন জোর ছিল, তেমন জোর আর নেই।

'আপনার ছেলে অনিক?'

'হ্যাঁ, অনি।' বাগানের কোন কিছুতে যেন মনোযোগ চলে গেছে তাঁর।

'আপনার সমস্ত পত্রিকার মালিক তো আপনার ছেলেই হবে, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'পত্রিকা, বাড়িঘর, সম্পত্তি–সব কিছুর মালিক।'

'আর কোন সন্তান নেই?'

ভ্রূকুটি করলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। 'না!' জবাবটাকে যেন দীর্ঘ একটা মুহূর্ত ঝুলিয়ে রাখলেন ঘরের বাতাসে। 'অনিই পাবে আমার সবকিছু। যদি বেঁচে থাকে।' শেষ কথাটা বলার সময় কেমন বিষণ্ন হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ। যেন 'বেঁচে থাকবে' এমন আশা করতে পারছেন না।

'অনিকের কি সাংবাদিকতায় আগ্রহ আছে?'

ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। কিশোরের মুখোমুখি হলেন। ঘড়ি দেখলেন। 'তোমার সময় শেষ। আর কোন প্রশ্ন নয়।' আবার সেই যান্ত্রিক হাসিটা ফিরে এসেছে তাঁর মুখে। আন্তরিকতা শেষ দিকে যেটুকু তৈরি হয়েছিল, উধাও হয়ে গেল। তিন গোয়েন্দার মুখের দিকে তাকালেন। 'কিশোর পাশা, রবিন মিলফোর্ড, মুসা আমান, আশা করি তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়েছ। আমাকে এখন যেতে হচ্ছে। এনিডকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তোমাদেরকে এগিয়ে দেবে। তোমাদের সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগল। গুড লাক। তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট সফল হোক।' এক এক করে সবার দিকে তাকিয়ে বাউ করার ভঙ্গিতে সামান্য মাথা নোয়ালেন। তারপর হেঁটে গেলেন যে দরজাটা দিয়ে ঢুকেছিলেন, সেটার দিকে।

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড বেরিয়ে যাওয়ার পর নড়ে উঠল রবিন। জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'উফ্, বাঁচলাম!'

'মোটেও সুখী মানুষ মনে হলো না আমার তাঁকে,' মুসা বলল।

সব কিছু থাকার পরেও যে মানুষ অসুখী হয়, এ কথাটা ভাবতে চিরকালই অবাক লাগে কিশোরের। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড আমাদের আলোচ্য বিষয় নন। আসল কথাটা জানা গেছে : রস ম্যাকডোনাল্ডের প্রতিটি পাই পয়সার মালিক হবে অনিক। তাহলে পঁয়ত্রিশ হাজার ডলার চুরি করার জন্যে এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠল কেন সে?'

'আমার দিকে তাকিয়ে লাভ নেই,' মুসা বলল। 'এ সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব না আমি।'

এনিড এসে ঢুকল। আবার হলঘরে নিয়ে এল ওদের। কোল্ড ড্রিংকস খাবে কিনা জিজ্ঞেস করল।

রবিন মাথা নাড়ল। মুসাও বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে। গলাটা শুকিয়ে গেছে, তা-ও বলল, খাবে না। দুজনকেই অবাক করে দিয়ে রাজি হয়ে গেল কিশোর। এনিডের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আধঘন্টা খুব কম সময়। অনেক কিছুই জানা বাকি রয়ে গেছে। আপনাকে জিজ্ঞেস করেই জেনে নিই বরং।'

'কি?'

'এতগুলো পত্রিকা একসঙ্গে চালানো, কোন্ সময় বের করতে হলে কখন থেকে ছাপা শুরু করতে হয়, বিজ্ঞাপন জোগাড় করার নিয়ম-কানুন, ঝামেলা···এ সব।'

'পত্রিকার সার্কুলেশন কত, তা-ও জানতে চাও নিশ্চয়?'

'তা তো বটেই। এত টাকার মালিক হতে হলে কত পত্রিকা বিক্রি হওয়া দরকার, সেটা জানার কৌতূহল হওয়াটা স্বাভাবিক। কয়েকটা মিনিট সময় দিতে কি খুব অসুবিধে হবে আপনার?'

'না, তা হবে না। চলো, বাইরে যাই।'

বাগানে নিয়ে এল ওদেরকে এনিড। ট্রেতে করে কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে গেল হাউসকীপার।

বাগানের একধারে আস্তাবল। একটা ছেলে কাজ করছে ওখানে। এ বাড়িতে যত লোক আছে, সবার সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে কিশোরের। যত বেশি বলা যাবে, তত বেশি তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনা। আগেই সেটা আলোচনা করে এসেছে দুই সহকারীর সঙ্গে। আস্তাবলটার দিকে ইঙ্গিত করে ওদের চোখ টিপল। বুঝতে পারল দুজনেই।

এনিডের দিকে তাকাল মুসা। বলল, 'ওখানে ঘোড়া দেখতে গেলে কি কোন অসুবিধে হবে? ঘোড়া আমার খুব পছন্দ।'

'না না, অসুবিধে কি? যাও না।'

'থ্যাংক ইউ।'

ফুলের ঝাড় দেখতে দেখতে মুসার সঙ্গে রবিনও এগোল আস্তাবলটার দিকে।

'মুসা খুব ঘোড়া পছন্দ করে,' এমন ভঙ্গিতে বলল কিশোর, যেন এটা মুসার বড় ধরনের কোন রোগ। 'দেখলে আর রক্ষা নেই। কাছে যাবেই।'

'তাতে কোন দোষ নেই,' এনিড বলল। 'ঘোড়া আমারও খুব পছন্দ। সব সময় একটা ভাল ঘোড়ার মালিক হতে চেয়েছি আমি। তোমার ঘোড়া ভাল লাগে না?'

'না। আমার ইচ্ছা রিপোর্টার হওয়ার। সাংবাদিক হওয়ার জন্যে সব কোরবান করে দিতে রাজি আছি আমি।'

'হ্যা, সেটা ভাল ইচ্ছা,' নীরস কণ্ঠে বলল এনিড। খবরের কাগজের মালিকের বাড়িতে বসে কাগজ নিয়ে বিরূপ কথা বলতে বাধল বোধহয় তার।

মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর। 'তাহলে শুরু করা যাক। আপনার সময় নিশ্চয় খুব কম।'

নয়

আস্তাবলের সামনে খড় জড়ো করছে বাদামী রঙের লম্বা ঝাঁকড়া চুলওয়ালা

একটা ছেলে। অনিকের বয়েসী। পরনে রঙচটা ডেনিম আর গলাখোলা হালকা নীল রঙের শার্ট। পায়ে কালো রঙের ভারী বুট। নিজের নাম জানাল, ববি জিনজার।

অনেক বড় একটা ঘোড়ার নাকে হাত বুলিয়ে ওটার সঙ্গে খাতির করতে লাগল মুসা।

ববির দিকে তাকাল রবিন। 'এখানেই থাকো নাকি তুমি?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ববি। 'আমার মা-ও এখানেই কাজ করে। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের হাউসকীপার।'

'এখানে থাকতে কেমন লাগে তোমার? এত্তবড় বাড়ি, এত জায়গা···সাংঘাতিক ব্যাপার, তাই না?'

খড়ের গাদায় ঘ্যাচ করে কাঁটাটা ঢুকিয়ে রাখল ববি। 'ভয়ঙ্কর লাগে,' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল সে। 'মনে হয় মিউজিয়ামে বাস করি।'

একটা পানির কলের সঙ্গে হোসপাইপ লাগাতে গেল সে।

ঘোড়াকে আদর করা বাদ দিয়ে রবিনের কাছে সরে এল মুসা। ঘোড়া ভালবাসার ভান করছিল এতক্ষণ সে। ফিসফিস করে বলল, 'জায়গাটা পছন্দ করে না ও। ওর কাছ থেকে অনিকের ব্যাপারে কথা আদায়ের চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'তাই তো করছি।'

'চালিয়ে যাও তাহলে। বুড়োটার মুখ থেকে তো বিশেষ কিছু বের করা গেল না।'

আবার ঘোড়ার কাছে সরে গেল মুসা।

একটা শূন্য বালতির কাছে পাইপের মাথাটা নিয়ে গেল ববি। অসহিষ্ণু মনে হচ্ছে ওকে। তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার জন্যে অস্থির। রবিনকে এগোতে দেখে বলল, 'কলটা ছেড়ে দেবে?'

হেসে মাথা ঝাঁকাল রবিন। চাবিটা ঘুরিয়ে দিল।

বালতিতে করে পানি নিয়ে গিয়ে একটা গামলার খড় ভিজিয়ে রেখে প্যান্টের পেছনে হাত মুছল ববি। 'চলো, ওঅর্কশপে। ওখানে কাজ করতে করতে কথা বলতে পারব।'

ববির পেছন পেছন বড় লম্বা একটা ঘরে ঢুকল রবিন। পেরেক, দড়ি, চামড়ার টুকরো আর নানা যন্ত্রপাতি স্তূপ হয়ে আছে ঘরের একধারে। এক কোণে স্টোভের ওপর রাখা একটা কেটলি। চামড়া পালিশ, খড় আর এক ধরনের ভাপসা গন্ধে ভারী হয়ে আছে ঘরের বাতাস। তবে গন্ধটা ভালই লাগে।

কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল রবিন, 'এখানে থাকতে কি সত্যি তোমার খারাপ লাগে?'

'লাগারই কথা, তাই না?'

'সবচেয়ে বেশি খারাপ কোন্‌টা লাগে?'

'প্রথমেই ধরো জায়গাটা।'

'মানুষগুলো?'
'বুড়ো ভদ্রলোক ঠিকই আছেন।'
'তাহলে কোন্ ভদ্রলোক ঠিক নেই? অনিক?'
'ওটা তো একটা পাজির পাঝাড়া!'
'তাই?' একটা টুলে বসে পড়ল রবিন।
'নাম্বার ওয়ান ইবলিস। সারাক্ষণ এটা করো, ওটা করো...মা'কে তো পাগল বানিয়ে দিল...আমি সরে সরে বেঁচে থাকি।'
'বাপ-ছেলের সম্পর্ক কেমন?'
'সাপে-নেউলে,' নাক দিয়ে ঘোড়ার মতই খোঁত-খোঁত শব্দ করল ববি। 'বনে না। সারাক্ষণ খালি চাই চাই ছেলেটার। এটা চাই, ওটা চাই। এত বিরক্ত হয়েছেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, ইদানীং কোন কিছু চাইলে আর দেনই না। সাফ মানা করে দেন–দেব না।'
মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'টাকা চাওয়া নিয়েই ঝগড়াটা বেশি হয়, তাই না?'
আলোচনা জমে উঠেছে। মনের ক্ষোভ ঝাড়ার মানুষ পেয়ে ববিও কাজ ফেলে একটা টুল টেনে নিয়ে এসে রবিনের মুখোমুখি বসে পড়ল। 'পানির মত টাকা খরচ করে। বয়েস কম হলে কি হবে, এই বয়েসেই পাক্কা হারামী হয়ে গেছে। টাকা থাকলে আর বাপে খোঁজ-খবর না রাখলে যা হয়। ক্লাবে গিয়ে আড্ডা দেয়া থেকে শুরু করে নেশা করা, জুয়া খেলা, ঘোড়দৌড়–হেন কুকর্ম নেই, যা সে শেখেনি। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। কোন কাজ করে না...বাপ তো ওর ওপর বিরক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে গেছে।'
'তাহলে করেটা কি ও?'
'ওই যে বললাম, শয়তানি। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড একদম পছন্দ করেন না এ সব। এমনিতেই তিনি কঠোর নীতির লোক। সাফ বলে দিয়েছেন অনিকে, এ সমস্ত আর প্রশ্রয় দেবেন না।'
'অনিক কি বলে?'
কেটলিটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল ববি, 'কফি খাবে? বানাব?'
'নাহ্, লাগবে না। কথা বলো। শুনতে ভাল লাগছে।...অনিক কি বলে?'
'কি আর বলবে? বাপের ধাতানি খেয়ে একদম চুপ।'
'টাকার ব্যবস্থা?'
হাসল ববি। অনিকের শাস্তিতে সে খুশি। 'বন্ধ। ওর ভাতা বন্ধ করে দিয়েছেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। টাকা না থাকলে কোন শয়তানিই আর করতে পারবে না অনিক। খেপা হয়ে গেছে সে একেবারে। মুখের সামনে তো আর বাপকে কিছু বলতে পারে না। পেছনে বকাবকি করে গোষ্ঠী উদ্ধার করে।'
'কবে থেকে শুরু হয়েছে এই অবস্থা?'
'মাসখানেক হবে। আগে অত খারাপ ছিল না অনিক। ভালই ছিল। লেখাপড়া করত...অধপতনটা শুরু হয়েছে বছরখানেক ধরে। ইদানীং তো বাড়াবাড়ি রকমের খারাপ।'
'হুঁ, টাকা পাচ্ছে না বলেই বিকল্প ব্যবস্থা নিয়েছে সে,' আনমনে বলল

রবিন। 'গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করে টাকা জোগাড়ের ফন্দি করেছে।' ববি ওর দিকে ভুরু উঁচু করে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'পত্রিকায় পড়েছি।'

আবার হাসল ববি। 'ফন্দির কথাটা পত্রিকায় লেখেনি। কিন্তু তুমি দেখা যাচ্ছে ঠিকই বুঝে ফেলেছ। বীমার টাকা আদায়ের জন্যে এ কাজ করেছে সে।'

হাঁ হয়ে গেল রবিন। নিচের চোয়াল ঝুলে পড়ল। যেন ভীষণ অবাক। 'তুমি কি করে জানলে?'

'এতে জানাজানির কি আছে? এখানে যা ঘটছে, অনিক যে-সব সমস্যায় জড়িয়েছে, সেসব জানা থাকলে ঠিক এ কথাটাই ভাববে সবাই। ও জানে, ওর বাপের কারণে ওকে সন্দেহ করবে না কেউ। পুলিশও কথা তুলবে না। সেই সুযোগটাই নিয়েছে। ওর স্মৃতি খোয়ানোর ব্যাপারটাও স্রেফ ধাপ্পাবাজি। কিন্তু পুলিশ, ডাক্তার সবার চোখে ধুলো দিয়ে ফেললেও আসল জন বিগড়ে বসেছেন।'

'আসল জন মানে?'

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। তিনি তো আর দুদু খান না। ছেলে যদি চলে ডালে ডালে তিনি চলেন পাতায় পাতায়। শয়তানটার শয়তানি আঁচ করে ফেলেছেন। অনিককে বলে দিয়েছেন, যে গাড়িটা ভেঙেছে, বাড়িতে থাকতে চাইলে অবিকল ওটার মত আরেকটা গাড়ি কিনে আনতে হবে। সুতরাং এক হাতে বীমার টাকা নেবে অনিক, আরেক হাতে খরচ করে গাড়ি কিনতে হবে। সেই টাকায় শয়তানির সুযোগ আর পাবে না। ঠিক করেছেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। উচিত সাজা হবে শয়তানটার!'

গালে হাত দিল রবিন। 'তারমানে ওর এত কষ্ট আর চিন্তা-ভাবনা সব মাঠে মারা গেল? বেচারা!'

'বেচারা বলছ কেন! ঠিকই তো হয়েছে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড শাসিয়ে দিয়েছেন, এবারকার মত মাপ করেছেন। এরপর যদি আর কখনও জুয়া খেলার কথা শোনেন, নেশা করার কথা কানে আসে, সব সম্পত্তি অনাথ আশ্রমে দান করে দেবেন। একটা আধলাও ছেলেকে দেবেন না। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেবেন।'

অ, এই কারণেই অনিকের কথা কিশোর জিজ্ঞেস করায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। ভেতরে ভেতরে খুব টেনশনে আছেন তিনি–ভাবল রবিন।

'এখন থেকে সুবোধ বালক হয়ে থাকতে হবে অনিককে,' হাসিটা বাড়ল ববির। 'আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে। ভাবতেও ভাল লাগছে আমার।'

অনিকের ওপর কি রকম চটা ববি, বুঝতে অসুবিধে হলো না রবিনের। ওরকম চটাতে তার ওপর কতখানি অত্যাচার করা হয়েছে, তা-ও অনুমান করতে পারল।

অনেক কথা জানা গেল। রবিনও সন্তুষ্ট। ববির হাসিটা ফিরিয়ে দিল। 'ববি, থ্যাংক ইউ। আজ চলি,' বলে উঠে দাঁড়াল টুল থেকে।

'তোমার সঙ্গে কথা বলে আমারও খুব ভাল লাগল। আমি একা মানুষ। কথা বলার লোকও পাই না। তোমার সঙ্গে কি আর দেখা করা যাবে?'

'নিশ্চয়,' সময়মত আরও তথ্য আদায়ের সুযোগটা লুফে নিল রবিন। 'যখন খুশি চলে এসো আমাদের বাড়িতে।'

'বাড়িতে?...না, কারও বাড়ি যেতে আমার ভাল লাগে না। অন্য কোথাও। কাল সন্ধ্যায় আইস রিংকে যাওয়ার কথা আছে আমার। স্কেইটিং করতে। সন্ধ্যা সাতটা। তুমি এলে দেখা হতে পারে।'

আইস-স্কেইটিং ভাল লাগে না রবিনের। তবু বলল, 'ঠিক আছে, চেষ্টা করব।'

কথায় ফাঁক রাখল। কিশোরের সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করবে না।

দশ

চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে রবিন। উদ্বিগ্ন। উত্তেজিত। ফিসফিস করে বলল, 'এইমাত্র দেখলাম ওকে!'

'কে? অনিক?' জানতে চাইল মুসা।

মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'হ্যাঁ। এখানে এসেছিলাম কিশোরকে খুঁজতে। এসে দেখি নেই। এনিডের সঙ্গে ভেতরে গেছে ভেবে গিয়ে উঁকি দিলাম মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের অফিসে। ওদের দেখলাম না। তবে অনিককে দেখলাম।'

'ও তোমাকে দেখেছে?'

'না। বাপের ডেস্ক ডায়েরীটা ঘাঁটছিল। খুব গম্ভীর দেখাচ্ছিল ওকে। ভয়ে ভয়ে আছে। দেখেটেখে চুপচাপ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পা টিপে টিপে আমি গিয়ে ঢুকলাম তখন।'

'খাইছে! খুব সাহস দেখিয়ে ফেলেছ! যদি ধরা পড়তে?'

'পড়িনি...'

'কি দেখলে?'

'ডায়েরীটা,' দম নিল রবিন। 'কার কার সঙ্গে আজ বাবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে দেখছিল। কিশোরের নাম-ঠিকানা বড় বড় করে লেখা রয়েছে ওতে। ও কে, আমরা কে, কোথায় থাকি, কোন স্কুলে পড়ি, সব জেনে গেছে ও।'

'হুঁম!' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'ও এখন কোথায়?'

'কি করে বলব? আছে হয়তো ধারে-কাছেই কোথাও। আমাদের ওপর নজর রাখছে।'

'কিশোরকে খুঁজে বের করে এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। যা শুনলাম, মহা খেপা খেপে আছে অনিক। কখন কি করে বসে ঠিক নেই।'

'কিশোরকে বাধা দেবে বলতে চাইছ?'

'তা তো দিতেই পারে। তার গোপন কথা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে যা খুশি

করতে পারে এখন। ভাল একটা গ্যাঁড়াকলে পড়েছে। মাথা গরম করে যদি কিশোরকে ছুরিও মেরে দিতে আসে তাহলেও অবাক হব না। গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টের তদন্ত করতে যে যাবে, সে-ই এখন অনিকের জন্যে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। পথের কাঁটা সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না সে।'

মাথা চুলকাল রবিন। 'ঠিকই বলেছ। এখান থেকে এখন বেরিয়ে যাওয়া দরকার আমাদের। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড যদি বেরিয়ে গিয়ে থাকেন, বিপদে পড়ব আমরা। অনিক...'

'একা অবশ্য কিছু করার সাহস পাবে না সে। আমরা তিনজন...'

'তা-ও অন্যের বাড়িতে ঢুকে মারামারি...পুলিশের কাছে জবাবদিহি করতে হবে...মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড শুনলেও বিরক্ত হবেন আমাদের ওপর। আমাদের তিনি ভাল ছেলে মনে করেছেন।'

'তা তো বুঝলাম। কিন্তু কিশোর কোথায় গেল?'

'চলো. দেখি কাউকে পাওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করার মত।'

বাড়ির সদর দরজার বেল বাজাল রবিন। খুলে দিল এনিড। হাসিমুখে বলল, 'কিশোরকে খুঁজছ?'

মাথা ঝাঁকাল রবিন, 'হ্যাঁ।'

'ও একটা ছেলে বটে। সব কিছুর নাড়িনক্ষত্র না জেনে ছাড়াছাড়ি নেই। এত বড় একটা বাড়ির দেখাশোনা করতে কি পরিমাণ ঝামেলা আর খাটনি যায়, সেটা জানার জন্যে কথা বলছে এখন হাউসকীপার মিসেস জিনজারের সঙ্গে। আসবে নাকি?'

'না না, আমরা এখানেই দাঁড়াই,' অনিকের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ার ভয়ে ঢুকতে চাইল না রবিন। 'ওকে একটু তাড়াতাড়ি করতে বলবেন।'

★

বাড়ির সবচেয়ে ওপরতলায় একটা ফ্ল্যাটে থাকে মিসেস জিনজার। সুন্দর করে সাজানো ঘর। ছিমছাম। নীল কাগজ দিয়ে দেয়াল ঢাকা। ঢালু সিলিং।

মহিলা খুব আন্তরিক। সহজে মেশা যায়। প্রশ্নের জবাব দিতে দ্বিধা নেই। তবে আগেই বলে নিয়েছে, 'সব কথারই জবাব পাবে, কেবল মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের ব্যক্তিগত কোন ব্যাপারে প্রশ্ন করা চলবে না। মনিবের হাঁড়ির কথা আমি তোমাদের বলব না। জানা থাকলেও বলব না। বুঝতে পারছ?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর। বড় মানুষদের নানা রকম কেলেঙ্কারির কথা পত্রিকাওয়ালারা মাঝে মাঝেই ফাঁস করে দেয়। বোধহয় ওরকম কোন কিছুর প্রতিই ইঙ্গিত করেছে মহিলা।

'কিন্তু এটা তো বলতে বাধা নেই,' কিশোর বলেছে, 'একজন বড়লোক হিসেবে কিভাবে বিলাসী জীবন যাপন করেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড?'

হেসেছে মহিলা, 'না, তা নেই। ওটা আসলে ব্যক্তিগত প্রশ্নও নয়। আগে কখনও কাউকে সাক্ষাৎকার দিইনি আমি। কি কি বলতে হয়, জানি না। গুছিয়ে বলতে পারব না। যা বলব, তুমি গুছিয়ে লিখে নিয়ো।'

তারপর থেকে চলেছে, একের পর এক প্রশ্ন। কিশোর জানতে পেরেছে :

সপ্তাহে দুদিন পার্টি দেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। অতিথিরা এখানেই ডিনার খায়। কম করে হলেও বারোজন অতিথি আসেন। সব রান্নাবান্না মিসেস জিনজারকেই করতে হয়। সকালবেলা এনিড এসে মেন্যু ঠিক করে দিয়ে যায়। তারপর বাকি কাজ–বাজার করা থেকে শুরু করে রান্নাবান্না, গোছগাছ, ওয়েইটারকে খবর দেয়া, সব মিসেস জিনজারকেই করতে হয়।'

'নিশ্চয় খুব খাটনি পড়ে যায় আপনার,' সহানুভূতি দেখিয়ে বলল কিশোর।

'তা তো পড়েই। তবে তার জন্যে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কাছ থেকে একটা স্পেশাল ধন্যবাদও পাই। বোঝো, মিস্টার রস ম্যাকডোনাল্ডের প্রশংসা, ঈশ্বরের প্রশংসা পাওয়াও বোধহয় এরচেয়ে সহজ।'

কিশোর লক্ষ করল, অস্থির ভঙ্গিতে একবার পায়ের ওপর পা তুলছে, আবার সরিয়ে নিচ্ছে মিসেস জিনজার। মাঝে মাঝেই মাথা নাড়ছে। যেন ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে 'কাজ' নামক 'যুদ্ধের' মধ্যে আর কতদিন লড়াই করতে পারবে সেটা ভেবেই। প্রশ্ন করার তেমন দরকার পড়ছে না কিশোরের। নিজে থেকেই গড়গড় করে সব কথা বলে যাচ্ছে মিসেস জিনজার। বেশি কথা বলা স্বভাব বোধহয় মহিলার, কিংবা বেশির ভাগ সময় মুখ বন্ধ করে রাখতে হয় বলে কথা বলার সুযোগ পেয়ে একেবারে অর্গল ছেড়ে দিয়েছে।

মাঝে মাঝেই হাসছে কিশোর, মাথা ঝাঁকাচ্ছে, নোটবুকে লিখে নিচ্ছে।

'তবে যা-ই বলো, মাস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে খুশি করতে পারবে না কেউ,' মিসেস জিনজার বলল, 'অনিক ম্যাকডোনাল্ডের কথা বলছি। সে কোন কিছুতেই খুশি হয় না। তার জন্যে খেটে খেটে মুখ দিয়ে রক্ত তুলে ফেলো, তা-ও একটা শুকনো ধন্যবাদও দেবে না। বরং আরও বেশি তেড়া কথা বলবে, অপমান করবে। থ্যাংক ইউ শব্দটাই যেন জানা নেই তার।'

অতিরিক্ত বলা হয়ে গেছে ভেবে বোধহয় অনুশোচনা হলো মিসেস জিনজারের। 'দেখো, আবার ভেবে বোসো না আমি ওর সমালোচনা করছি। হাজার হোক মালিকের ছেলে, মালিকই। বেতন দিচ্ছে। নুন খাচ্ছি। এ ভাবে বলাটা ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু না বলেও পারছি না। তুমি যখন জানতে চাইছ, মিথ্যে বলি কি করে?' মাথা ঝাঁকাল মিসেস জিনজার। নিখুঁত পার্ম করা চুল নেচে উঠল। 'তা ছাড়া বুড়ো মানুষটার ওপর তার এই অত্যাচার চোখে দেখে সহ্য করা কঠিন। দিনরাত খাটেন...বাপের দুঃখ যে ছেলে বোঝে না, সে কি মানুষ নাকি!...বাড়িঘর গোছাতে গিয়ে প্রায়ই দেখি এটা নেই, সেটা নেই। তাকের এ জায়গা খালি, বুককেসের ওখানটায় জিনিস নেই...কিছু খোয়া গেছে দেখলে সঙ্গে সঙ্গে জানাই আমি মিস কফারকে। জানিয়ে রাখি, কারণ সাবধান থাকতে হয়। বড়লোকের চাকরি করতে এসে কে চোর খেতাব নিয়ে বেরোবে!' সামনে ঝুঁকল মিসেস জিনজার। কণ্ঠস্বর সামান্য খাদে নামিয়ে বলল, 'আমি আর মিস কফার ভাল করেই জানি জিনিসগুলো কে সরায়। কার কাছে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে, তা-ও জানি। অ্যানটিক কেনার লোকের তো অভাব নেই, লাভও বেশি। সব ওরা চোর! মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড বাড়ি না থাকলে ওদের ডেকে নিয়ে আসে সে। ঘরে দুয়ার দিয়ে ফিসফাস করে, মদও খায়।

বোঝো ঠেলা! এই বয়েসেই পাক্কা ড্রিংকার! আরও যে কত কুকীর্তি করে…থাকগে, ওসব বলে আর লাভ নেই। মিস কফারের সঙ্গে আমার এ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা হয়। বুড়ো বাপটার ওপর ভীষণ অন্যায় করছে ছেলেটা।'

মুখটা লাল হয়ে গেছে মিসেস জিনজারের। রাগেই বোধহয়।

'মিস কফারের কি ধারণা? কি বলেন?'

'কি আর বলবে? বাপের জিনিস ছেলে চুরি করে। জিনিসগুলো যে চুরি হচ্ছে, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড জানেন। এই তো সেদিন গেল একটা অনেক পুরানো পানপাত্র। তারপর ফায়ারপ্লেসের ওপর থেকে গেল একটা অনেক বড় পুরানো প্লেট। ছেলেটা কি করছে সবই জানেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। কিন্তু কিছুই করতে পারছেন না। আমি হলে…আমার ববি হলে…যাকগে।' সামনে ঝুঁকল মিসেস জিনজার। দম নিল। তারপর কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, 'হয়তো করতেন, করেন না মিস কফারের জন্যে। ও তাঁকে কিছু করতে দেয় না। বলে, ছেলেমানুষ। ঠিক হয়ে যাবে।…তাঁকে খুব পছন্দ করে মিস কফার।' ভুরু তুলে জোর দিয়ে বলল, 'খুব!'

নতুন একটা ধারণা শেকড় গাড়তে শুরু করল কিশোরের মনে। 'আপনি বলতে চাইছেন…'

'আমি কিছুই বলতে চাইছি না! আমি শুধু বলছি মিস কফার মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে খুব পছন্দ করে। সেক্রেটারির চেয়ে সম্পর্কটা যেন আরেকটু অন্য রকম। আমি পছন্দ করি মিস কফারকে, তাই তার বদনাম করতে চাই না।'

'তারমানে আপনি বলতে চাইছেন…' বিমূঢ় হয়ে গেছে কিশোর।

'ছেলেমানুষ, ঠিক হয়ে যাবে, এ সব বললেও মিস কফার ঠিকই জানে, ওটা কোনদিন ভাল হবে না। ওই বদমেজাজী ছেলেটাকে সে নিজেও সহ্য করে অনেক কষ্টে। সারাক্ষণ গালাগাল, খুঁত ধরাধরি…বুড়ো মানুষটাকে পছন্দ করি বলেই সহ্য করা হচ্ছে এ সব অত্যাচার।'

'কিন্তু এনিড তো তাঁর সেক্রেটারি! বয়েস অর্ধেকেরও কম।'

'সেক্রেটারি হলেও সে মেয়েমানুষ। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের খেদমত-খবরদারিটা একটু বেশিই করে। পূজা করে রীতিমত।' মাথা দুলিয়ে বলল মিসেস জিনজার, 'ও খুব ভাল মেয়ে। ওর বিরুদ্ধে একটা কথা বলব না আমি। যা করছে এর জন্যে ওকে দোষ দেয়া যায় না। তা ছাড়া মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডও একা মানুষ…কতগুলো বছর একা কাটিয়েছেন। আসলেই এখন তাঁর আরেকটা বিয়ে করে ফেলা উচিত।'

'তাই বলে…' দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মাথায়। ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছে। মিসেস জিনজার যে ইঙ্গিতটা দিয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের প্রেমে পড়েছে এনিড।

'খারাপ কিছু করছে ওরা, তা বলব না কোনমতেই,' মিসেস জিনজার বলল, 'এনিড খুব ভাল মেয়ে।'

'কিন্তু আপনি জানলেন কি করে এতসব?'

'জানি!' পেছনে হেলান দিল মিসেস জিনজার। আবার সামনে ঝুঁকল। বড় করে দম নিল।

'কিশোর!' বাইরের করিডোর থেকে রবিনের ডাক শোনা গেল। উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে তাকে।

এমন করে লাফিয়ে উঠল মিসেস জিনজার যেন গুলি করা হয়েছে তাকে।

'আমার বন্ধু, রবিন,' বলে স্বাভাবিক করতে চাইল কিশোর। কিন্তু কথা বলার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে ঢুকল এনিড। পেছনে রবিন আর মুসা।

'তোমার বন্ধুরা তো ঘাবড়েই গিয়েছিল,' হাসিমুখে বলল এনিড। 'ওদের ধারণা, ওদের কথা ভুলে গেছ তুমি।' মিসেস জিনজারের দিকে তাকাল, 'জেনোরিনা, কি নাকি মেরামত করাবে? টগলদের ওখান থেকে লোক এসেছে।' আবার ফিরল কিশোরের দিকে, 'জেনেছ তো সব?'

'অ্যাঁ!...হ্যাঁ! থ্যাংক ইউ!' আস্তে মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'বসবে? আর কোন কথা আছে?'

দ্বিধা করতে লাগল কিশোর। ওর দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে মাথা নাড়ল মিসেস জিনজার। এনিডের সম্পর্কে যা যা বলেছে, সেটা যেন তাকে আবার বলে না দেয়।

'ঠিক আছে, বসো,' এনিড বলল। 'আমাকেও যেতে হবে। লোকটার সঙ্গে কথা বলে আসি। জেনোরিনা একা পারবে না। দেরি হবে না। এই যাব আর আসব।'

মিসেস জিনজারকে নিয়ে বেরিয়ে গেল এনিড।

মিসেস জিনজারের ঘরে বসে রইল তিন গোয়েন্দা।

দেয়ালে পিঠ ঠেকাল কিশোর। 'আমি বিশ্বাস করতে পারছি না!'

'কি?' জানতে চাইল রবিন।

'কি বিশ্বাস করতে পারছ না?' মুসার প্রশ্ন।

দরজার দিকে তাকাল কিশোর। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এনিডের।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইল মুসা।

'মানে!' চিৎকার করে উঠতে গিয়েও কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে ফেলল রবিন। 'তারমানে বিয়ে করবে? একগাদা ছেলেপুলে হবে! বাপের সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী আর থাকবে না অনিক!'

'আস্তে!' সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে বলল কিশোর। 'কেউ যাচ্ছে!'

'আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না!' মুসা বলল। 'বুড়ো এই কাজ করবে?...মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের চরিত্রের সঙ্গে মেলাতে পারছি না।'

'না পারার কি হলো? আজকাল অনেকেই এ কাজ করে। কোটিপতিরা স্ত্রী থাকতে সুন্দরী অল্পবয়েসী সেক্রেটারিকে বিয়ে করে বসে। আর ম্যাকডোনাল্ডের তো বউই নেই বহুকাল ধরে।'

আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে মুসা বলল, 'উঁহু! এই বিশেষ কোটিপতি

চরিত্রটির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না!'

'চুপ!' কান পেতে আছে কিশোর। পায়ের শব্দটা এনিডের বলে মনে হলো না।

দুপদাপ করে উঠছে।

দুই সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর। 'চলো, কেটে পড়ি। অনিকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ও কি করে বসে ঠিক নেই।'

হাউসকীপারের ঘর থেকে বেরিয়ে করিডর ধরে এগোল ওরা। সিঁড়ির একেবারে ওপরে না উঠলে ওদের দেখতে পাবে না অনিক।

কিছুদূর গিয়ে ফিরে তাকাল কিশোর। অনিকই। মিসেস জিনজারের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর উঁকি দিচ্ছে। করিডরের শেষ মাথায় এসে আরেকটা সিঁড়ি দেখে চট করে তাতে নেমে পড়ল কিশোর। মুসা আর রবিনকে তাড়াতাড়ি করতে বলল। অনিকের চোখে পড়ার আগেই পালাতে হবে।

একেক লাফে দুই-তিনটা করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে রান্নাঘরে নেমে এল ওরা।

'এদিক দিয়ে!' ওকের কড়ি-বরগা চিনতে পারল কিশোর। সামনে হলঘর। এ পথেই ঢুকেছিল। পুরানো ফায়ারপ্লেসের ধার দিয়ে ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু এত তাড়াহুড়া করেও অনিককে এড়াতে পারল না। ওদের আগেই নেমে দাঁড়িয়ে আছে ড্রাইভওয়েতে। সঙ্গে কুকুর দুটো। কালো পোশাক পরা, পা ফাঁক, দাঁত বের করে হাসছে। কুকুরগুলোকে কিছু বলল।

ভারী গলায় গর্জন করে উঠল কুকুর দুটো। মনিবের আদেশ পালন করতে লাফিয়ে উঠল।

দৌড় দিল তিন গোয়েন্দা। লনের ওপর দিয়ে ফুলের বেড মাড়িয়ে ছুটল গেটের দিকে। গেট বন্ধ। খোলার সময় পাবে না। পায়ের কাছেই লেগে রয়েছে কুকুর দুটো। মুসার মনে হলো, তার পায়ে গরম নিঃশ্বাস লাগছে। লাফ দিয়ে দেয়ালে উঠে পড়ল সে। শিকার হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতেই যেন বিকট চিৎকার জুড়ে দিল কুকুর দুটো। লাফ দিয়ে অন্যপাশে নেমে ফিরে তাকাল কিশোর। রবিন আর মুসাও দেয়ালের ওপর উঠে পড়েছে। বিন্দুমাত্র দেরি না করে টপাটপ লাফিয়ে নেমে পড়ল।

দেয়ালের অন্যপাশ থেকে শোনা গেল অট্টহাসি।

এগারো

ইয়ার্ডে ঢুকল কিশোর। দেড়টার সময় মাল নিয়ে আসতে বলে দিয়েছে পাথরওয়ালাকে।

ম্যাকডোনাল্ড ম্যানর থেকে ফিরে রবিন আর মুসা যার যার বাড়ি চলে

গেছে।

ওঅর্কশপের বেড়ায় সাইকেলটা সবে ঠেস দিয়ে রেখেছে কিশোর, এই সময় কানে এল ট্রাকের এঞ্জিনের শব্দ। ফিরে তাকিয়ে দেখল, গেট দিয়ে ঢুকছে একটা বড় লরি। পাথর নিয়ে এসেছে।

এগিয়ে গেল কিশোর।

জানালা দিয়ে হাত বের করে একটা ইনভয়েস কিশোরের হাতে ধরিয়ে দিল ড্রাইভার। 'কিশোর পাশা?'

'হ্যাঁ।'

'আর কেউ নেই বাড়িতে? তোমার বাবা? মা?' বাড়ির চত্বরে চোখ বোলাল লোকটা। দোতলার জানালার দিকে তাকাল।

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'অসুবিধে নেই। কি কি করতে হবে বলে গেছে আমাকে। আমিই পারব।'

আস্তে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'কোথায় ঢালব?'

গ্যারেজটা দেখাল কিশোর।

লরি ঘোরাতে শুরু করল লোকটা। বড় গাড়ি। গ্যারেজের সামনে ঘোরানোর জায়গা নেই। এখানেই ঘুরিয়ে পিছিয়ে যেতে হবে। দুই পাশে জঞ্জাল। মাঝখানে রাস্তা সরু। কিশোরকে বলল, গ্যারেজের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। পিছানোর সময় নির্দেশ দিতে হবে।

বড় দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল কিশোর।

পিছিয়ে আসতে শুরু করল ট্রাক।

'আসুন···আসুন···আস্তে···আরও আস্তে!' নির্দেশ দিতে থাকল সে। 'থামুন!'

কিন্তু থামল না ড্রাইভার। ব্রেক কষার বদলে এঞ্জিনের শব্দ বেড়ে গেল। দ্রুত পিছিয়ে আসতে লাগল ট্রাক। বোধহয় শুনতে পায়নি কিশোরের কথা।

আরও জোরে চিৎকার করে উঠল সে, 'থামুন! থামুন!' গ্যারেজের দরজার গায়ে পিঠ চেপে ধরল।

কিন্তু আসতেই থাকল ট্রাকটা। এগজস্টের ধোঁয়ায় দম আটকে এল তার। এঞ্জিনের গোঁ গোঁ শব্দ কানে বোমা ফাটাচ্ছে।

দরজায় ধাক্কা দিতে আসছে দানবটা। ক্ষণিকের জন্যে মগজ, হাত-পা সব অসাড় হয়ে আসতে চাইল। এগজস্টের গরম ধোঁয়ায় যেন নরকের আগুনের উত্তাপ। যে কোন মুহূর্তে চাপ দিয়ে ভর্তা করে দেবে ওকে। একপাশে জঞ্জালের স্তূপ, বেড়া হয়ে আছে। আরেক পাশে সামান্য ফাঁক। ডাইভ দিয়ে পড়তে গিয়ে কিসে যেন আটকে গেল শার্টের কানা। টানাটানি করে ছোটানোর চেষ্টা করতে লাগল। প্রায় গায়ে লেগে গেছে ট্রাকের পেছনটা। মাঝের ফাঁক এত কম, নড়াচড়া করে যে শার্টটা ছোটাবে, সে-জায়গাও নেই। অসহায় আতঙ্কে চোখ বন্ধ করে ফেলল সে।

তারপর অলৌকিক ঘটনার মতই কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গেল গ্যারেজের দরজা। উঠতেই থাকল। ডনের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা গেল,

কথা বলে না। মিথ্যে বলে না।

'তাহলে মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসেছিল,' বলল কিশোর। কিন্তু এট বিশ্বাস করতে পারল না। লোকটা মাতালের মত কথা বলেনি। যেভাবে ক জিজ্ঞেস করেছে, ইনভয়েস বের করে দিয়েছে–সামান্যতম হাত কাঁপে তাতে পরিষ্কার বোঝা গেছে টনটনে হুঁশ ছিল ওর।

'পুলিশকে ফোন করো। দাঁড়াও, আমিই করছি,' সেটটা টেনে নিল ড 'তোমাকে খুন করতে চেয়েছিল শয়তানটা।'

'না, রাখো,' বাধা দিল কিশোর। 'ভাবা দরকার। এ কাজ কেন কর চাইবে সে?'

চোখ গোল গোল করে তাকিয়ে রইল ডন। জবাব দিতে পারল না সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা আসছে না মাথায়। কেন অচেনা একটা লো এসে–যাকে কখনও দেখেইনি কিশোর, ওকে খুন করতে চাইবে? পু ব্যাপারটাই কেমন অবিশ্বাস্য।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভাবতে দাও! কোথাও দেখেছি আমি ওকে,' এক পাশে ঠোঁট কামড়ে ধরে কিশোরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগল ডন। আচমব চেঁচিয়ে উঠল, 'কোথায় দেখেছি...ওর শার্টে আঁকা মড়ার খুলি!...মনে পড়েছে কোথায় দেখেছি!'

'কোথায়, ডন?' অস্থির হয়ে জানতে চাইল কিশোর, 'কোনখানে দেখেছ?

'আজ সকালে। সুপার মার্কেটের সামনে। বড়শি আর মাছের খাবা কিনতে গিয়েছিলাম।...একদম ঠিক! কোন ভুল নেই!' তুড়ি বাজাল ডন 'ওকেই দেখেছি...শার্টের সামনে মড়ার খুলি আঁকা। ওই ছবিটার জন্যেই মনে পড়েছে।'

'কি করছিল ওখানে?' জানতে চাইল কিশোর।

'ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা ছেলের সঙ্গে কথা বলছিল। তোমাদের চেয়ে বড় হবে ছেলেটা।'

'কি কথা? ছেলেটা দেখতে কেমন?'

'কি কথা শুনিনি। ছেলেটা লম্বা। কালো চুল। পরনের কাপড়গুলোও সব কালো।'

বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে কিশোরের। এককোণে ফেলে রাখা খবরের কাগজের স্তূপ ঘেঁটে একটা পত্রিকা বের করে আনল। অনিকের ছবি ছাপা হয়েছিল তাতে। ছবিটার ওপর আঙুল রেখে ডনকে জিজ্ঞেস করল, 'একে কথা বলতে দেখেছ ড্রাইভারের সঙ্গে?'

'হ্যাঁ, এই তো!' চেঁচিয়ে উঠল ডন। নিচের নামটা পড়ল জোরে জোরে, 'অনিক ম্যাকডোনাল্ড।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়ল কিশোর। তারমানে অনিকই তাকে খুনের পরিকল্পনা করেছিল। কি সাংঘাতিক! নিশ্চয় ট্রাক ড্রাইভারকে টাকা খাইয়ে রাজি করিয়েছে এ কাজ করার জন্যে।

'আই, শুনছ?' বাইরে থেকে ডাক শোনা গেল।

চমকে গেল কিশোর। 'কে?' লাফ দিয়ে উঠে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বারান্দায়। তার পেছন পেছন ডনও বেরোল।

ঠিকাদার এসেছে। জিজ্ঞেস করল, 'পাথর দিয়ে গেছে?'

ডনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো কিশোরের। ঠিকাদারের দিকে ফিরল আবার। তাকিয়ে রইল বোকার মত।

'ও, দেয়নি! এগুলো তো কথা রাখছে না!' গজগজ করতে করতে পকেট থেকে টেলিফোন বের করল ঠিকাদার। বোতাম টিপে কানে ঠেকাল। 'কে?...ও। তোমাদের মালিক কোথায়?...দাও!' এক সেকেন্ড চুপ থেকে বলল, 'আপনি। আমার পাথর কোথায়? তাড়াতাড়ি না দিতে বলেছিলাম? ...আরে, সাহেব, পেলে কি আর ফোন করতাম!...না, আসেনি!...আরে না না, বললাম তো, আসেনি!...জলদি খোঁজ নিন। যত্তসব!'

রাগ দেখিয়ে লাইন কেটে দিল সে।

ট্রাকটা আসার কথা ওকে কিছু বলল না কিশোর। অপেক্ষা করতে লাগল। কয়েক মিনিট পরেই একটা ট্রাককে ঢুকতে দেখা গেল। সেই ট্রাকটাই, একটু আগে যেটা এসেছিল।

কৌতূহলী হয়ে বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে গেল কিশোর। সঙ্গে ডন।

ট্রাকের সামনে চলে গেছে ততক্ষণে ঠিকাদার। ধমক দিয়ে জিজ্ঞেস করল ড্রাইভারকে, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে? এইমাত্র তোমার বসকে ফোন করলাম।'

ডন আর কিশোর দেখছে ড্রাইভারকে। আগের লোকটার চেয়ে বয়েস কম এর, তরুণ। মাথাভর্তি চুল। গায়ে চেক শার্ট। বুকের কাছে মড়ার খুলি বা অন্য কোন ছবি নেই।

'গলাটা শুকিয়ে গিয়েছিল,' লজ্জিত কণ্ঠে ঠিকাদারের কথার জবাব দিল ড্রাইভার। 'সুপার মার্কেটের সামনে নেমে গলাটা একটু ভেজাতে ঢুকেছিলাম।'

'উদ্ধার করে দিয়েছ আমাকে! তারপর?'

'সবে গেলাসে চুমুক দিয়েছি, আমার এক দোস্ত এসে সহানুভূতি দেখিয়ে বলল, আমার ডিউটিটা সে করে দিতে চায়। শান্তিতে কয়েকটা চুমুক দিতে পারব ভেবে রাজি হয়ে গেলাম। বসে বসে আরামসে চুমুক দিতে লাগলাম। কিন্তু ঘণ্টা দেড়েক পর ফিরে এসে যখন জানাল, কাজটা করতে পারেনি, একটা অঘটন ঘটিয়ে এসেছে, কপাল চাপড়ানো ছাড়া আর কি করব! কি ঘটেছিল জিজ্ঞেস করলাম। বলল, জায়গাটা ঠিকই খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু ওখানে কাউকে দেখতে পায়নি। একা একা পিছাতে গিয়ে গ্যারেজের দরজায় লাগিয়ে দরজা ভেঙে ফেলেছে। ভয়ে শেষে পাথর ফেলা বাদ দিয়েই সমস্ত মাল নিয়ে ছুটে পালিয়েছে। গিয়ে হাজির হয়েছে আমার কাছে। কি আর করব...'

দরজার কতটা ক্ষতি হয়েছে ঠিকাদারের সঙ্গে দেখতে চলল ড্রাইভার। বকেই চলল ঠিকাদার। দরজা মেরামতের টাকাটা এখন কে দেবে সেটা নিয়ে শুরু হলো তর্ক।

ভাবছে কিশোর। একটা কথা সত্যি বলছে আগের ড্রাইভার–আতঙ্কিত হয়েই পালিয়েছে। খুনের চেষ্টা করেছিল। ব্যর্থ হয়ে আর একটা মুহূর্ত থাকতে

সাহস পায়নি। লেজ তুলে ভোঁ দৌড় যাকে বলে, তাই দিয়েছে। বন্ধুকে গিয়ে গ্যারেজের দরজা ভাঙার কথা ঠিকই বলেছে। কেবল বলেনি খুনের চেষ্টার কথাটা। আরও একটা মিথ্যে কথা বলেছে, এখানে কাউকে দেখেনি।

বারো

'দরজাটায় কি হয়েছিল?' পরদিন সকালে জানতে চাইলেন মেরিচাচী। অনেক রাতে স্বামীর সঙ্গে ফিরেছেন। কিশোরের সঙ্গে দেখা হয়নি।

'ট্রাকে গুঁতো মেরেছিল,' জানাল কিশোর। 'পাথর দিতে এসেছিল। আমাকে বলল পেছনে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিতে। ব্যাটা কানে বোধহয় কম শোনে।' সত্যি কথাটা আপাতত চেপে গেল সে। পুরো রহস্যটা ভেদ করার আগে, আসল সত্যটা জানার আগে বলবে না। তাকে খুন করতে চেয়েছিল ড্রাইভার, একথা শুনলে আর তদন্ত করতে দেবেন না চাচী। বাড়ি থেকেই হয়তো বেরোতে দেবেন না কিছুদিন। 'থামতে বললাম, থামেনি। দিল গুঁতো মেরে। তারপর পাথর না রেখেই ভয়ে পালাল। পরে আরেক ড্রাইভার এসে দিয়ে গেছে।'

'কন্ট্রাকটার দেখে গেছে?'

'গেছে।'

'কি বলল? দরজা মেরামতের খরচটা দেবে কে?'

'যাদের কাছ থেকে মাল কেনা হয়েছে তারাই। ঠিকাদার তো খুব ধমকাল ড্রাইভারকে। ওর মালিকের সঙ্গেও কথা বলেছে। ড্রাইভারের বেতন থেকেই টাকাটা কেটে নেবে হয়তো।'

'যার কাছ থেকে খুশি কাটুক। আমাদের দরজা মেরামত হওয়া দিয়ে কথা...'

★

'অল্পের জন্যে বাঁচলাম,' মুসা আর রবিনকে বলল কিশোর। আইস রিংকে ববির সঙ্গে দেখা করতে চলেছে ওরা।

'হুঁ, রহস্যটা ক্রমেই জটিল হচ্ছে,' মুসা বলল। ট্রাফিক পোস্টে সবুজ বাতি জ্বলার অপেক্ষা করছে। 'ওই খুনী ড্রাইভারটা কে? কোত্থেকে এসে উদয় হলো?'

'অনিক ম্যাকডোনাল্ডের অসৎ দোস্তদের কেউ হবে। ববির মা বলল না, দুনিয়ার যত শয়তান লোকের সঙ্গে ওর খাতির। ওই ড্রাইভারটাও ওদের দলেরই একজন।'

সবুজ বাতি জ্বলল। তাড়াহুড়ো করে পা বাড়াতে গিয়ে 'আউফ্' করে উঠল মুসা। আগের দিন দেয়াল থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে মচকে ফেলেছে। 'আমাকে দিয়ে আজ আর স্কেইটিং হলো না।'

'না পারলে আর কি, দাঁড়িয়ে থাকবে,' রবিন বলল। 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করা দরকার। দেরি হয়ে যাবে নইলে। ববিকে পাব না।'

রাস্তা পেরিয়ে বাস স্টপেজে এসে দাঁড়াল ওরা। বিড দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওরা কোথায় যাচ্ছে শুনে বলল, 'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে। কোন কাজকর্ম নেই। বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না।'

কিশোর বলল, 'অসুবিধে নেই। চলো।'

বাস এল। দোতলা বাস। ওপরের ডেকে উঠে বসল ওরা।

শহর থেকে বেরিয়ে এল বাস। পাশাপাশি বসেছে রবিন আর বিড। বিডকে ববির কথা সব বলছে রবিন।

মুসা কথা বলছে কিশোরের সঙ্গে। 'কিশোর, কাল তো চেষ্টা করেও পারল না অনিক, আইস-রিংকে আজও কিছু ঘটাবে না তো?'

'কি করে জানবে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'তা ঠিক। কিন্তু কোন কারণে যদি ববিকে সন্দেহ করে? কাল রবিনের সঙ্গে কথা বলতে দেখে থাকে? পিছু নিতে পারে।'

'তা পারে। সাবধান থাকতে হবে আর কি আমাদের।'

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। শহরের বাইরের একটা স্টপেজে থামল বাস। রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছে মেইন রোডের ওপারে টিপটিপ করে জ্বলছে-নিভছে আইস-রিংকের নিওন সাইন। ঘনায়মান গোধূলিতে উজ্জ্বল লাগছে আলোটা। একটা বিশাল বাড়ির সামনের অংশ পুরোটাই কাঁচ দিয়ে তৈরি। সিঁড়ি উঠে গেছে বাড়িটার গ্রাউন্ড ফ্লোরের বারান্দায়। গেটের কাছে জটলা করছে একদল ছেলেমেয়ে।

বাস থেকে নামল ওরা। রাস্তা পেরোতে যেতে বাধা দিল বিড, 'দাঁড়াও। যা ভিড়। কমুক।'

সামনে পা বাড়াতে যাচ্ছিল কিশোর, বিডের কথায় থেমে গেল। আর ঠিক সেই সময় কালো বড় একটা গাড়ি তীব্র গতিতে চলে গেল একেবারে তার সামনে দিয়ে। রাস্তা পেরোতে গেলেই চাপা পড়ত কিশোর। ভীষণ চমকে যেন ধাক্কা খেয়ে পিছিয়ে এল সে। খপ করে চেপে ধরল মুসার হাত, 'ওই যে, গেল!'

'কে?'

'অনিক ম্যাকডোনাল্ড!'

গাড়িটার টেল লাইট মোড়ের কাছে গিয়ে দপ করে জ্বলে উঠল। পরক্ষণে মোড় নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা।

'ঠিক দেখেছ?'

'হ্যাঁ। ওটা ওর নতুন গাড়ি। ভেতরে সেই কুস্তিগিরটাকেও দেখলাম, কফি শপে যাকে দেখেছিলাম।'

'ও তোমাকে দেখেছে?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'মনে তো হলো। কিন্তু শোনো, আরও একজনকে দেখলাম গাড়িতে, তৃতীয় কেউ, পেছনে বসে আছে...'

'এসো এবার পেরোই,' বিড বলল। 'খালি হয়েছে।'

রাস্তা পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ মনে পড়ল কিশোরের। উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'পেছনে বসে থাকা লোকটা কে জানো? সেই বেয়াদব ড্রাইভারটা! ওদের কাপড়-চোপড় দেখে তো মনে হলো কোন নাইটক্লাবে আড্ডা দিতে যাচ্ছে। যেখানেই যাক, ড্রাইভারটাই বসে আছে পেছনে, কোন সন্দেহ নেই।'

'দাঁড়াও, দেখি, কোন কথা বের করতে পারি কিনা?' সিঁড়ির মাথায় অন্য দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা ববিকে দেখিয়ে বলল রবিন। আস্তাবলে যে পোশাক পরে কাজ করছিল, সেগুলো পরেই চলে এসেছে। ওগুলো ছাড়া যেন আর কোন পোশাক নেই ওর।

আগে আগে ওপরে উঠে গেল রবিন। হাত তুলে ডাকল, 'হাই, ববি!' কাছে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল, 'ববি, এ হলো বিড। আমার বন্ধু। বাস স্টপেজে দেখা, আর ছাড়তে চাইল না। চলে এল সঙ্গে...বিড, ও ববি জিনজার। আমার সঙ্গে নতুন পরিচয় হয়েছে। ওর দাওয়াতেই আজ স্কেইটিং করতে এসেছি।'

মুসা আর কিশোর পিছিয়ে রয়েছে। আসছে না। সবাই একসঙ্গে গেলে সন্দেহ করতে পারে ববি। রবিনকেই কাজ সারার দায়িত্ব দিয়ে সরে রয়েছে ওরা।

'হাই', 'কেমন আছ', এ সব কথা আর হাত মেলানো শেষ করে রবিনকে বলল ববি, 'তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি। চলো, ঢুকে পড়ি।'

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'ববি, অনিক কি নতুন গাড়িটা কিনেছে?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে।'

'হাই, রবিন!' পেছন থেকে ডাক শোনা গেল।

ফিরে তাকাল রবিন। বিড আর ববিও দাঁড়িয়ে গেল।

হাত নাড়তে নাড়তে এগিয়ে আসছে কিশোর। সঙ্গে মুসা। কাছে এসে কিশোর বলল, 'তোমরা? স্কেইটিং করতে এলে নাকি?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল রবিন।

হাত বাড়িয়ে দিল কিশোর, 'ববি, কেমন আছ?'

কিশোরের হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল ববি। গতকালই পরিচয় হয়েছে।

কিশোরকে বলল রবিন, 'শুনেছ, অনিক নাকি আরেকটা গাড়ি কিনে ফেলেছে।'

'তাই নাকি? কবে? কখন?'

'এই তো, আজই,' ববি বলল। 'বিকেল বেলা এক লোক এসে রেখে গেল গাড়িটা।'

'লোক? চেনো না নাকি? কে সে?'

'হবে অনিকের কোন দোস্ত।'

'লোকটার কি মাথায় টাক আছে? বাঁ হাতে টাট্টু আঁকা?'

অবাক হলো ববি, 'তুমি জানলে কি করে?'

জবাব না দিয়ে মুসার দিকে তাকাল কিশোর, 'বলেছি না, অনিককেই দেখেছি আমি। তুমি তো বিশ্বাসই করতে চাইলে না। পেছনে বসা লোকটা...'

'ঠিকই দেখেছ তুমি। পেছনে বসা ওই লোকটাই এনে রেখে গিয়েছিল গাড়িটা।'

সবাই একসঙ্গে ভেতরে ঢুকল ওরা। একজোড়া করে আইস স্কেইটস তুলে নিয়ে এগোল বিশাল রিংকটার দিকে।

বিড আর রবিন স্কেইট পায়ে বেঁধে নিয়ে নেমে পড়ল। পিছলে নয়, যেন উড়তে শুরু করল রিংকের ওপর দিয়ে। ওদের অনুসরণ করল কিশোর। তবে অতটা গতি নেই তার। মাথায় ভাবনা নিয়ে স্কেইটিং ভাল করা যায়ও না। অনিকের বন্ধু ওই টেকো ড্রাইভারটা আসলে কে? এই রহস্যের মধ্যে তার কি ভূমিকা? এ সব ভাবনা ভারী করে রেখেছে কিশোরের মগজ।

মুসার পায়ে ব্যথা থাকায় স্কেইটিঙে নামতে পারছে না। ববির সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছে।

ববি জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে না?'

'আমার পায়ে ব্যথা।'

'বেশি? খোঁড়াতে তো দেখলাম না।'

'না, অত বেশি না...'

'তাহলে কিছু হবে না। এসো,' মুসার হাত ধরে টান দিল ববি।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কেবল ববির চাপাচাপিতে নামতে বাধ্য হলো মুসা। হাঁটার সময় অতটা না লাগলেও স্কেইটিং করার সময় চাপ লেগে সাংঘাতিক ব্যথা লাগল। কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল ববি। খাড়া থাকতে সাহায্য করল। ওদের ঘিরে সাঁই সাঁই করে ঘুরে চলে গেল রবিন, কিশোর আর বিড।

আরও কিছুক্ষণ চেষ্টার পরও যখন পারল না মুসা, বলল, 'তোমরা করো। আমি পারছি না।'

মুসা একা থাকবে, তাই ববিও রিংক থেকে বেরিয়ে এল ওর সঙ্গে সঙ্গে। নিঃসঙ্গ জীবনে ওদের মত বন্ধু পেয়ে খুব ভাল লাগছে তার। 'চলো কাফেতে গিয়ে বসি। আমিই খাওয়াব।'

টেবিলে মুখোমুখি বসল দুজনে। কোক আর হটডগ আনতে বলল ববি। চুপ তো আর থাকা যায় না, একটা কিছু বলতে হয়। মুসা বলল, 'তোমার মালিকের ছেলের কথা বলো।'

'ওর ব্যাপারে এত আগ্রহ কেন তোমাদের?'

'স্বাভাবিক কৌতূহল। বড়লোকের ছেলে, ওরকম অ্যাক্সিডেন্ট করল...কৌতূহল হতেই পারে, তাই না?'

চুপ করে মুসার দিকে তাকিয়ে আছে ববি। চোখ দেখেই বোঝা যায় চিন্তা করছে।

'আজকের কথাই বলো,' চুপ থাকতে ভাল লাগছে না মুসার। 'আজ সারাদিন কি করেছে অনিক? নতুন গাড়িটা নিয়ে খুশি?'

'ওকে তো দুনিয়ার কোন কিছুই খুশি করতে পারে না। আর গাড়ি পেয়ে

তো খুশি হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। নষ্টই করেছিল টাকার জন্যে। বুড়োর চাপে আবার কিনতে বাধ্য হয়েছে।' এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল ববি, 'তবে টাকার ক্ষমতা যে কি, না দেখলে বিশ্বাস হবে না। যেন সেই আগের গাড়িটাই নিয়ে এসেছে। সেই রঙ, সেই চেহারা, সেই একই বছরের তৈরি, চাকার খাঁজ; আর, মিটারে দশ হাজার মাইল রীডিং! টাকা দিলে যে বাঘের দুধ মেলে এটাই তার প্রমাণ।'

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড খুশি?' জানালা দিয়ে দেখছে মুসা, নিচে নিঃশব্দে যেন ভেসে চলেছে স্কেইটাররা।

'নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরেননি এখনও তিনি।'

'অ। তা এত তাড়াতাড়ি গাড়িটা ডেলিভারি দিয়ে গেল কি করে?'

'কি জানি! ওর এক বন্ধুর বন্ধু নাকি সাহায্য করেছে। মোট কথা তাড়াতাড়ি কাজ কিভাবে উদ্ধার করতে হয়, ভালই জানা আছে অনিকের।' মুসার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল ববি। 'শয়তান! বন্ধুও জুটিয়েছে কতগুলো ইতর! গাড়ি দিয়ে গেল যেই টেকোটা, তাকে তো মনে হলো একটা ধাড়ি ইবলিস।'

'তোমার সঙ্গে খুব দুর্ব্যবহার করে, তাই না?' সহানুভূতির সুরে বলল মুসা।

'আমার সঙ্গে অতটা পারে না। সবচেয়ে বেশি করে এনিডের সঙ্গে–মিস কফার। বুড়োটা বাইরে থাকলে অতিরিক্ত করে।'

'কি করে?'

'আর কি? ধমকাধমকি করে, টাকা চায়। না দিলে খেপে গিয়ে বকাবকি করতে থাকে। কখনও কখনও তো ভয়ানক হয়ে ওঠে।'

'না দিয়ে পার পায় মিস কফার?'

'দেবে কোত্থেকে? মাসের সংসার খরচের টাকা থাকে ওর কাছে, আর কর্মচারীদের বেতনের টাকা। ওখান থেকে কি করে দেবে? অনিককে দিয়ে টাকায় টান পড়ে-গেলে বুড়ো ম্যাকডোনাল্ডের কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'খেপে গিয়ে কি করে অনিক?'

'অফিসে তালা দিয়ে আটকে রাখে মিস কফারকে। গালাগাল করে। ওর অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্যে অনেক সময় নিজের বেতনের থেকে টাকা দিয়েছে এনিড। শুনে এত রাগ হয় না আমার!...আজও এই কাণ্ড করেছে অনিক!'

রাগ কমানোর জন্যেই যেন মুসার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল ববি। জানালা দিয়ে স্কেইটারদের দেখতে লাগল। 'রবিন খুব ভাল স্কেইট করে তো।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

হঠাৎ খেয়াল করল, স্কেইটারদের মাঝে কিশোরকে দেখা যাচ্ছে না। আরও ভালমত দেখার জন্যে উঠে এসে দাঁড়াল কাঁচের দেয়ালের সামনে। কিন্তু দেখতে পেল না কিশোরকে।

পাশে এসে দাঁড়াল ববি। 'কাউকে খুঁজছ?'

'কিশোর…'

'ওই তো,' হাত তুলে দেখাল ববি।

স্কেইটারদের জটলা থেকে দূরে সরে গেছে কিশোর। ভাল পারে না বলেই বোধহয়। সবার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। তাই একধারে গিয়ে প্র্যাকটিস করছে। দুটো ছেলে তীব্র গতিতে ছুটে যাচ্ছে তার দিকে, দেখতে পায়নি সে।

'কিশোর, সরে যাও!' কাঁচের দেয়ালে থাবা দিতে দিতে চিৎকার করে উঠল মুসা।

ওপরে তাকাল না কিশোর। দুদিক থেকে ছুটে যাচ্ছে ছেলে দুটো।

কিছু করার নেই মুসা বা ববির। অসহায় হয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া। চিৎকার করলে শুনতে পাবে না কিশোর। নেমে গিয়ে ওকে সাহায্য করতে করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। দিশেহারা হয়ে পড়ল মুসা। কিছু একটা করার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল।

হঠাৎ রবিনেরও চোখে পড়ে গেল ব্যাপারটা। তীরগতিতে ছুটল। কিশোরের কাছে পৌঁছে হাত চেপে ধরে একটানে সরিয়ে নিয়ে এল।

ছেলে দুটো পৌঁছাল গিয়ে এক সেকেন্ড পর। যাকে ধাক্কা দিতে চেয়েছিল, তাকে না পেয়ে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল দুদিকে। ঝাঁকুনি লেগে বরফে কেটে বসে গেল ওদের স্কেইট। বেকায়দা ভঙ্গিতে মোচড় লাগল গোড়ালিতে। ব্যারিয়ারে ঠুকে গেল মাথা। ততক্ষণে কিশোরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে এসেছে রবিন।

বিডও দেখে ফেলেছে ঘটনাটা। তাকিয়ে আছে ছেলে দুটোর দিকে। ঘোরের মধ্যে যেন উঠে দাঁড়াচ্ছে ওরা। চারপাশ থেকে হুড়াহুড়ি করে ছুটে এল অন্য স্কেইটাররা। অ্যাটেনড্যান্ট দৌড়ে এল। জটলা করতে দিল না ওদেরকে। ধাক্কা দিতে চেয়েছিল যে ছেলে দুটো, বিড়বিড় করতে করতে সরে গেল রিমের অন্ধকার কিনারায়।

চমকের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে কিশোর বলল, 'গাধা দুটো কে?'

মাথা নেড়ে রবিন বলল, 'জানি না।'

'রবিন, তোমার কি মনে হয়…' কথাটা শেষ করল না কিশোর। তার মনে হতে লাগল, ইচ্ছে করে ধাক্কা দিতে এসেছিল ছেলে দুটো। অনিকই ওদের লাগিয়েছে। তারমানে আরেকবার দুর্ঘটনা থেকে অল্পের জন্যে বেঁচে গেল।

কিশোর কি বলতে চেয়েছে, বুঝতে পারল রবিন। 'উঁহু, আমার তা মনে হয় না…এটা স্রেফ দুর্ঘটনাই ছিল।'

মুখ উঁচু করে দম ছাড়ল কিশোর। কেটলির বাষ্পের মত একঝলক হালকা ধোঁয়া উড়ে গেল ওপর দিকে। 'তোমার মনে হচ্ছে না বটে, কিন্তু…'

ববি আর মুসাও নেমে এসেছে।

'ইচ্ছে করে ধাক্কা দিতে গিয়েছিল ওরা তোমাকে,' ববি বলল। 'কারণটা বুঝলাম না। কার সঙ্গে তোমাদের শত্রুতা?'

মুসা কিছু বলল না। রবিন আর কিশোরও চুপ। নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে তিনজনে।

ববির কথা শুনে কোন সন্দেহ রইল না আর কিশোরের, অনিকই পাঠিয়েছিল ওদের। আরেকটা দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্যে।

তেরো

'অহেতুক এই বিপদে মাথা গলিয়েছ তোমরা,' পার্কের ভেতর দিয়ে সাইকেল চালাতে চালাতে বলল ববি।

বিডের আমন্ত্রণে ক্রিকেট খেলা দেখতে চলেছে তিন গোয়েন্দা। বাস্কেটবলের সঙ্গে সঙ্গে ইদানীং ক্রিকেটের দিকেও ঝুঁকেছে বিড। ববিকেও দাওয়াত দিয়েছে। রোববার। ছুটি। সুতরাং ববিরও আসতে অসুবিধে হয়নি।

পাশ থেকে লাফ দিয়ে রবিনের সাইকেলের সামনে এসে পড়ল একটা ছোট কুকুর। সাঁই করে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে কোনমতে বাঁচাল ওটাকে রবিন। ঘাউ ঘাউ শুরু করে দিল কুকুরটা।

ববির পাশে থেকে সাইকেল চালাতে চালাতে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মুসা জবাব দিল, 'বিপদে আমরা মাথা গলাই না, বিপদই আমাদের মাথা গলাতে বাধ্য করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, কিশোর পাশাকে খুঁজে বের করে।'

'তা নাহয় বুঝলাম,' ববি বলল। 'কিন্তু বুঝতে যখন পারছ বিপদ, সরে থাকলেই হয়। অনিক একটা ধাড়ি শয়তান, সেটা তো জানাই হয়ে গেছে তোমাদের। নিজের গাড়ি নষ্ট করে দিয়ে বীমা কোম্পানি থেকে টাকা খসাতে চেয়েছে। কিশোর সেটা জেনে ফেলাতে আক্রোশে তার ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে, মেরে ফেলতেও পিছপা নয়। এ কাজের জন্যে লোক ভাড়া করেছে। এত বিপজ্জনক একটা মানুষের কাছ থেকে সরে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।'

পাথরের একটা ফুটব্রিজ পড়ল সামনে। ব্রেক কষল কিশোর। ফিরে তাকাল ববির দিকে, 'তোমার পরামর্শের জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু কেন এ সব করছে অনিক, সেই রহস্যের এখনও সমাধান হয়নি। সেটা না করা পর্যন্ত সরার ইচ্ছে আমার অন্তত নেই।'

আর কিছু বলল না ববি।

চমৎকার রোদ। মাঠের কাছে চলে এসেছে ওরা। ক্রিকেট পিচ থেকে শোনা যাচ্ছে কাঠের ব্যাটে শক্ত বল বাড়ি খাওয়ার শব্দ। চা আর কফি বিক্রি করছে ফেরিওয়ালারা। বাতাসে তার সুগন্ধ। বছরের এ সময়টায় যেন স্বর্গ হয়ে ওঠে রকি বীচ।

খেলা শুরু হয়ে গেছে। মাঠের কিনারের দিকে দেখা গেল বিডকে। খেলার সাদা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছে। ফিল্ডিং করছে ওদের টীম। ওদের দেখে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে জোরে জোরে হাত নাড়ল।

হাত নেড়ে জবাব দিল রবিন।

তারের বেড়ায় সাইকেলগুলো ঠেস দিয়ে রাখল তিন গোয়েন্দা। ববি তারটা স্ট্যান্ডে তুলে রাখল। তারপর খেলা দেখতে বসল পাশাপাশি।

আবার আগের প্রসঙ্গ টেনে আনল ববি। 'তোমাদের ভালর জন্যেই বলছিলাম, বুঝলে।'

'অনেক ধন্যবাদ তোমাকে,' হেসে জবাব দিল কিশোর। 'কিন্তু আমরা কচিখোকা নই। গোয়েন্দাগিরিও নতুন করছি না।' ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে দিল সে। 'আমাদের নিয়ে ভেবো না।'

'কিন্তু কাজটা কতখানি বিপজ্জনক, বুঝতে পারছ না তোমরা!' উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে ওকে।

'জানি, বিপজ্জনক।'

'না, জানো না। অনিককে তোমরা চেনো না। এই বয়েসেই ও যে কতখানি ইবলিস হয়ে গেছে, কল্পনাও করতে পারবে না। ইবলিস অবশ্য সব সময়ই ইবলিস, বয়েসে কিছু এসে যায় না।'

মাঠে চিৎকার করে উঠল খেলোয়াড়রা। দর্শকরাও চিৎকার শুরু করল। হাততালি দিতে লাগল। ক্যাচ ধরে একজন ব্যাটসম্যানকে আউট করে দিয়েছে বিড।

মুসাও লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিডের নাম ধরে চিৎকার করতে লাগল। হাততালি দিল। তারপর বসে পড়ল আবার।

হট্টগোল কমে এলে কিশোর বলল ববিকে, 'তুমি বরং আমাদের উপকার করতে পারো একটা। করবে?'

মাঠের দিক থেকে মুখ ফেরাল ববি। 'কি?'

'এনিডকে আমাদের সাহায্য করতে বলবে?'

গুঙিয়ে উঠল ববি। 'আমি বলছি তোমাদের সরে দাঁড়াতে, আর তোমরা আরও নাক গলাচ্ছ...'

'বলবে কিনা বলো? আমার মনে হচ্ছে এ রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে এনিডের কাছে।'

'আমি বরং তোমাদের বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে সাহায্য করতে পারি, বিপদের মধ্যে ঢোকার জন্যে নয়!'

কোন অনুরোধেই কাজ হবে না বুঝে চুপ হয়ে গেল কিশোর।

খেলোয়াড়দের চা খাওয়ার বিরতি হলো। বিডের সঙ্গে কথা বলতে উঠে গেল ববি।

'তুমি কি সত্যি বিশ্বাস করো,' রবিন বলল, 'এ রহস্যের চাবিকাঠি রয়েছে এনিডের হাতে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল কিশোর।

'কিন্তু ববি তো আমাদের সাহায্য করবে না। স্পষ্টই বলে দিল।'

'আমাদের ভাল চাইছে সে।'

'তাই কি?' নিশ্চিত হতে পারছে না রবিন। অনিকের এত বদনাম করছে

কেন ববি আর তার মা? কোন স্বার্থ নেই তো?

'ওর কথা থেকে তো সেটাই বোঝা যাচ্ছে,' ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'তবে, এনিডকে বলার সঙ্গে সঙ্গে যে আমাদের দলে চলে আসবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

'তা তো আসবেই,' মাথা দোলাল রবিন। 'অনিকের শয়তানি ফাঁস করে দিতে পারলে জেলে যেতে হবে ওকে। পথের কাঁটা দূর হবে। বুড়ো ম্যাকডোনাল্ডকে বিয়ে করাটা তখন সহজ হয়ে যাবে এনিডের জন্যে। বাধা দেয়ার আর কেউ থাকবে না।'

মুসাও একমত হলো এ ব্যাপারে। 'পুরো বাড়িটাই তখন ওর দখলে চলে আসবে। এখন আছে সেক্রেটারি, তখন হয়ে যাবে মালকিন। ও বাড়িতে থেকে এরচেয়ে ভাল তার জন্যে আর কি হতে পারে?'

'সুতরাং,' হাসিমুখে বলল কিশোর, 'আমাদের সাহায্য করার জন্যে ওকে রাজি করাতে বেগ পেতে হবে না।'

আলোচনায় ঠিক হলো, ববি যদি এনিডকে অনুরোধ করতে কোনমতেই রাজি না হয়, এনিডের সঙ্গে ওরাই সরাসরি কথা বলবে।

আবার শুরু হলো খেলা।

ববি ফিরে এসে বসেছে আগের জায়গায়। মাঠের দিক থেকে চোখই সরাচ্ছে না। মুসা আর রবিনও খেলা দেখছে। দেখছে না কেবল কিশোর। চোখ মাঠের দিকে, কিন্তু মগজে অন্য ভাবনা। এনিড কফারকে কোনমতেই সরাতে পারছে না মন থেকে।

★

'হয়ে গেছে কাজ!' খেলার শেষে হাসিমুখে দুই সহকারীকে খবরটা জানাল কিশোর। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে। 'ফোন করে এলাম। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে এনিড।'

'হয়েছে!' বিশ্বাস করতে পারছে না মুসা। 'হলো তাহলে। বাড়িতেই করলে নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'যদি অনিক ধরত?'

'ধরে তো নি। আর কি হত ধরলে? রেখে দিতাম।'

'কি জন্যে দেখা করতে চাও, বলেছ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'বলেছি নোটবুকের একটা পাতা হারিয়ে ফেলেছি, সাক্ষাৎকারের মূল্যবান তথ্য লেখা ছিল ওটাতে। কি ছিল, মনেও করতে পারছি না। যদি কিছু মনে না করেন মিস কফার, কয়েকটা কথার জবাব আবার দেবেন কিনা।'

'এতেই রাজি হয়ে গেল!'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'কিন্তু মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বাড়িতে দেখা করা যাবে না আর। যে কোন সময় নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরে আসতে পারেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। বাড়িতে নিশ্চয় কোন ঝামেলা চাইবেন না। রোজ কুকুর

দুটোকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে যায় এনিড। ওখানেই কথা বলব তার সাথে।'

'কবে?'

'সম্ভব হলে আজই।'

'আজ! সময় কোথায়? যা করার বিশ মিনিটের মধ্যে করতে হবে।'

'তা-ই করব। ওঠো, দেরি করা যাবে না।'

লাফ দিয়ে উঠে সাইকেলের দিকে দৌড় দিল তিনজনে। বিড আর ববি তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ববি বলল, 'কাজটা ঠিক করছ না। আমি তোমাদের এখনও মানা করছি...'

'অহেতুক কথা বলছ, ববি,' বিড বলল। 'তুমি ওদের চেনো না, তাই মানা করছ। একবার যখন ঠিক করে ফেলেছে ওরা, কাজটা করবে, করবেই। কিশোর পাশাকে কোনমতেই ফেরাতে পারবে না আর। ও এ রহস্যের কিনারা করেই ছাড়বে।'

সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা।

তাকিয়ে আছে ববি।

পাথরের ব্রিজটার ওপাশে ওদের হারিয়ে যেতে দেখল।

চোদ্দ

ওদের আসতে দেখে হাত নাড়ল এনিড। পরনে জিনস, গায়ে হালকা নীল জ্যাকেট। এমনকি কুকুর দুটোও খুব ভাল ব্যবহার করল আজ। যখন যে মনিবের কাছে থাকে, তার কথামত চলে। ওরা সাইকেল থেকে নামতে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল স্বাগত জানানোর জন্যে। ওরা যখন এনিডের কাছে গিয়ে দাঁড়াল, খেলার ছলে ছুটতে ছুটতে চলে গেল নদীর কিনার ধরে বনের দিকে।

'তো?' হেসে বলল এনিড, 'তোমার নোট হারিয়ে ফেলেছ?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এতটা গাধামি করা মোটেও উচিত হয়নি আমার।'

'ভুল মানুষেরই হয়।'

'তবু।'

'ঠিক আছে, বলো, কি কি জানতে চাও?'

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সম্পর্কে সেই পুরানো প্রশ্ন দিয়েই শুরু করল আবার কিশোর–সাত সাতটা পত্রিকা, কি করে চালান তিনি?

কথা বলতে বলতে বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা।

রবিন বলল, 'কিশোর, তোমরা কথা বলো। আমি বনের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি। ভাল লাগছে বনটা।'

কুকুর দুটোকে পটাতে পারলে ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে ভেবে মুসা বলল, 'আমিও যাই। কুত্তা দুটোর সঙ্গে খেলে আসি।'

'তোমরা থাকায় কিন্তু অসুবিধে হচ্ছে না,' বাধা দিতে গেল এনিড।

'না, অসুবিধের জন্যে না। এমনি। খানিক দৌড়াদৌড়ি করে আসি।'

'নদীর ওদিকটায় গেলে সাবধান,' একটা সরু অংশ দেখিয়ে বলল এনিড। 'কুত্তা দুটোকে ওখানে যেতে দিয়ো না। ভীষণ স্রোত। গভীরও খুব। ওখানে টানের মধ্যে পড়লে প্রাণ নিয়ে আর উঠে আসতে হবে না।'

আনন্দে লাফাতে লাফাতে মুসার সঙ্গে চলল কুকুর দুটো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে।

সেদিকে তাকিয়ে হাসল এনিড। 'জন্তু-জানোয়ারের ভক্ত মনে হচ্ছে। ঘোড়া ভালবাসে, কুকুর পছন্দ।' কিশোরের দিকে ফিরল সে। 'হ্যাঁ, বলো...কি যেন বলছিলে?'

'দেখুন, আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত...'

'না না, আমি বিরক্ত হচ্ছি না। বলো। তোমাদের কাছেই বরং আমার মাপ চেয়ে নেয়া উচিত। সেদিন ঢুকেছিলে ঠিকমতই, বেরোনোটা মোটেও ভদ্রোচিত হয়নি। একটা জঘন্য ব্যাপার ঘটে গিয়েছিল।'

'আপনি অনিকের কুকুর লেলিয়ে দেয়ার কথা বলছেন?' মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল কিশোর। যার কথা বলার জন্যে ভূমিকা করছিল, আপনাআপনি উঠে পড়ল সেটা। 'ও বলেছে নাকি আপনাকে?'

'না, ও বলেনি। কুকুরের চিৎকার শুনে কি হলো দেখতে বেরোলাম। দেখি, পাগলের মত দৌড়াচ্ছ তোমরা। কুকুর দুটো পেছনে ছুটছে। অবাকই লাগল। তোমাদের পেছনে লাগার কোন কারণ ছিল না ওগুলোর।'

'অনিক লেলিয়ে না দিলে লাগত না।'

জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল এনিড। 'ওর এ ধরনের রসিকতাগুলো একটুও পছন্দ হয় না আমার। কি আর করা...ওর হয়ে আমি মাপ চেয়ে নিচ্ছি।'

'রসিকতা কিন্তু ওই একবারই করেনি,' কিশোর বলল। পড়ন্তবেলার রোদ যেন সোনালি আলোয় নাইয়ে দিচ্ছে সবুজ ঘাসকে। বাতাসে বুনো ফুল আর আগাছার সুবাস। ছায়া পড়তে শুরু করেছে নদীর খাড়া পাড়ে। মনে উত্তেজনা না থাকলে এ সব খুব উপভোগ করতে পারত সে। 'চারবার করেছে। কোনমতে বেঁচেছি।'

দাঁড়িয়ে গেল এনিড। 'চারবার!'

'হ্যাঁ, কুত্তা লেলিয়ে দেয়া বাদ দিলে তিনবার।' ট্রাক দিয়ে চেপে ভর্তা করে দেয়ার চেষ্টার কথা এনিডকে জানাল কিশোর। আইস রিংকে দুর্ঘটনা ঘটানোর কথা বলল। তারপর বলল, 'গাড়িটা যেদিন খাদে ফেলে ভেঙেছে, সেদিনও আরেকটু হলেই দিয়েছিল আমাকে শেষ করে। তবে সেটা ইচ্ছাকৃত কিনা,

বলতে পারব না। তাড়াহুড়োর জন্যেও হতে পারে।'

সরু হয়ে এল এনিডের চোখের পাতা। ভ্রুকুটি করল। 'পত্রিকায় পড়েছি একটা ছেলেকে ধাক্কা দিতে যাচ্ছিল। সেই ছেলেটা তাহলে তুমিই?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'আমি ওই দুর্ঘটনার সাক্ষী। গাড়িটাকে রাস্তা থেকে পড়তে দেখেছি। সাইকেল চালিয়ে যাচ্ছিলাম। ও পেছন থেকে এসে এমনভাবে পাশ দিয়ে চলে গেল, বাঁচার জন্যে সাইকেল নিয়ে আমি ঝোপের ওপর গিয়ে পড়লাম। যাই হোক, গাড়িটা তো ফেলল। নিচে নেমে গিয়ে ভাবলাম, গাড়ির মধ্যেই আছে ও। বের করার জন্যে সাংঘাতিক রিস্ক নিয়েছিলাম সেদিন। কপাল ভাল আমার, গাড়িটাতে আগুন ধরার আগেই সরে এসেছিলাম আমি। নইলে সেদিন আমার চিহ্নও থাকত না।'

কিশোরের দিকে তাকিয়ে আছে এনিড। আনমনে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'ওর ভাগ্য আরও ভাল, অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। ভেতরে থাকলে পুড়ে ছাই হয়ে যেত।'

'সত্যি কথাটা শুনবেন? ওর বেলায় ভাগ্যটাগ্য কিছু ছিল না।'

হাঁটার জন্যে পা বাড়িয়েছিল এনিড, কিশোরের কথায় থমকে গেল।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলছি,' কিশোর বলল, 'পুরো ব্যাপারটা সাজানো, কেবল ওখানে ওই সময় আমার হাজির হয়ে যাওয়াটা ছাড়া। ওটাকে কাকতালীয় ধরে নিতে পারেন।'

'না না!' হঠাৎ কিশোরের কাঁধ খামচে ধরে চেঁচিয়ে উঠল এনিড, 'আর বোলো না! আর শুনতে চাই না আমি!' আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে ও।

'কিন্তু আমি শিওর, ইচ্ছে করেই এ সব করেছে অনিক। বীমার টাকা মেরে দেয়ার জন্যে। সেটা মিসেস জিনজার আর ববিও সন্দেহ করেছে। শুধু তাই নয়, টাকার জন্যে অন্য কারও জীবনকেও জীবন মনে করে না সে, এতটাই বেপরোয়া।'

যেন দুঃস্বপ্ন থেকে ঝাঁকি দিয়ে নিজেকে বের করে আনার চেষ্টা করল এনিড। 'বোলো না! সত্যি হলেও বোলো না, প্লীজ!'

'কেন?'

'ওর বাবার ক্ষতি হবে। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড শুনলে এতটাই দুঃখ পাবেন, সামলাতে পারবেন না। তাঁর কোন ক্ষতি হোক, এ আমি চাই না।'

এনিডের আতঙ্কিত হওয়া দেখে অবাক হলো কিশোর। এত ভয় পাচ্ছে কেন এনিড?

'কিন্তু আপনি নিশ্চয় চান না এ সব করে পার পেয়ে যাক অনিক? বরং তার বাবাকে সত্যি কথাটাই বলা উচিত।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল এনিড। 'তুমি বুঝতে পারছ না!'

অন্য কিছু বুঝুক আর না বুঝুক একটা ব্যাপার ঠিকই বুঝতে পারছে কিশোর, 'অনিককে এ ভাবে ছেড়ে দেয়া উচিত হচ্ছে না। কে মরল, কার ক্ষতি হলো, কিচ্ছু কেয়ার করে না ও। এনিড, আপনি আমাদের সাহায্য করুন!

প্লীজ! কারও কোন ক্ষতি করে ফেলার আগেই অনিককে থামাতে হবে।'

ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল এনিডের মুখ চেপে ধরা আঙুলের ফাঁক দিয়ে। 'না!'

'কেন নয়? আপনি আমাদের সাহায্য করলেই হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে থানায় যাবেন। অনিকের সমস্ত কুকর্মের কথা ফাঁস করে দেবেন। পুলিশকে বলবেন, বীমার টাকার জন্যে ইচ্ছে করে গাড়িটাকে খাদে ফেলে দিয়েছে সে। ওর বাপকেও ঠকাতে চেয়েছে।'

'না!'

'হ্যাঁ। আপনি সহ গিয়ে বললে ওরা বিশ্বাস করবে।'

'প্লীজ!' এনিডের ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া গাল বেয়ে পানি গড়াতে লাগল। 'বুঝতে পারছ না কি অনুরোধ তুমি করতে এসেছ! তুমি আমার...' ঢোক গিলল সে। 'ওর বাপকে শোনানোর মানে নিশ্চিত খুন করা! এই কেলেঙ্কারির কথা শুনলে কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড!'

'আর পুলিশকে এখুনি না জানালে আমি খুন হয়ে যাব! অনিক আমাকে খুন করবে!' এনিডকে রাজি করানোর জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল কিশোর।

ঝট করে মুখ তুলে তাকাল এনিড। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। চোখে কঠিন, শীতল দৃষ্টি। কান্না বন্ধ। 'ওকে নিয়ে খোঁচাখুঁচি থামাও!'

'কি বলছেন!'

'হ্যাঁ। থামাও এ সমস্ত! স্কুলওয়ার্কের গবেষণা করার ভানটানগুলোও বাদ দাও এখন। তুমি মনে করেছ কিছু বুঝি না? ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে মিথ্যে কথা বলে ঢুকেছ তুমি। গোয়েন্দাগিরি করার জন্যে। তোমার পেছনে কুত্তা লেলিয়ে দিয়ে খুব ভাল কাজ করেছে অনিক। কামড়ে দেয়াই উচিত ছিল।'

'এনিড!'

কিশোরের কাঁধে এনিডের হাতের চাপ শক্ত হলো। 'ওসব উদ্ভট বানানো গল্প বলে বেড়াবে না আর, বুঝলে? তোমার নাক গলানো, স্পাইগিরি বন্ধ না করলে পুলিশের কাছে যেতে বাধ্য হব আমি।'

'আ-আপনি এ-কি বলছেন!' বিশ্বাস করতে পারছে না কিশোর। হাসিখুশি এনিডের এ কোন্ রূপ!

'হ্যাঁ, যা বলছি ঠিক তাই করব!' কিশোরের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল এনিড। একটা বিশেষ ভঙ্গিতে হাততালি দিল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডাক দিল কুকুর দুটোকে।

ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটে এল ওরা।

কিশোরের সঙ্গে আর একটা কথাও বলল না এনিড। কুকুর দুটোকে নিয়ে দ্রুত হেঁটে অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে।

পরিস্থিতিটা যে অন্য রকম হয়ে গেছে, লক্ষ করল রবিন আর মুসা।

'কি বলল?' জানতে চাইল রবিন।

'বলল,' মৃদুস্বরে জানাল কিশোর, 'তদন্ত বন্ধ না করলে পুলিশের হাতে

তুলে দেবে আমাদের।'

'খাইছে!' হালকা শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'তারমানে আমাদের পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে?'

নীরবে মাথা ঝাঁকিয়ে নদীর তীর ধরে হেঁটে চলল কিশোর। নদীর সরু অংশটা চোখে পড়ল। তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিয়েছে ওখানে নদী। বড় বড় পাথরগুলো পানির ঘষায় মসৃণ চকচকে হয়ে গেছে। পাথরে বাড়ি খেয়ে সাদা ফেনা তৈরি হচ্ছে অনবরত। বড় করে নোটিশ টানিয়ে দেয়া হয়েছে:

> সাবধান! এখান দিয়ে নদী পেরোনোর চেষ্টা করবেন না। স্রোত বেশি। ভীষণ বিপজ্জনক ঘূর্ণি। পড়লে আর উঠতে পারবেন না। অনেক মানুষ মারা গেছে এখানে।

পনেরো

'কিশোর! কিশোর! কোথায় তোরা?' মেরিচাচীর ডাক শোনা গেল। 'এই জলদি বেরো! তোদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে একটা ছেলে।'

পেরিস্কোপটায় গিয়ে চোখ রাখল রবিন। ওটার নাম রেখেছে কিশোর 'সর্ব দর্শন'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তৈরি। সাবমেরিনে বসানো ছিল। লোহালক্কড়ের সঙ্গে কিনে এনেছিলেন রাশেদ পাশা। সারিয়ে-সুরিয়ে নিয়ে ট্রেলার হোমে বসিয়েছে তিন গোয়েন্দা। এটার সাহায্যে জঞ্জালের বাইরে ইয়ার্ডের অনেকখানি চোখে পড়ে।

একবার দেখেই উত্তেজিত কণ্ঠে ঘোষণা করল সে, 'ববি!'

'তাই নাকি?' সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল কিশোর। ট্রেলার হোমের মেঝেতে লাগানো পাইপটাতে নেমে পড়ল। হেডকোয়ার্টারে ঢোকা আর বেরোনোর জন্যে বেশ কয়েকটা গোপন পথের একটা এটা-নাম, দুই সুড়ঙ্গ। সেটা দিয়ে বেরিয়ে ঢুকল ওঅর্কশপে। দরজা দিয়ে বেরোতে গিয়ে শুনল মেরিচাচী বিড়বিড় করছেন, 'জঞ্জালের মধ্যে কোথায় যে গিয়ে ঢোকে আজ পর্যন্ত বের করতে পারলাম না!' কিশোরকে দেখেই বলে উঠলেন, 'ওই যে, এসেছে।' ববিকে বললেন, 'যাও, কথা বলো। আমি গেলাম।'

মুসা আর রবিনও বেরিয়ে এসেছে গোয়েন্দাপ্রধানের পিছু পিছু।

কিশোর জিজ্ঞেস করল, 'ববি? কি ব্যাপার?'

'কি আর ব্যাপার হবে!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে জবাব দিল ববি, 'মা'র চাকরিটা গেছে। তোমাদের জন্যে। এ জন্যেই বলেছিলাম, ওই শয়তানের ধারেকাছে যেয়ো না...'

'কিন্তু আমরা তো ম্যানরে যাইনি। যাকগে, শান্ত হও। এসো। বসো,' হাত ধরে ওকে ওঅর্কশপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

গেল না ববি। 'না, এখানেই দাঁড়াই। অনিক গিয়ে আমার মাকে বলল, চাকরি খতম। বেরিয়ে যেতে।...মা'র চাকরি গেছে, থাকার জায়গা গেছে। সব হারিয়েছে। মা তোমাদের সঙ্গে কথা বলেছে বলেই তার যত রাগ।'

'কিন্তু সেটা তো আজকে বিকেলে নয়।'

বোবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রবিন।

মুসা চুপ।

'যখনই হোক, তোমাদের ওপর রাগ করেই চাকরিটা খেয়েছে শয়তানটা,' ববি বলল।

'কিন্তু হয়েছিল কি?' অবশেষে কথা খুঁজে পেল কিশোর।

'হবে আবার কি? অনিক এসে বলল, তুমি কাজ পারো না। বিদেয় হও।'

'তারপর?'

'মা-ও কি আর ছাড়ে। অনেক শুনিয়েছে। সোজা চলে গেছে ব্যাগ গোছাতে। তারপর এসে আমার সঙ্গে লাগল শয়তানটা। অহেতুক শাসাতে শুরু করল।'

'কোন্ ব্যাপারে?' দ্রুত ভাবনা চলেছে কিশোরের মগজে।

'কোন ব্যাপার লাগে নাকি? ছুতো একটা বের করে নিলেই হলো। আমাকে শাসিয়ে বলল, চাকরি যেমন দিতে পারে, খেতেও পারে। ওর বাপ ওকে কিছু বলবে না। আমি জানি, দরকার হলে বাপের ওপর জোর খাটাবে–সে ক্ষমতা ওর আছে; একমাত্র ছেলে। আসলে, ইচ্ছে করলে, ও বাড়ির যে কারোর চাকরি খাওয়ার ক্ষমতা সত্যিই আছে ওর। জিজ্ঞেস করলাম–আমার অপরাধটা কি? পরিষ্কার করেই বলল, তোমাদের সঙ্গে মেশাটাই আমার সবচেয়ে বড় অপরাধ। হেসে হেসে টিটকারি দিতে লাগল। তারপর যখন খুব তাচ্ছিল্য করে বলল : বুড়িটাকে বিদেয় করলাম। বাড়াবাড়ি করলে তোমাকেও খেদাব। একটা বাক্সটাক্স রেডি রেখো, নইলে ঘুমাবে গিয়ে কিসের মধ্যে, মেজাজ ঠিক রাখতে পারলাম না আর। দিলাম ঘুসি মেরে। সে-ও আমাকে ছাড়ল না।' কপালের নীল হয়ে ফুলে থাকা জায়গাটায় হাত বোলাল সে। ওখানে ঘুসি মেরেছে অনিক। 'আমাকেও ওবাড়ির ত্রিসীমানায় যেতে মানা করে দিয়েছে।'

'আমার সামনে পড়লেই হয় আরেকবার!' দাঁতে দাঁত চাপল মুসা। মুঠো হয়ে গেছে আঙুল।

'আমাদের সঙ্গে মিশেছ, জানল কিভাবে?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'জানাটা কি কোন সমস্যা নাকি? আইস-রিংকে দেখে থাকতে পারে, ক্রিকেট খেলার মাঠে দেখতে পারে। ওর বন্ধু-বান্ধবের তো অভাব নেই। ওরা গিয়ে বলে দিতে পারে। ছোট্ট শহর। যে কারও চোখে পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক।'

'কিন্তু আমাদের সঙ্গে মিশেছ বলেই তোমার মায়ের চাকরি খেয়ে দেবে,'

রবিন বলল, 'এ কোন্ ধরনের কথা হলো?'

'ওর কাছে ধরন-ফরনের কোন বালাই নেই। ও ওর ইচ্ছেমত কাজ করে।'

'এনিড কি বলে?' জানতে চাইল কিশোর। 'তোমার মা'কে এক কথায় বিদেয় করে দিল, আর এনিড কোন প্রতিবাদ করল না?'

'কি বলবে? সোজা গিয়ে বাপকে বলেছে অনিক, আমার মা চোর। কয়েকটা বিল দেখিয়ে বলেছে, এগুলো বেশি টাকার বিল। দোকানদারের সঙ্গে যোগসাজশ করে বেশি বেশি দাম ধরা হয়েছে। অন্য দোকানে নাকি খোঁজ নিয়ে দেখেছে সে। বুড়ো তার কথা বিশ্বাস করল। এ কথা শোনার পর মা'র অবস্থাটা কল্পনা করো। চাকরি খেয়েছে, তাতে দুঃখ ছিল না। চোর বলাতে সহ্য করতে পারল না, কাঁদতে লাগল। আর সেটা দেখে বোবা হয়ে অফিসে দাঁড়িয়ে থাকল এনিড।'

'তারমানে তোমাদের দুজনেরই এখন আর মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই!' সহানুভূতির সুরে বলল মুসা।

মাথা সোজা করে দাঁড়াল কিশোর, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরে।'

'কেন?'

'প্রতিবাদ জানাব। খুব অন্যায় করেছে ওরা।'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? বুড়ো তোমার কোন কথা শুনবে না। ফল আরও খারাপ হবে। চুরির দায়ে আমার মা'কে পুলিশেও দিয়ে দিতে পারে।'

'অত সহজ না দুনিয়াটা! টাকা থাকলেই সব কিনে ফেলবে নাকি? এসো। আমাদের জন্যে তোমাদের এতবড় ক্ষতি হলো। মুখ বুজে সহ্য করব? মোটেও না।'

ষোলো

একসারিতে ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরের সিংহ দরজা পেরোল ওরা।

পথ দেখাল ববি। 'এসো, এদিক দিয়ে।'

আস্তাবলের ধারে একটা ঘরে ওদের নিয়ে গেল সে। যেখানে ওর মা জিনিসপত্র গোছগাছ করছে। কমলা রঙের পুরানো একটা গাড়িতে একটা বাক্স নিয়ে গিয়ে তুলল। তিন গোয়েন্দাকে দেখে মাথা ঝাঁকাল। ছেলেকে বলল, 'ববি, ধর তো বাক্সটা, ঠিক করে রাখি।'

বাক্স রেখে দড়াম করে দরজা লাগাল।

'মিসেস জিনজার, আমরা সত্যি খুব দুঃখিত...' বলতে গেল কিশোর।

'কিন্তু আমার একটুও দুঃখ লাগছে না,' হাত নেড়ে কিশোরকে থামিয়ে দিল মিসেস জিনজার। 'আমার বরং খুশি লাগছে। হালকা।' তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'ইবলিসের কাছ থেকে সরে যাওয়ার কথা ভাবতে ভাল লাগছে।'

'কিন্তু এ রকম কিছু ঘটুক, চাইনি আমরা,' বিমূঢ় হয়ে গেছে কিশোর। ভেবেছিল খুব মন খারাপ দেখবে মিসেস জিনজারের, কিন্তু এ যে উল্টো ওদেরকেই সান্ত্বনা দিচ্ছে।

ওর পেছনে দাঁড়িয়ে উসখুস করছে ববি।

'শোনো,' মিসেস জিনজার বলল ওদের, 'তোমরা তিনজন আমার একটা বিরাট উপকার করলে। চাকরিটা ছাড়ার জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম আমি। কেবল বুড়োটা দুঃখ পাবে ভেবে, ধমক শোনার ভয়ে সামনে গিয়ে বলতে পারছিলাম না কথাটা। এনিডকে ছেড়ে যাওয়ার কথা ভেবেও মন খারাপ লাগত। কিন্তু অনিক ইবলিসটা আমার স্নায়ুর ওপর চড়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু ববি যা বলল, তাতে তো মনে হলো আপনাদের খুব বিপদ। সেজন্যেই তো এসেছি মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে অনুরোধ করতে আপনার চাকরিটা ফেরত দেয়ার জন্যে।'

হো-হো করে হেসে উঠল মিসেস জিনজার। 'যাক, আমার জন্যে ভেবেছ তোমরা, শুনে খুব খুশি হলাম...সত্যি কথাটা বলব? প্রথমে মনটা আসলেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এতদিন ধরে আছি একটা জায়গায়, হঠাৎ করে চলে যেতে হবে ভেবে...তবে বেশিক্ষণ খারাপ ছিল না। এখান থেকে বেরোনোর কথাটা ভাবতেই এখন ভাল লাগছে আমার।' গাড়ির চাবির জন্যে পকেটে হাত দিল সে। 'দু'চার সপ্তাহ সহজেই আমার বোনের বাড়িতে গিয়ে থাকতে পারব। ততদিনে আরেকটা চাকরি জোগাড় হয়ে যাবে। কাজ জানি। অতএব ভাবনা নেই। লস অ্যাঞ্জেলেস অনেক বড় জায়গা, অনেক বড়লোকের বাড়ি আছে, হোটেল আছে, নার্সিং হোম আছে...তোমাদের দুঃখ পাওয়ার কোন কারণ নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। একটা মস্ত চাপ সরে গেল মন থেকে।

পরদিন লাঞ্চের সময় খালার বাড়িতে ছেলেকে দেখা করতে বলে গিয়ে গাড়িতে উঠল মিসেস জিনজার। তিন গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার জন্যে মন খারাপ করে উপকার করতে যে এসেছ–অনেক ধন্যবাদ তোমাদেরকে।'

স্টার্ট দিয়ে গাড়ি নিয়ে গেটের দিকে চলে গেল মিসেস জিনজার।

'সর্বনাশ!' বলে উঠল মুসা। 'দেখো, কে আসছে!'

মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে আসতে দেখা গেল।

প্রথমে ঘাবড়ে গেল কিশোর। পরক্ষণে সামলে নিল। মনকে বোঝাল, আসুক। কি হবে? কিন্তু বুকের দুরুদুরু ভাবটা গেল না।

কাছে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। তিন গোয়েন্দাকে চিনতে

পারলেন। কিন্তু কোন কথা বললেন না ওদের সঙ্গে। ববির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আধঘন্টা সময় দেয়া হলো তোমাকে। জিনিসপত্র নিয়ে বিদেয় হও। কখনও যেন আর এই এলাকায় না দেখি। বোঝা গেছে?' দেখলে যে ভাল হবে না, সে-কথাটা উহ্য রাখলেন।

এই হলো চিরাচরিত কোটিপতি, সাধারণ মানুষ থেকে একজনের কোটিপতি হওয়ার গোপন রহস্য–বুঝতে পারল কিশোর। নিজের সিদ্ধান্তে অটল, কারোর জন্যে সহানুভূতি নেই, কারও অনুভূতির কোন দাম নেই, তাঁর কথায় কেউ যে মনে ব্যথা পেতে পারে সেদিকটা দেখার কোন প্রয়োজন নেই; এ এক ধরনের নিষ্ঠুরতা। তাঁর সিদ্ধান্তে যে আর কারও মস্ত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, একবার চিন্তা করারও দরকার মনে করেন না।

লাল হয়ে গেল বেচারা ববি। জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলতে গেল।

'কিন্তু ওর তো কোন দোষ নেই,' ববির আগেই বলে ফেলল মুসা। 'মিসেস জিনজারেরও না। ওরা কোন অন্যায় করেনি।'

ওর দিকে তাকালেনও না মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। যে কথা শোনার প্রয়োজন মনে করেন না, সেটা শুনেও শুনতে চান না।

'দোষটা করেছে আসলে আপনার ছেলে অনিক!' মুসার সঙ্গে সুর মেলাল রবিন।

একটা ধাক্কা খেলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। সামলে নিতে দেরি হলো না। এটাও বিরাট ক্ষমতা। গমগমে কণ্ঠে বললেন, 'এ সব ফালতু কথা শোনার আমার সময় নেই। এখান থেকে সবাইকে চলে যেতে বলছি। নইলে পুলিশ ডাকব।'

'পুলিশ ডাকেন আর যাই করেন, আপনাকে শুনতে হবে!' রেগে গেল কিশোর।

ওর কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, ক্ষণিকের জন্যে দ্বিধায় ফেলে দিল মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে। কিন্তু শুনতে চাইলেন না এরপরেও। 'এ সব ফালতু কথা শোনার সময় নেই আমার।' আবার একই কথা বললেন তিনি।

'শুনবেন না কেন? আপনার ছেলে একটা উন্মাদ। বিপজ্জনক। আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

স্থির হয়ে গেলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড।

সুযোগ পেয়ে গেল কিশোর। বুঝল, মহীরুহকে কাঁপিয়ে দিতে পেরেছে।

কিন্তু প্রকৃতি বাদ সাধল। নষ্ট করে দিল সুযোগটা। কিছুক্ষণ থেকেই কালো মেঘ জমছিল। ফ্যাকাসে ধূসর পাথুরে চত্বরে টুপ করে পড়ল বড় একটা ফোঁটা। তারপরেও হয়তো আরও কয়েকটা কথা বলতে পারত কিশোর, কিন্তু ঠিক এই সময় সেখানে এসে দাঁড়াল অনিক। 'বাবা, তোমার ফোন। ওশনসাইড সান থেকে রোমার গুডল। ফ্রন্ট পেজে কি যাবে সেটা নিয়ে কথা বলতে চায়।'

কিশোরের দিকে ফিরলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। এই প্রথম সরাসরি মুখ

তুলে তাকালেন। কিন্তু কিছু বললেন না। আনমনে একবার মাথা নেড়ে দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করলেন।

কয়েকটা বড় বড় ফোঁটা ঝরে পড়ল অনিক ম্যাকডোনাল্ডের উজ্জ্বল সাদা শার্টে। সাপের মত শীতল দৃষ্টি ঘুরে বেড়াতে লাগল চারজনের ওপর। 'নিজেদের দুর্বলতা আর কখন বুঝতে শিখবে? সত্যি কথাটা কেউ জানতে চায় না,' মসৃণ হাসি হাসল সে, 'যদি বোঝে, তাতে তাদের ক্ষতি হয়ে যাবে।'

ছেলেটা বাবার চেয়েও নিষ্ঠুর। তাড়াহুড়া করল না। ওরা যেন কচিখোকা, জ্ঞান দিতে শুরু করল।

সহ্য করতে পারল না ববি। মেজাজ বিগড়ে আবার কখন অনিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অঘটন ঘটায়, এই ভয়ে ঝটকা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। চলে গেল ওখান থেকে।

দাঁড়িয়ে আছে তিন গোয়েন্দা। তাকিয়ে আছে অনিকের দিকে।

'নিজেদের ভাল চাওয়া উচিত তোমাদের,' মসৃণ কণ্ঠে জ্ঞান বিতরণ চলল ওর। 'ভাগ্য সব সময় প্রসন্ন না-ও হতে পারে তোমাদের ওপর।'

অহেতুক হুমকি দিচ্ছে না ছেলেটা, তার প্রমাণ তো কিশোর আগেই পেয়েছে। ও একাই একশো, ভয়ানক বিপজ্জনক, তার ওপর পেয়েছে বাপের প্রশ্রয়, কোন বাধাকেই বাধা মনে করবে না এখন সে। আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠবে।

'আর শুধু নিজেদের কথাই নয়, পরিবারের অন্যদের কথাও ভাবা উচিত,' বলেই চলেছে অনিক। 'অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচয় আছে আমার। অনেক বড় বড় মানুষের সঙ্গে খাতির। ভাল মানুষ, মন্দ মানুষ, চোর-ডাকাত-খুনী। বাবার প্রভাব তাদের ওপর খাটাতে পারি। টাকার অনেক ক্ষমতা। ওদের দিয়ে অনেক কিছু করাতে পারি।...কিশোর পাশা, তোমার চাচা তো পুরানো জিনিস কেনে। পুরানো বাড়িতে যায়। ধরো, পুরানো একটা সিলিং তার মাথায় ভেঙে পড়ল। মরে গেল। পুলিশ কি সন্দেহ করবে?...কিংবা রবিন? তোমার মা বাচ্চাদের স্কুল খুলেছে। সেটাতে আগুন ধরে গেল, কয়েকটা বাচ্চা পুড়ে মরল। কি জবাব দেবে তোমার মা? তোমার বাবা চাকরি করে খবরের কাগজে। চাকরিটা চলে গেল কোন দোষে। আমেরিকার এই অঞ্চলে আর কোনদিন চাকরি পাবে না। খবরের কাগজে কাজ করার পাট ঘুচবে চিরদিনের মত...মুসা আমান, তোমার বাবা...'

'আমার বাবার কচু করবি তুই, শয়তানের ছাও!' বলে ঘুসি পাকিয়ে অনিকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল মুসা।

ধরে ফেলল কিশোর।

'ছাড়ো আমাকে!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'ইবলিসটাকে আজ শেষই করে ফেলব! দেখি ওর বাপ আমার কি করতে পারে! চোর-বাটপাড়দের আবার বড় বড় কথা...'

'আহ্, মাথা ঠাণ্ডা করো!' জাপটে ধরে রাখল ওকে কিশোর।

ঝরঝর করে ফোঁটা পড়তে শুরু করল। মুষলধারে নামতে দেরি হলো না। মুহূর্তে ভিজিয়ে দিল ওদের।

একদৌড়ে গিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল অনিক। বৃষ্টির কারণে যে যায়নি ও, এটুকু বোঝা গেল।

সতেরো

টেবিলে বসে কফি খাচ্ছিলেন রাশেদ পাশা। তিন গোয়েন্দাকে ঢুকতে দেখে হাসি ফুটল মুখে। 'অমন ইঁদুরভেজা ভিজে এলি কোত্থেকে?'

ফিরে তাকাল ডন। 'ধরে চুবিয়ে দিয়েছে মনে হচ্ছে। কি করেছিলে, কিশোর ভাই?'

'চুপ!' ধমকে উঠল কিশোর।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' পাল্টা ধমক লাগালেন মেরিচাচী। 'মাথা মোছ্ জলদি। সর্দি লাগাবি তো।...কোথায় যায় কি করে! যত্তসব...'

গায়ের ভেজা অ্যানার্‌্যাকগুলো খুলে মাথা মুছে নিল ওরা। টেবিলে এসে বসল। গরম চকলেট ড্রিংক আর বিস্কুট এনে দিলেন চাচী।

কফি শেষ করে কাজে চলে গেলেন রাশেদ পাশা। চাচী গেলেন রান্না করতে। কিছুক্ষণ উসখুস করে যখন ডন বুঝল তার সামনে কোন কথা বলবে না তিন গোয়েন্দা, উঠে চলে গেল টেলিভিশন দেখতে।

ওরা বিস্কুট শেষ করার আগেই ফোন এল। তুলে নিল কিশোর। 'হ্যালো?'

'কে বলছেন?'

'কিশোর পাশা।'

'ও, কিশোর, আমি। এনিড কফার।'

হঠাৎ কিশোরকে শক্ত হয়ে যেতে দেখল তার দুই সহকারী। খাওয়া থামিয়ে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে রইল।

'কি ব্যাপার! আপনি?'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল এনিড। 'কিশোর, ফোনে সব বলা যাবে না,' গলা কাঁপছে তার। 'বিকেলে তুমি বলার পর কথাগুলো নিয়ে অনেক ভেবেছি। তুমি ঠিকই বলেছ। ওকে ছেড়ে রাখা উচিত না।...অবস্থা খুব খারাপ। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। বিছানায়। কি করব বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু ঘটবে।'

'আমাদের কি করতে বলেন? পুলিশের কাছে গিয়ে সব খুলে বলব?'

'না না!' আঁতকে উঠল এনিড। 'ও কাজও কোরো না। পারো তো এখানে চলে আসো। আমি যেতে পারছি না। ওঁকে ফেলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।'

'অনিক কোথায়?' ও বাড়িতে তৃতীয়বার গিয়ে আর ওই পাজি ছেলেটার

সামনে পড়তে চায় না কিশোর।

'নেই। সন্ধ্যায় বেরিয়ে গেছে। সহজে আর ফিরবে বলে মনে হয় না। তাহলে তোমাকে ডাকতাম না। চলে এসো, প্লীজ!'

'আপনি ধরুন। রবিন আর মুসার সঙ্গে কথা বলে নিই।' মাউথপীসে হাত চাপা দিয়ে দ্রুত সব জানাল কিশোর।

রবিন বলল, 'ফাঁদ নয় তো?'

'ফাঁদ হলেও মানা করতে পারব না। রহস্যভেদের এটা একটা বিরাট সুযোগ। হাতছাড়া করা উচিত হবে না।'

'তাহলে বলে দাও, যাচ্ছি,' মুসার দিকে তাকাল রবিন। 'কি বলো?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা।

মাউথপীস থেকে হাত সরিয়ে এনিডকে জানাল কিশোর, 'আমরা আসছি।'

'ওহ্, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ!' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল এনিড। 'কতক্ষণ লাগবে?'

'আধঘন্টা।'

'ঠিক আছে। রাখলাম।'

লাইন কেটে দিল এনিড।

দুই ঢোকে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া চকলেট শেষ করে ফেলল কিশোর। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বলল, 'চলো, বেরিয়ে পড়ি। চাচী দেখে ফেললে আটকে দেবে।'

ভেজা অ্যানারাকগুলো আবার তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ল ওরা।

*

নদী তীরের বৃষ্টিভেজা কাঁচা রাস্তা ধরে সাইকেল চালানো এখন বেশ কঠিন ব্যাপার। ভাল বৃষ্টি হয়েছে। ফুলে উঠেছে পানি। শর্টকাট বলে এদিক দিয়েই চলেছে তিন গোয়েন্দা।

কিছুক্ষণ পর চোখের সামনে ফুটে উঠল ম্যাকডোনাল্ড ম্যানরের বিরাট দেয়াল। আরও এগোতে চোখে পড়ল সিংহ দরজার সিংহ দুটো-বৃষ্টি আর কুয়াশায় অস্পষ্ট।

গেটের ভেতরে ঢুকে কিশোর বলল, 'সাইকেলগুলো লুকিয়ে রাখা দরকার। বলা যায় না...'

আস্তাবলের কাছে একটা ছাউনিতে সাইকেলগুলো ঢুকিয়ে রাখল ওরা। খোয়া বিছানো রাস্তা ধরে এগোল। ভেজা খোয়ায় মচমচ করছে জুতো। সাবধানে চারপাশে তাকাল। অনিকের কালো গাড়িটা খুঁজল।

'ওই গাড়িটাই যত নষ্টের মূল!' বিড়বিড় করল মুসা।

'হ্যাঁ,' কিশোর বলল, 'গোলমালের শুরু...যাই হোক, দেখা যাচ্ছে না যখন, ধরে নেয়া যায় অনিক বাড়িতে নেই।'

সদর দরজার ঘন্টা বাজাল সে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে দিল এনিড। চেনাই যাচ্ছে না ওকে। বিধ্বস্ত

চেহারা, লাল আতঙ্কিত চোখ, সোনালি চুলের গোছা লেপ্টে রয়েছে গালের সঙ্গে। ওদের দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'এসেছ! থ্যাংক গড! ভয়েতেই মরে যাচ্ছিলাম আমি।'

ভেতরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা।

রবিন জানতে চাইল, 'অনিক এখনও ফেরেনি?'

'না। সারা জীবনেও যদি না ফিরত, খুশি হতাম।' দরজাটা লাগিয়ে দিল এনিড। লাগাতে গিয়ে বেশ শব্দ করে ফেলল। হলঘরে মৃদু আলো। 'এদিক দিয়ে এসো।'

অফিসে নিয়ে এল ওদেরকে সে।

'কি হয়েছে?' জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে রবিন। এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না এটা ফাঁদ নয়। তার ধারণা, কোথাও লুকিয়ে আছে অনিক। যে কোন সময় বেরিয়ে এসে একটা শয়তানি করে বসতে পারে।

সাবধান করল এনিড, 'আস্তে বলো। সামান্য শব্দেও জেগে যাবেন।'

'কিন্তু হয়েছেটা কি?' প্রায় ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল কিশোর। 'আসতে বলেছেন কেন?'

'গোলমালটা যে আসলে কোথায়, জানি না। কিছু বলছেন না উনি। সোজা গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন। খাচ্ছেন না। আসার পর থেকে কিছুই মুখে দেননি।'

'ডাক্তারকে ফোন করেছেন?'

'করতে দেননি। কোনমতেই রাজি করাতে পারিনি।' কিশোরের দিকে তাকাল এনিড। 'তাঁকে কি বলেছ তুমি? আমার ধারণা, তোমার কথাতেই এ অবস্থা হয়েছে তাঁর।'

'আসলে…' কিশোরের পক্ষ নিয়ে বলতে গেল রবিন।

কিন্তু তাকে থামিয়ে দিল কিশোর, 'রাখো, ঘুরিয়ে বলার দরকার নেই।' এনিডের দিকে তাকাল সে, 'আমি বলেছি, অনিক আমাকে খুন করতে চেয়েছিল।'

চামড়ায় বাঁধানো মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বড় চেয়ারটায় বসে পড়ল এনিড। ডেস্কে কনুই রেখে সামনে ঝুঁকল। 'উনি কি বললেন?'

'পুলিশের ভয় দেখালেন। বড়ই অদ্ভুত লাগছে আমার কাছে। এখানকার সবাই আমাকে কেবল পুলিশের ভয় দেখায়।'

'সরি!…তারপর? উনি কি করলেন?'

'কিছু করার আগেই অনিক এসে ফোনের কথা বলে তাঁকে সরিয়ে দিল।'

'এবং তারপর থেকেই কারও সঙ্গে কথা বলছেন না উনি। একটা শব্দও না।' উঠে দাঁড়াল এনিড। বাইরের ভেজা লনের দিকে তাকাল। 'শুধু তাই নয়।' আবার তিন গোয়েন্দার দিকে ফিরল সে। 'শুনতে অদ্ভুত শোনাবে, তবু বলেই ফেলি…' কথা শেষ না করেই ডেস্কে দুই হাত রেখে ঝুঁকে দাঁড়াল সে। যেন শরীরের ভর রাখতে পারছে না।

'কি অদ্ভুত শোনাবে?' এনিডের ভেঙে পড়া অবস্থা দেখে স্বর নরম করল কিশোর।

'আমার বিশ্বাস, অনিক ওর বাবাকেও খুন করতে চাইছে। তাঁকে বিষ খাইয়েছে! ওঁর এই অসুস্থতার জন্যে অনিকই দায়ী।'

'খাইছে!' চমকে গেল মুসা। রবিন আর কিশোরের মুখের দিকে তাকাতে লাগল।

'আস্তে!' সাবধান করল এনিড। 'জেগে যাবেন!'

কিশোরের চেহারার পরিবর্তন হলো না। 'কখন সন্দেহ করলেন?'

'হপ্তাখানেক আগে...আসলে দিন দশেক...শিওর হতে পারছিলাম না...অনিক অ্যাক্সিডেন্ট করার পর থেকে অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে শুরু করল এখানে। টাকা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি।...ছেলের ওপর মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কঠোর হয়ে ওঠা...তখন থেকেই খাওয়া কমে যেতে শুরু করেছে তাঁর। শরীর খারাপ হয়েছে। কিন্তু কাউকে কিছু বলেননি। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনি। সন্দেহ ঠিকই হয়েছিল আমার।'

মাথাটা ঝুলে পড়ল এনিডের। কাঁদতে শুরু করেছে। সামলে নিতে সময় লাগল। 'আমি জানি উনি অসুস্থ। তারপর গেলেন নিউ ইয়র্কে। কয়েক দিন থাকলেন। ইতিমধ্যে বীমার টাকাটা আদায় করে নতুন আরেকটা গাড়ি কিনে নিল অনিক। ভাবলাম, ভালই হলো। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড ফিরে এসে গাড়িটা দেখলে শান্ত হয়ে যাবেন। কিন্তু তোমরা তিনজন সারাক্ষণ অস্থির করে রাখলে অনিককে, রাগের মাথায় মিসেস জিনজারের চাকরি খেয়ে দিল সে, ববিকে তাড়াল...অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের। কি করব এখন বুঝতে পারছি না!'

'কি করে বিষ খাওয়াল অনিক?' জানতে চাইল কিশোর। 'সুযোগটা পেল কখন?'

কাঁদতে কাঁদতে কোনমতে জানাল এনিড, 'হার্টের জন্যে বড়ি খান উনি। সিরিয়াস কিছু নয়, তবু অতিরিক্ত সাবধানতার জন্যে দিয়েছেন ডাক্তার।...অনেক ভেবেছি আমি। কাল সারারাত ধরে ভেবেছি। হঠাৎ করেই মনে পড়ে গেল, অনিক ওর বাবাকে রোজ ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়।'

'তাতে কি? বাবাকে ওষুধ খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেবে ছেলে, এটাই তো স্বাভাবিক।'

'অনিকের জন্যে নয়,' কান্না থামিয়ে বলল এনিড। 'এত ভাল ছেলে ও কখনোই ছিল না।'

'মানে?'

'ব্যাপারটা নিয়ে অনেক ভাবলাম,' অস্থিরতাটা আবার ফিরে এসেছে এনিডের কণ্ঠে। 'মনে পড়ল, শেষবার প্রেসক্রিপশন নিয়ে ওষুধ আনতে অনিক গিয়েছিল ডাক্তারের দোকানে। হয় ভুল ওষুধ কিনে এনেছে ইচ্ছে করে, নয়তো

ওষুধের ডোজ বাড়িয়ে দিয়েছে।' আচমকা মাথা তুলে হেসে উঠল সে। মনে হলো উন্মাদের হাসি। 'আমার ভুলও হতে পারে। বেশি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলে কিংবা ইমোশনাল হয়ে পড়লে মানুষ উল্টোপাল্টা অনেক কিছু ভেবে বসে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে এনিডের দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। তারপর বাইরে তাকাল। কুয়াশা ঘন হচ্ছে। গিলে ফেলছে বিরাট বাড়িটাকে। ঢেকে দিচ্ছে বৃষ্টির শব্দ। ভেতরে, নতুন রূপ নিচ্ছে ম্যাকডোনাল্ডদের বাড়ির দুঃস্বপ্নটা। এনিডের দিকে ফিরল আবার। 'এ কথা বলতেই কি আমাদের ডেকে এনেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল এনিড। চুলে আঙুল চালিয়ে সোজা করার চেষ্টা করল। জাম্পারটা টেনে দিল প্যান্টের ওপরে। 'কাউকে বলে মন হালকা করার জন্যে অস্থির হয়ে গিয়েছিলাম। বলার পর এখন মনে হচ্ছে এ-কি পাগলামি! পুরো ব্যাপারটা আমারও আসলে স্নায়ুর ওপর চেপে গেছে। সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে।...ওর জন্যে এতটাই দুশ্চিন্তা হচ্ছে যে কি বলব...'

'পাগলামি ভাবছেন কেন? অনিকের মত উন্মাদের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক।'

কেঁপে উঠল এনিড। যেন গায়ে কাঁটা দিল। কাছাকাছি হয়ে এল ভুরুজোড়া। ভারী দম নিল।

'বলে ভাল করেছেন,' সান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিতে বলল মুসা।

গভীর চিন্তায় পড়ে গেল সবাই। নতুন মোড় নিয়েছে ঘটনা। আরও অনেকে বিপদের সম্মুখীন।

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারেন আমার?' অবশেষে বলল কিশোর। 'তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে তিনি মস্ত বিপদের মধ্যে আছেন। তাঁর জীবন হুমকির মুখে। হয়তো বোঝাতে পারব।'

এনিডের ভঙ্গি দেখে মনে হলো, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বুকে একটা ছুরি ঢুকিয়ে দিতে বলেছে কিশোর। কুঁকড়ে গেল। 'আমি পারব না। তাঁকে বাঁচাতে চাই আমি। সব সময়ই চেয়েছি।'

'বাঁচাতে চাইলে সত্যি কথাটা তাঁকে জানানো দরকার, বুঝতে পারছেন না?'

'শুনলে যদি...'

'না শোনালে আরও খারাপ হবে। ডাক্তার দেখাতেই রাজি করাতে পারবেন না।'

অনেক কষ্টে অবশেষে মনস্থির করে নিল এনিড। 'বেশ, দেখো চেষ্টা করে,' রাজি হয়ে গেল সে। 'শুধু তুমি যাও।' রবিন আর মুসাকে বলল, 'তোমরা থাকো।' কিশোরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মৃদু আলোকিত হল পার করে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বেডরুমের দিকে।

আঠারো

ঘরটায় কোন মহিলার হাতের ছোঁয়া নেই। অনেক বড় একটা পুরানো খাট। তাকে প্রচুর বই রাখা, কিন্তু সাজানোর কোন জিনিস কিংবা ফুলদানীতে ফুল নেই। দেয়ালগুলোতে অলঙ্করণের কিছু নেই, একেবারে নিরাভরণ, পুরানো কয়েকটা ম্যাপ আর ছাপানো ছবি ঝুলছে।

ঘরের বাতিগুলো খুব অল্প পাওয়ারের। পর্দা টানা। আলোর চেয়ে ছায়াই বেশি। খাটের দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হলো কিশোরকে বোঝার জন্যে যে একজন মানুষ শুয়ে আছে তাতে। সাদা চাদরে ঢাকা। মুখটা ওপরের দিকে।

'ঘুমাচ্ছেন,' ফিসফিস করে বলল এনিড। 'বিরক্ত করা ঠিক হবে না।'

কিন্তু খুলে গেল মানুষটার চোখের পাতা। সাদা কাগজে দুটো গোল ফুটোর মত লাগল কোটর দুটো। মুখ নড়ল না। কেবল চোখের মণি দুটো ঘুরল এনিডের দিকে, 'কে?'

'আমি,' হেসে জবাব দিল এনিড। 'কেমন লাগছে এখন?' মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কপালে হাত রাখল সে। 'ঘুম হয়েছে? ভাল লাগছে এখন?'

মাথা ঝাঁকানোর চেষ্টা করলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। 'বেশি অস্থির হয়ে গেছ তুমি, এনিড। দরকার নেই। এ সব আমার পছন্দ হচ্ছে না।' কণ্ঠস্বর মোলায়েম করে তুলে, হাসিটা ধরে রাখার চেষ্টা করছেন তিনি। 'তুমি জানো, সারাজীবনে কখনও অসুখ করেনি আমার।' জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। 'এক গ্লাস পানি দেবে?'

গ্লাসে পানি ঢালতে গেল এনিড।

বিছানার কাছে এগিয়ে এল কিশোর। সত্যি, খুবই অসুস্থ দেখাচ্ছে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে। এই অবস্থায় তাঁকে বিরক্ত করার কথা ভেবে কিশোরেরও অস্বস্তি লাগল। বেরিয়ে যাওয়ার কথা ভাবল। কিন্তু কালো, জ্বোরো চোখ দুটো চিনে ফেলল তাকে।

'এনিড!' কঠিন হয়ে উঠল মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কণ্ঠ। মোলায়েম ভাবটা চলে গেছে।

'এই যে, আসছি!' তাড়াতাড়ি কাছে এসে দাঁড়াল এনিড। 'উত্তেজিত হবেন না।'

'ওকে বের করো এখান থেকে!' মাথা তোলার চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু বড় বেশি দুর্বল। 'এখানে এসেছে কেন? জলদি বের করো!'

নড়ল না কিশোর। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, দয়া করে আমার কথা একটু শুনুন। আগে যা বলেছি, বিশ্বাস করেননি। এখন অন্তত করুন।'

চোখ বুজলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। মাথাটা কাত করে মুখ ফেরালেন অন্যদিকে।

'শুনতেই হবে আপনাকে,' জোর দিয়ে বলল কিশোর। 'আপনার ছেলে অনিকের ব্যাপারে। মিস কফার আমাকে আসতে ফোন করেছেন। আপনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন তিনি।'

কিশোরের দিকে ফিরে তাকালেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। দৃষ্টিতে অনুনয়। 'অনিকের প্রতি আমি সুবিচার করিনি,' ছেলের হয়ে সাফাই গাইবার চেষ্টা করলেন তিনি, 'ওকে ভাল করে শিক্ষা দিতে পারিনি। সময় দিইনি। ও যখন শিশু, ওর মা মরে গেল, তখনও তার দিকে খেয়াল দিইনি ঠিকমত। সব দোষ আমার।'

'না, সব দোষ আপনার নয়। ও এখন বড় হয়েছে। বুদ্ধি হয়েছে। শিশু নয়। আমাকে খুন করতে চেয়েছে। আপনাকে খুন করতে চাইছে। ওকে সেটা করতে দেয়া যাবে না।'

কিন্তু নিজের দোষ নেই, এটা মানতে চাইলেন না মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। অনুশোচনায় জর্জরিত। 'ওর মাসোহারা বন্ধ করে দেয়া উচিত হয়নি আমার। ক'টা টাকাই বা নষ্ট করেছে! আমার জেদই হয়েছে যত সর্বনাশের মূল।'

'আমি সেটা স্বীকার করব না। আপনাকে ও ব্যবহার করেছে, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছে।'

'ও আমার ছেলে!'

শক্তিশালী একজন মানুষের শক্তি কিভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়, চোখের সামনে দেখতে পেল কিশোর। মহাক্ষমতাধর একজন সফল মানুষ আর দশজন অসহায়, অসুস্থ মানুষের মতই কুঁকড়ে পড়ে আছে বিছানায়। অসুখ আর মৃত্যু সব মানুষকে এক করে দেয়।

'আপনাকে ও বিষ খাইয়েছে!'

ধক করে জ্বলে উঠল মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের চোখ। রাগে কথার তুবড়ি ছুটল মুখ দিয়ে। সবই ছেলের পক্ষে বলছেন। খসখসে কণ্ঠস্বর। কথা বলার সময় থুতুর ছিটে বেরিয়ে আসতে লাগল। তাড়াতাড়ি মুখ চেপে ধরল এনিড।

সরে যাওয়ার বদলে সামনে এগোল কিশোর। মরিয়া হয়ে বলল, 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড, প্লীজ, আমার কথা বিশ্বাস করুন!'

অসুস্থতা নিয়েও লাফ দিয়ে উঠে বসলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। 'এনিড তোমাকে ঢুকতে দিয়েছে! এনিড!' বন্য হয়ে ওঠা, ঘূর্ণায়মান চোখের তারা গিয়ে স্থির হলো এনিডের ওপর।

'না, আমি নিজেই এসেছি,' বিছানা থেকে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডকে নামতে বাধা দিতে গেল কিশোর। 'নামবেন না। শান্ত হোন, মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড।'

আবার বালিশে মাথা রাখলেন তিনি। এনিডকে বললেন, 'ওকে বের করো এখান থেকে। জলদি বেরিয়ে যেতে বলো। আর যেন কখনও আমার সামনে না আসে।'

'ঠিক আছে, বলছি,' তাঁকে শান্ত করার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল এনিড। 'আপনি শান্ত হোন। চুপ করুন। আমি ওকে বের করে দিয়ে আসি।'

উনিশ

সোজা কিশোরকে মিসেস জিনজারের চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে এল এনিড। কথা বলতে সুবিধে হবে বলে। জোরে বললেও মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের শোবার ঘরে শব্দ যাবে না।

শূন্য ঘর। একধারে একটা গদিওয়ালা চেয়ার পড়ে আছে কেবল। এটা নিশ্চয় এ বাড়ির জিনিস, তাই নিয়ে যায়নি মিসেস জিনজার।

গদিটা তুলে নিয়ে মেঝেতে ফেলে তাতে বসে পড়ল এনিড। কিশোরকে বসতে বলল চেয়ারে। কোলের ওপর দুই হাত ফেলে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

'সরি, কিছু করতে পারলাম না। অত একরোখা মানুষকে বোঝানো কঠিন,' কথা শুরু করল কিশোর। 'এখন কি করতে চান? আমাকে এখানে এনেছেন কেন?'

চুপ করে আছে এনিড। ভাবছে বোধহয় কিছু।

'তবে সবার আগে একজন ডাক্তার ডাকা উচিত,' আবার বলল কিশোর। 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড সত্যি খুব অসুস্থ।'

'তোমাকে কয়েকটা কথা বলার জন্যে এখানে নিয়ে এসেছি। বলাটা খুব জরুরী।'

'ডাক্তার ডাকার চেয়েও?'

মাথা ঝাঁকাল এনিড।

'তাহলে বলুন?'

'সেক্রেটারি ছাড়াও আরও একটা সম্পর্ক আছে আমার তাঁর সঙ্গে।'

'জানি।'

'কি জানো?' তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এনিডের কণ্ঠ।

'আপনি তাঁর মেয়ে।'

একটা মুহূর্ত কথা সরল না এনিডের মুখে। এতই নীরব হয়ে গেল ঘরটা, দেয়ালে লাগানো প্রায় নিঃশব্দ ইলেকট্রনিক ঘড়িটা চলার শব্দও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

'কে বলল তোমাকে? আমি আর বাবা ছাড়া তো দুনিয়ার আর কেউ জানে না এ কথা।'

'আপনার চেহারাটাই সব ফাঁস করে দিয়েছে। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের সঙ্গে অনেক মিল। তা ছাড়া আপনার আচরণেও অনেক কিছু প্রকাশ পেয়ে গেছে।'

'ঠিকই ধরেছ,' মাথা ঝাঁকাল এনিড। 'আমি ওর অবৈধ সন্তান!'

'এটাও আন্দাজ করেছি। এ রকম কোন জটিলতা না থাকলে বাবাকে বাবা না বলে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড বলে ডাকতেন না। তাঁর সেক্রেটারির অভিনয় করতেন না। অনিকের আপনি সৎবোন, তাই না?'

'তুমি, সত্যি, বুদ্ধিমান ছেলে।'

'অনিকের কত বছরের বড় আপনি?'

'চার বছরের বড়। বাবার সেক্রেটারি ছিল আমার মা। গভীর রাত পর্যন্ত একসঙ্গে অফিসে বসে কাজ করত দুজনে। বাবার ব্যক্তিত্ব দুর্বল করে ফেলেছিল আমার মা'কে। প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। বাবাকে জানাল সেকথা। বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু বিয়ে করতে রাজি হলো না বাবা। বলল, আরও কয়েক বছর যাক। ব্যবসাটা আরও দাঁড়াক। তারপর বিয়ের কথা ভাববে। পেটের সন্তান, অর্থাৎ আমার কি হবে, জানতে চাইল মা। বাবার তখন উঠতি ব্যবসা। ওই অবস্থায় কোন রকম ঝামেলায় জড়াতে চাইল না বাবা। বলে দিল যা হয় হোক। এ নিয়ে প্রচুর কথা কাটাকাটি হলো। শেষে একদিন চুপচাপ বাবাকে কিছু না বলে চলে গেল মা। ইচ্ছে করলে কোর্টে যেতে পারত, অনেক কিছুই করতে পারত, কিন্তু বাবাকে ভীষণ ভালবাসত বলে তার কোন ক্ষতি করতে চাইল না।'

দম নেয়ার জন্যে থামল এনিড।

অপেক্ষা করছে কিশোর।

'বহুদূরে চলে গেল মা,' আবার বলতে লাগল এনিড। 'নিউ ইয়র্কে। পত্রিকার কাজ জানত, চাকরি পেতে অসুবিধে হত না। কিন্তু পত্রিকায় চাকরি নিলে বাবার চোখে পড়ে যাবে সহজেই, এজন্যে এক ওষুধ কোম্পানিতে কাজ নিল। তাতে বেতন অনেক কম। কষ্টেসৃষ্টে কাটতে লাগল আমাদের দিন। দীর্ঘ বাইশটি বছর কাজ আর আমাকে নিয়ে কাটিয়ে দিল মা। আমাকে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে, ভালভাবে মানুষ করার জন্যে প্রচুর টাকা দরকার। অতিরিক্ত পরিশ্রম করলে, শরীরের দিকে নজর না দিলে যা হয় তাই হলো, অসুখে পড়ল মা…'

'এক মিনিট,' হাত তুলল কিশোর। 'এত বছরের মধ্যে আপনার বাবা আপনার মায়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেননি?'

'করেছে। কিন্তু খুঁজে পায়নি।'

'হ্যাঁ, তারপর?'

'মাকে ডাক্তার দেখালাম। আমি তখন বড় হয়েছি। চাকরি করে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারি। কিন্তু ডাক্তার বলে দিল, চিকিৎসা করে কোন লাভ নেই। মায়ের দিন ফুরিয়েছে। ক্যান্সার…' গলা ধরে এল এনিডের। অন্ধকারে তার ফোঁপানি শোনা গেল।

মিনিটখানেক পর আবার বলল সে, 'মায়ের কাছ থেকে আগেই জেনে নিয়েছিলাম বাবার নাম-ধাম। তাকে খবর দিলাম। নিউ ইয়র্কে ছুটে গেল

বাবা। নিজে উপস্থিত থেকে মায়ের শেষকৃত্য পালন করল। কবর দিল। আমাকে নিয়ে এল এখানে।'

'আপনি বাধা দেননি?'

'না। বাধা দেব কেন? বাপ তার মেয়েকে নিতে চায়...'

'হুঁ।'

'এখানে আসার পর শর্ত দিল, আমি যে তার মেয়ে শুধু আমরা দুজনে জানব। দুনিয়ার আর কাউকে জানাতে পারব না। এত বছর পর এ সব ফাঁস হলে বিরাট স্ক্যান্ডাল হবে। তার সুনাম, সুখ্যাতি, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। এই বয়েসে হার্টের অসুখ নিয়ে সেটা সহ্য করতে পারবে না। মেনে নিলাম তার শর্ত। রয়ে গেলাম এখানে।...কিন্তু হাজার হোক বাপ আর মেয়ে, সেক্রেটারির অভিনয় করে পার পেলাম না। আর কেউ ধরতে না পারলেও আমার প্রতি তার দুর্বলতা চোখে পড়ে গেল অনিকের। সন্দেহ করে বসল। আমাকে চাপ দিতে দিতে শেষে একদিন জেনেই ছাড়ল আসল কথাটা। সম্পত্তির অংশীদার তৈরি হতে দেখে হিংসা করতে লাগল আমাকে। হিংসা থেকে ঘৃণা, ঘৃণা থেকে শত্রুতা। পান থেকে চুন খসলেই বাপকে হুমকি দিতে থাকল, তার গোপন কথা ফাঁস করে দেবে। টাকা আদায় করতে লাগল। সোজা কথায়, ব্ল্যাকমেইল।'

'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড সহ্য করলেন এ সব?'

'না করে কি করবে?...কিন্তু এত কিছু করেও ছেলেকে বশে রাখতে পারল না বাবা। আগে থেকেই খারাপ ছিল–নেশা করত, জুয়া খেলত, যত রাজ্যের চোর-ছ্যাঁচড়দের সঙ্গে সম্পর্ক...আমি আসার পর শতগুণ বেড়ে গেল সেসব। যেন আমাকে নিয়ে আসায় বাবার ওপর জেদ করেই ইচ্ছে করে তাকে কষ্ট দিতে লাগল। তলিয়ে যেতে লাগল দিনকে দিন।'

'আপনার বাবা বাধা দিলেন না?'

'দিয়ে কি হবে? শুনলে তো? উল্টো বাবাকে ধমক দেয়।'

চুপ করল এনিড।

কিশোরও চুপ করে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমাকে এসব কথা বলতে ডেকে আনলেন কেন? আপনাদের গোপন কথা?'

'তুমি তো আগে থেকেই জানো...'

'কিন্তু আমি যে জানি সেটা তো আর আপনি জানতেন না।'

'কি জানি!' বলে ফেলে এখন বোধহয় আফসোস হচ্ছে এনিডের। 'ঝোঁকের মাথায় বলে ফেললাম...আসলে কাউকে বলে মনটা হালকা করতে চেয়েছিলাম। মনে হলো, তোমার ওপর নির্ভর করা যায়, তোমাকে সব বলা যায়...কাউকে বলে দিয়ো না, প্লীজ!'

'হুঁ!'

আবার খানিকক্ষণ চুপচাপ। তারপর কিশোরই বলল, 'এখন নিশ্চয়

ডাক্তারকে খবর দেয়া যায়?'

'হ্যাঁ। চলো।'

*

দরজার ঘন্টা বাজার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গেল ওরা। ভাবল, ডাক্তার এসেছেন।

দরজা খুলে দিল এনিড।

দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা, ডুগানের কফি শপে যাকে দেখেছিল কিশোর–কুস্তিগিরের মত শরীর। কুয়াশা আর বৃষ্টিতে ভিজে চুপচুপে।

'অনিক আছে?' বলে কারও তোয়াক্কা না করেই ভেতরে ঢুকল লোকটা।

'না,' সামলে নিয়েছে এনিড। 'আপনার এখানে কি? আসবেন যে অনিক জানে?'

'জানে তো বটেই। এখানে আমাকে দেখা করতে বলেছে। ক'টা বাজে?'

'আটটা। অনিক গেছে অনেকক্ষণ আগে, এক ঘন্টার বেশি। নিশ্চয় গলফ ক্লাবে গেছে জুয়া খেলতে আর হেরোইন খেতে...হব মোরেনের সঙ্গে...আর কি করবে!' হিস হিস করে উঠল এনিডের কণ্ঠ।

'মনে হয় না। তাহলে এখানে দেখা করতে বলত না আমাকে। অন্য কোথাও গেছে...দেখুন না একবার গলফ ক্লাবে ফোন করে?'

'আমার ঠেকা পড়েছে...'

গাড়ির শব্দ কানে আসতে থেমে গেল এনিড। ড্রাইভওয়েতে ঢুকেছে। সদর দরজার বাইরে এসে থেমে গেল।

এনিডের দিকে তাকিয়ে হাসল লোকটা। 'ওই যে এসে পড়েছে...বললাম না, গলফ ক্লাবে যাবে না। আমাকে বলল এখানে আসতে, আর সে যাবে চলে, এ-কি হয়...'

দড়াম করে গাড়ির দরজা বন্ধ হলো।

এনিডের দিকে তাকাল কিশোর। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল। লুকিয়ে পড়বে কিনা জানতে চাইল। কোন ইশারাই দিল না এনিড।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাটা উচিত মনে করল না কিশোর। রবিন আর মুসাকে নিয়ে দৌড় দিল পেছনের দরজার দিকে। এনিড দাঁড়িয়ে রইল।

দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। উঁকি দিয়ে দেখল।

সদর দরজা খুলে গেছে আবার। ভেতরে ঢুকল অনিক। সঙ্গে যাকে দেখল, দেখে স্থির হয়ে গেল কিশোর। সেই ড্রাইভার। যে ওকে ট্রাকচাপা দিয়ে মারতে চেয়েছিল।

কুস্তিগিরকে আসতে বলেছে। খুনে ড্রাইভারটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। উদ্দেশ্যটা কি অনিকের? বাপকে তো বিষ খাইয়েছেই। বোনকেও শেষ করে দেয়ার ইচ্ছে নাকি? ঝামেলা চুকিয়ে ফেলতে চায় একেবারে?

সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করল কিশোর। ওদের দেখলে ছাড়বে না এখন। সহজে সামনে পড়া চলবে না।

বিশ

পেছনের ঘরের বিরাট জানালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল তিনজনে। বাইরে বৃষ্টিভেজা রাত।

'কি করব?' জানতে চাইল মুসা। 'কেটে পড়ব এখান থেকে?'

'না,' জবাব দিল কিশোর। 'মস্ত বিপদের মধ্যে রয়েছেন এখন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড আর তাঁর মেয়ে। ওদের ফেলে যাওয়াটা এখন উচিত হবে না।'

'মেয়ে!' অবাক হলো রবিন।

'এনিড তাঁর মেয়ে। সব বলব। এসো।'

কার্নিস থেকে সশব্দে পানি ঝরছে পাথরের চত্বরে। চাঁদ নেই। তবে মাটির কাছ থেকে ওপরে উঠে গেছে কুয়াশা।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

জবাব না দিয়ে বাড়ির ধার ঘুরে জানালার কাছে চলে এল কিশোর। আলোর কাছ থেকে দূরে রইল। এখানে থাকলেও চোখে পড়ে যাওয়ার ভয় আছে। আস্তাবলটার দিকে তাকিয়ে ভাবল এক মুহূর্ত। ওটাই সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা মনে হলো, ববির কাজের ঘর ছিল যেটা। দুই সহকারীকে নিয়ে সেদিকে এগোল সে।

জানালার কাছ থেকে সরে এসে বলল, 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড খুব অসুস্থ। ডাক্তারকে ফোন করেছে এনিড। চলে আসবেন যে কোন সময়। অনিক তাকে ঢুকতে দেবে না। সেজন্যে কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।'

ঘরটাতে ঢুকে পড়ল ওরা। জিন, বুট আর নানারকম জিনিসে বোঝাই। তবে বসার জায়গা আছে। শুকনো আছে। বৃষ্টিতে ভেজা লাগবে না। দরজার কাছে ঘাপটি মেরে রইল ওরা।

'অনিককে জিততে দেয়া চলবে না,' কিশোর বলল। 'কোনমতেই না।'

'কি ব্যাপার, তাই তো জানি না,' রবিন বলল। 'এখন কি বলার সময় হয়েছে?'

এনিডের কাছে যা যা শুনে এসেছে, বলতে লাগল কিশোর। বাইরে একনাগাড়ে ঝরছে বৃষ্টি। পেছনের কালো দেয়াল আর ছোট ছোট জানালাওয়ালা ঘরটাকে জেলখানার মত লাগছে ওদের কাছে।

হঠাৎ বাড়ির এদিককার একটা জানালার পাল্লা ঝটকা দিয়ে খুলে গেল। অনিককে দেখা গেল জানালায়। শোনা গেল ওর চিৎকার, 'কোথায় ওরা? তুমি বললে এসেছিল, তাহলে কোথায় গেল? বাড়ি যায়নি, আমি শিওর।'

জানালা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে পড়ল কুস্তিগির। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'কই, নেই তো। খামোকা ভারছ ওদের নিয়ে। আর থাকলেই বা কি?

কয়েকটা ছেলে আমাদের কি করবে?'

'অনেক কিছু করবে। তুমি ওদের চেনো না। রকি বীচে অপরাধীদের কাছে ওরা রীতিমত ত্রাস। যে কাজে হাত দেয়, কখনও বিফল হয়েছে বলে শোনা যায়নি। পুলিশও ওদের জমাখরচ দিয়ে চলে।'

জানালা দিয়ে হলদে আলো এসে পড়েছে ফুলের বেডে। আলোকিত হয়ে আছে জায়গাটা। আস্তাবলটা এখনও অন্ধকারে।

'দেখো দেখো, কোথায় লুকাল ওরা,' চিৎকার করে বলল অনিক।

'ধূর! আগে জানলে ওদের কথা বলতামই না তোমাকে,' বিরক্ত হয়ে বলল কুস্তিগির। 'বেশি ভয় পাচ্ছ।'

'যা বলছি, করো।'

জানালার পাশে এসে দাঁড়াল আরেকজন। এনিড। ওকে দেখেই ফেটে পড়ল অনিক, 'যত নষ্টের মূল তুমি! সব দোষ তোমার! ডেকে আনার আর লোক পেল না! ওদের আনতে গেলে কেন?'

'আরে আস্তে বলো না,' এনিড বলল। 'সারা বাড়ি জাগিয়ে দেবে নাকি তুমি? মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড জেগে যাবেন...'

'হয়েছে, আর ভড়ং করতে হবে না। সবাই সবকিছু জানে। তুমি ওর কি লাগো, তা-ও জানে...' কুস্তিগির দাঁড়িয়ে আছে দেখে ধমকে উঠল, 'কি, দাঁড়িয়ে আছ কেন এখনও? যাও না। খোঁজো না।'

এতবড় একজন মানুষকে যেভাবে ধমকাচ্ছে অনিক, অবাক লাগছে মুসার। তবে যারা বেতন দেয়, টাকা দিয়ে লোক রাখে, তাদের ধমকানোর অধিকার আছে, সেই অধিকারটাই ফলাচ্ছে অনিক। ছেলেটার মাতব্বরি দেখে পিত্তি জ্বলে গেল তার। এই বয়েসেই বস্ হয়ে গেছে। ভাবছে, কুস্তিগিরকে কোথায় দেখেছে। ড্রাইভার হব মোরেনকেও দেখেছে কোথাও। ওর কথা ভাবতেই বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত মনে পড়ে গেল, কোথায় দেখেছে। কুস্তিগির লোকটা পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা ছিল, নাম ক্রুক লিভার। হব ছিল তার ম্যানেজার। দুটোরই স্বভাব খারাপ। হবটা চোর। আর ক্রুক অন্য প্লেয়ারদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করত রিঙে। কয়েকবার সাবধান করেছে বক্সিং ফেডারেশন। কথা না শোনায় শেষে ব্ল্যাকলিস্টেড করে দুজনকেই বের করে দিয়েছে। বডিগার্ড হিসেবে অতি চমৎকার লোক জোগাড় করেছে অনিক।

জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে নামল সে। চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুক। মৃদু আলোকিত একটা জানালার দিকে তাকাল অনিক। বাবার ঘর। মুখ বাঁকাল কিনা বোঝা গেল না। গটগট করে এগিয়ে গেল বাঁ দিকে।

ওদিকে কোথায় গেল প্রথমে বুঝতে পারল না গোয়েন্দারা। তবে মিনিটখানেক পরেই কুকুরের ডাক শুনে অনুমান করে ফেলল।

কুকুরের ঘর থেকে শেকল খুলে গ্রেট ডেন কুকুর দুটোকে নিয়ে এল অনিক।

'আর লুকিয়ে থাকতে পারব না!' ফিসফিস করে বলল মুসা।

'চুপ! দেখি কি করে?'

ব্রুকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল অনিক। বলল, 'আমি যাচ্ছি আস্তাবলের দিকে। কুকুর নিয়ে তুমি যাও ওদিকে, দেয়ালের দিকে। হবকে সামনের দিকটায় থাকতে বলো।'

'না, তুমিই যাও কুকুর দুটোকে নিয়ে,' ব্রুক বলল। 'ওরা আমার কথা শুনবে না। আমি বরং আস্তাবলে যাচ্ছি।'

কুকুর দুটোকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল অনিক। জানালায় দেখা গেল আরেকটা মুখ। হব মোরেন। এনিড সরে গেল। অনিক যা করতে বলে গেছে, হবকে জানাল ব্রুক। সে নিজে এগিয়ে আসতে শুরু করল আস্তাবলের দিকে।

'ছাউনিতে সাইকেলগুলো দেখে ফেললেই মরেছি!' রবিনের গলা কাঁপছে।

'এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে হবে না,' মুসা বলল। 'এসো আমার সঙ্গে।'

পেছনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল মুসা। আস্তাবলে ঢুকল। সেদিন যে ঘোড়াটাকে আদর করেছিল, সেটার স্টলটা দেখে তাতে ঢুকে পড়ল। বিশাল ঘোড়াটার সঙ্গে মৃদু গলায় কথা বলতে লাগল। একেকটা খুর পিরিচের সমান ঘোড়াটার।

ঘোড়াটা নাকি স্বরে একবার ডেকে উঠে চুপ হয়ে গেল।

এগিয়ে আসছে ব্রুকের পায়ের শব্দ। ওঅর্করুমে ঢুকল। দেয়াল হাতড়াতে শুরু করল বাতির সুইচের জন্যে।

ঘোড়াটা শান্ত হয়েছে, আর গোলমাল করবে না বুঝে ওটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল মুসা। কিশোর আর রবিনকে বলল স্টলে ঢুকে কোণের খড়ের গাদায় লুকিয়ে পড়তে। ওদের দেখে আরেকবার ডাকল ঘোড়াটা। তবে অস্থির হলো না। কিছু করল না।

তিনজনেই খড়ের গাদায় লুকিয়ে পড়ল।

সুইচটা এখনও খুঁজে পায়নি ব্রুক। আপনমনে গালাগাল করছে। শেষে দেশলাই জ্বেলে খুঁজল। সুইচ আছে। কিন্তু টেপার সঙ্গে সঙ্গে বাতিটা ফিউজ হয়ে গেল। আবার গাল দিয়ে উঠল সে। তাকের ওপর একটা লণ্ঠন দেখে নামিয়ে নিল সেটা। খস করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বলল আবার। লণ্ঠনটা ধরিয়ে নিল।

পাশের ঘরে বসে দরজা দিয়ে আলোর নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছে গোয়েন্দারা। ওঅর্কশপে ওদের খুঁজে বেড়াচ্ছে লোকটা।

আবার মানুষের সাড়া পেয়ে, আলো দেখে অস্থির হয়ে উঠল ঘোড়াটা। পা ঠুকল। মাথা ঝাড়া দিল। এককোণে ওর স্টলের মধ্যে খড়ের গাদায় গুটিসুটি হয়ে বসে রইল গোয়েন্দারা।

আস্তাবলে ঢুকল ব্রুক। আলো তুলে দেখল অস্থির ঘোড়াটাকে। সাবধানে এগোতে শুরু করল। দম বন্ধ করে খড়ের মধ্যে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে তিন গোয়েন্দা।

আলোটা সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে আসছে ক্রুক। অন্ধকার কোণগুলো দেখার চেষ্টা করছে। একটা বালতিতে লাথি লেগে ঠং করে উঠল। চমকে গেল সে। জোরে জোরে পা ঠুকতে লাগল ঘোড়াটা। নাক তুলে ডাকতে শুরু করল।

ওটার ভাবভঙ্গি ভাল লাগল না ক্রুকের। স্টলে ঢুকতে সাহস করল না। পিছিয়ে যেতে লাগল। ওঅর্কশপের দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। দ্রুত হেঁটে চলে গেল অন্যপাশে।

অন্ধকার হয়ে গেল আবার আস্তাবল।

ওঅর্কশপ থেকে ক্রুকের বেরিয়ে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল।

আস্তে করে খড়ের গাদা থেকে বেরিয়ে এল মুসা। ঘোড়াটাকে শান্ত করার চেষ্টা চালাল।

অনেক কষ্টে শান্ত করল ওটাকে। কিশোর আর রবিনকে বেরিয়ে আসতে বলল। যে কোন সময় আবার উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে ঘোড়াটা। ভয়ে ভয়ে ওটার পাশ দিয়ে বেরিয়ে এল তিনজনে। ওঅর্কশপ থেকে বেরোনোর দরজাটার কাছে এসে দাঁড়াল আবার।

চত্বরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ক্রুক। অনিক বলছে, 'পাওনি? তারমানে সত্যি চলে গেল! বিশ্বাস হচ্ছে না আমার! ভালমত দেখেছ তো?'

'তাহলে তুমি গিয়ে দেখে এসো।'

কি করবে দ্বিধায় পড়ে গেল কিশোর। কুত্তা নিয়ে এলে আর বাঁচতে পারবে না, ধরা পড়তেই হবে। ঘোড়াটাও অনিককে কিছু বলবে না।

অনিক বলল, 'ঠিক আছে, ঘরে চলো। আসল কাজটা সেরে ফেলা দরকার।...দাঁড়াও, আমি কুত্তা দুটোকে বেঁধে রেখে আসি।'

'খুলে রাখলেই পারো, চোর পাহারা দেবে।'

'আমাদের চেয়ে বড় চোর আর কে আছে?' হেসে রসিকতা করল অনিক। 'খুলে রাখা আব্বার পছন্দ না। ইঁদুর, ছুঁচো, যা কিছু দেখুক, ঘেউ ঘেউ শুরু করে। ঘুমাতে দেয় না। বড় বিরক্ত করে...'

কুকুর দুটোর শেকল ধরে নিয়ে কুকুরের ঘরের দিকে রওনা হলো অনিক।

একুশ

ঘরে চলে গেছে সবাই। সব আবার চুপচাপ।

'কি করব?' জিজ্ঞেস করল মুসা।

'ডাক্তারই বা এখনও আসছে না কেন?' রবিনের প্রশ্ন।

ঘন ঘন নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর। দেখতে পাচ্ছে না অন্য দুজন।

'চলো, গিয়ে দেখা যাক কি ঘটছে,' ওঅর্কশপ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।
বৃষ্টি থামেনি এখনও। হলঘরের জানালায় এসে ভেতরে উঁকি দিল ওরা।
ওখানে চলছে আরেক নাটক। স্টাডি আর হলের মাঝের দরজাটা খুলে সেখানে এসে দাঁড়ালেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। ঠিকমত দাঁড়াতেও পারছেন না। দরজার নব ধরে রেখেছেন।
তাঁকে ধরতে দৌড় দিল এনিড।
ঘোরের মধ্যে রয়েছেন যেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড।
ধাক্কা দিয়ে এনিডকে সরিয়ে দিল অনিক। ওপরতলায় চলে যেতে বলল বাবাকে।
মাথা নাড়লেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড। আবার গিয়ে তাঁকে ধরল এনিড। শক্তিহীন একটা মুঠো ছেলের দিকে তুলে ঝাঁকাতে লাগলেন তিনি।
এনিডের একটা হাত চেপে ধরল অনিক। হ্যাঁচকা টান মারল। পুতুলের মত ছুঁড়ে ফেলে দিল বোনকে। টেবিলের সঙ্গে গিয়ে ধাক্কা খেল এনিড। পড়ে গেল মেঝেতে। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'খবরদার, ওর গায়ে হাত দিয়ো না বলছি!'
বাবার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অনিক। পেছন থেকে গিয়ে তার জামা আঁকড়ে ধরে থামানোর চেষ্টা করল এনিড। ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার এক প্রচণ্ড ধাক্কা মারল অনিক। একটা জানালার ওপর গিয়ে পড়ল এনিড। ঝটকা দিয়ে খুলে গেল পাল্লা। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙল। ঠেলে ওকে চৌকাঠের ওপর শুইয়ে ফেলল অনিক। চেপে ধরে রাখল।
রাগে অন্ধ হয়ে গেছে অনিক। এতটা করেও থামল না। হাত ধরে বোনকে টেনে তুলল আবার। হাত মুচড়ে ধরে চিৎকার করে বলতে লাগল, 'ছেলেগুলোকে বলে দিয়েছিস সব! শয়তান কোথাকার! ভেবেছিস ওদের বলে দিলেই সব সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবি। অত সহজ না!'
এনিডও চেঁচিয়ে উঠল, 'কি করবে? মেরে ফেলবে? মারো। বাঁচতে পারবে না। জানতাম, এ রকম কিছু করতে চাইবে তুমি। সেজন্যেই ছেলেগুলোকে ডেকে এনে সব জানিয়ে দিয়েছি। সাক্ষী বানিয়ে রেখেছি। আমার কিছু হলে যাতে ওরা গিয়ে পুলিশকে জানাতে পারে।'
দুর্বল কণ্ঠে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড বলতে লাগলেন, 'এনিড, এ কি করেছিস তুই! আমার মান-সম্মান সব ধুলোয় লুটাবে!'
'এখনও তোমার মান-সম্মান নিয়েই থাকো তুমি! আমার মাকে খেয়েছ, আমাকে মেয়ে বলে সমাজের কাছে স্বীকৃতি দাওনি, মানসিক অত্যাচার করে করে নিজের স্ত্রীকে শেষ করেছ, ছেলেটা হয়েছে আস্ত অমানুষ–বিষ দিয়ে নিজের বাপকে খুন করতে পর্যন্ত যে দ্বিধা করে না...'
'কি বললি!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল অনিক। 'আমি খুন করছি, না তুই? তুই বিষ খাইয়েছিস...আজ ভোরেই একদিন কি আমার...' দুই সহকারীর দিকে তাকিয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'অ্যাই, হাঁ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ

কি? ধরো ওকে। নিয়ে চলো। দেব ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে শেষ করে…'

'সেটা কি উচিত হবে?' মিনমিন করে বলতে গেল ক্রক।

'হবে! খুব হবে! যা বলছি করো! জলদি নিয়ে চলো একে…'

'না না, এমন কাজ করিসনে অনি,' বাধা দিতে চাইলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড।

'তুমি চুপ করো!' ধমকে উঠল অনিক। 'আজ তোমার কথাও শুনব না আমি।'

বোনের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল ক্রক আর হবের সামনে। 'ধরো। নিয়ে চলো।'

আবার বাধা দিতে এলেন মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড।

এক ধাক্কায় তাঁকে ফেলে দিয়ে গটমট করে দরজার দিকে এগোল অনিক। পেছনে এনিডকে টানতে টানতে নিয়ে চলল ক্রক আর হব।

★

'জলদি চলো! সাইকেলগুলো নিতে হবে!' বলেই ছাউনির দিকে দৌড় দিল কিশোর।

ছাউনিতে ঢুকে শুনল গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অনিকের গাড়িটা। তাড়াতাড়ি সাইকেলগুলো বের করে এনে চেপে বসল ওরা।

রবিন বলল, 'মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের কি হবে?'

'আর যাই হোক, এত তাড়াতাড়ি মরবেন না। তবে কষ্ট পাবেন। ডাক্তার এসে ওষুধ দিক বা হাসপাতালে নিক, যা করার করুক, ডাক্তারের দায়িত্ব। আমাদের এখন এনিডকে বাঁচানো জরুরী।'

'ডাক্তার যদি না আসেন?'

'আসবেনই, ফোন যখন করা হয়েছে। বিশেষ করে মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের বাড়ি থেকে। রাস্তায় কোন কারণে দেরি হচ্ছে হয়তো।'

গেট থেকে বেরিয়ে যতটা সম্ভব জোরে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা। ঢাল বেয়ে নামছে বলে গতি অনেক বেশি–কোনভাবে পিছলে পড়লে ঘাড় ভেঙে মরবে। তবু গাড়িটাকে নজরের মধ্যে রাখতে কষ্ট হচ্ছে।

একধারে পাহাড়ের পাথুরে দেয়াল বৃষ্টিতে ভিজে চকচক করছে। আরেক ধারে খাদ। পিচ্ছিল রাস্তা। চোখেমুখে এসে সুচের মত বিঁধছে বৃষ্টির ফোঁটা। যে গতিতে চালাচ্ছে, দুর্ঘটনা ঘটা স্বাভাবিক। পিছলে গিয়ে পাশের খাদে পড়লে মৃত্যু অবধারিত।

সামনে ঘুরতে দেখা গেল গাড়িটার হেডলাইট। ঢুকে পড়ল বনের মধ্যে। কোথায় যাচ্ছে ওটা, অনুমান করতে কষ্ট হলো না কিশোরের। নদীর দিকে যাচ্ছে।

এক মাইল…দুই মাইল…তিন…

আরও কিছুটা এগোতে কানে এল স্রোতের শব্দ। বনের ভেতর ঢুকল ওরা। খোয়া বিছানো রাস্তায় গতি কমাতে বাধ্য হলো। তা ছাড়া পাহাড়ের ঢাল

শেষ হয়ে গেছে। কোনমতেই আর আগের গতি ধরে রাখা সম্ভব নয়।

আরও কিছুদূর এগোতে একটা গাড়ির দরজা লাগানোর শব্দ কানে এল।

কথা না বলে এগিয়ে গেল তিনজনে। নির্জন একটা পরিত্যক্ত কার পার্ক চোখে পড়ল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অনিকের গাড়িটা। ভেতরে কেউ নেই।

পার্কের একধারে তারের বেড়া। লাফ দিয়ে সাইকেল থেকে নেমে বেড়ার গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল কিশোর। 'জলদি এসো,' বলেই দৌড় দিল নদীর দিকে।

রাস্তা নেই। নদীর পাড়ের মাটি এত কাদা হয়ে গেছে, গোড়ালি দেবে যায়। কামড়ে ধরে রাখে। এর ওপর দিয়ে দৌড়াতে পারবে না। মরিয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকাতে লাগল সে। লোকগুলোকে দেখা যাচ্ছে না।

বনের ভেতর দিয়ে নদীর পাড় বরাবর চলে গেছে একটা পায়ে চলা পথ। আর কোন উপায় না দেখে নদীর পাড় ছেড়ে তাতে এসে উঠল ওরা। এখানে কাদা কম। দৌড়াতে শুরু করল গাছপালার ভেতর দিয়ে।

হঠাৎ খেয়াল করল, বৃষ্টি নেই। মেঘও কেটে যাচ্ছে। যেন অজানা কোন দানবের তাড়া খেয়ে তীব্র গতিতে একদিকে ধেয়ে চলেছে ছিন্নভিন্ন মেঘগুলো। মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে এল চাঁদ। ঢুকে গেল আবার। আবার বেরোল। ঢুকল। চলল এই লুকোচুরি খেলা। এতে একটা সুবিধে হয়েছে, দেখা যাচ্ছে আগের চেয়ে পরিষ্কার।

নদীর পাড়ের সেই সাইনবোর্ডটা নজরে পড়ল কিশোরের, বিকেলে যেটা দেখেছিল। যেটাতে লেখা : **সাবধান! এখান দিয়ে নদী পেরোনোর চেষ্টা করবেন না...**

লোকগুলোকেও দেখতে পেল।

স্রোতের শব্দ এমনিতেই এখানে বেশি। বৃষ্টিতে পানি ফুলে উঠে স্রোতের বেগ বেড়ে যাওয়ায় রীতিমত গর্জন করছে এখন।

ওদের কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। গাছের আড়ালে লুকিয়ে থেকে দেখতে লাগল কি করে।

নদীটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সরু কিন্তু বিপজ্জনক, বোনকে টানতে টানতে নিয়ে সেখানে গিয়ে দাঁড়াল অনিক। শ্যাওলায় ঢাকা পিচ্ছিল পাথর মাড়িয়ে একেবারে পানির কাছে চলে গেল। বড় বড় গাছের শেকড় মাটির নিচ দিয়ে পানির কাছে চলে গেছে। মাটি ক্ষয়ে যাওয়ায় বেরিয়ে আছে মাথাগুলো। পায়ে এসে লাগছে ঢেউ।

খানিক দূরে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হব মোরেন। তার পাশে ক্রুক। ভাইবোনের কাণ্ড দেখছে।

স্রোত দেখিয়ে চিৎকার করে বলল অনিক, 'কোন্খানে নিয়ে এসেছি, বুঝতে পারছ?'

'না পারার কোন কারণ নেই,' সমান তেজে জবাব দিল এনিড। 'কারও আত্মহত্যার ইচ্ছে থাকলে ওই পানিতে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেই হলো। শুধু লাশটা

ভেসে উঠবে, তা-ও কপাল খুব বেশি ভাল হলে।'

'তাহলেই বোঝো, কেন নিয়ে আসা হয়েছে তোমাকে।'

খিলখিল করে হেসে উঠল এনিড। অতিরিক্ত মানসিক চাপ সইতে সইতে পাগল হয়ে গেল নাকি? হাঁ করে তাকিয়ে আছে মুসা। রবিনও অবাক। কেবল কিশোরের কোন ভাবান্তর নেই। সব প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে সে।

অনিকও অবাক। 'হাসছ কেন? এতে হাসির কি হলো?'

'এত কথার দরকার কি? ফেলতে এনেছ, ফেলে দাও।'

দ্বিধায় পড়ে গেল অনিক।

'কি হলো? ফেলছ না কেন?' আচমকা হাসি থামিয়ে ধমকে উঠল এনিড। 'ঘিলু নেই নাকি মাথায়? কোন্ ফাঁদে পা দিয়েছ এখনও বুঝতে পারছ না কিছু?'

আরও অবাক হলো অনিক। 'কি বলতে চাইছ?'

'মাথামোটা আর কাকে বলে! প্রতিশোধ। প্রতিশোধ নিতে এসেছি আমি তোমাদের ওপর। তোমাদের বাপ-বেটার ওপর। এতগুলো বছর আমার মাকে একলা ফেলে রেখেছে নিষ্ঠুর বুড়োটা, তিলে তিলে শেষ করেছে। আমাকে মেয়ের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, স্বীকৃতি দেয়নি। প্রেসক্রিপশনের ওষুধের ডোজ কয়েকগুণ বাড়িয়ে খাইয়ে দিয়েছি আমি। শীঘ্রি মরবে বুড়োটা। আজ রাতেই। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। শেষ দেখা দেখানোর জন্যে একজন ডাক্তারকেও কাছে পাবে না। মিসেস জিনজারকে তাড়িয়েছ, ববিকে তাড়িয়েছ, ডাক্তারকে ফোন করার কিংবা খবর দেয়ার জন্যে কেউ নেই বাড়িতে। মৃত্যুর আগে তুমিও বুঝবে, তোমার বাবাও বুঝে যাবে, মানুষের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করলে পরিণতিটা কি হয়।...হ্যাঁ, তুমি শেষ হবে এই ঘূর্ণিপাকে পড়ে।'

ডাক্তার না আসার কারণটা বুঝে ফেলল কিশোর। ওকে দাঁড় করিয়ে রেখে গিয়ে তখন ডাক্তারকে ফোন করেনি এনিড। হব আর ব্রুককে করেছে, চলে আসার জন্যে।

হা-হা করে হেসে উঠল অনিক, 'পাগল! মাথাটা তোমার সত্যি খারাপ হয়ে গেছে। কে কাকে ফেলে পানিতে! আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারবে? এখুনি এক ঠেলায় ফেলে দিতে পারি।'

'আমার পারার দরকার নেই। ব্রুককে আমি বললেই হয়...'

আরও জোরে অট্টহাসি হেসে উঠল অনিক। 'ও ফেলবে? আমার লোক, আমার টাকা খাচ্ছে...'

'তুমি তো বোকার মত টাকা দিচ্ছিলে ওকে। ও আর হব, দুজনই আমার লোক। আমিই ওদের ঠিক করেছিলাম। আমার প্ল্যান মত কাজ করিয়েছি ওদের দিয়ে। তোমার সঙ্গে পরিচয় করানোর ব্যবস্থা করেছি। ওদের দিয়ে তোমাকে নেশা ধরিয়েছি, জুয়া খেলা শিখিয়েছি-ঋণ করেছ, গাড়ি নষ্ট করে বীমার টাকা মারতে চেয়েছ...এ সব করে বুড়োটার কাছে তোমাকে খারাপ বানিয়েছি, কাজের লোকেরা এখন কেউ দেখতে পারে না...বুড়োটা মরবেই। সে মরলে এখন পুলিশ তোমাকে এসে ধরবে, ভাববে তুমি খুন করেছ-ছেলে

তিনটেকে সেটাই বুঝিয়েছি। ওরা সাক্ষী দেবে। তুমি কি ভাবো, খামোকাই ওদের ঢুকতে দিয়েছিলাম? না। দিয়েছিলাম, সাক্ষী রাখার জন্যে। শুধু তাই না। ট্রাক চাপা দিয়ে কিশোর পাশাকে মারার ভান করতে আমিই পাঠিয়েছিলাম হবকে। আইস-রিংকেও দুর্ঘটনা ঘটানোর জন্যে লোক পাঠিয়েছিল হব আমারই নির্দেশে। কিশোর সেটা জানবে না। সে তোমাকেই সন্দেহ করছে। পুলিশের কাছে তোমার কথাই বলবে। প্ল্যান করেই করেছি সব। আমার কাজ শেষ হয়েছে। এখন বলো, নিজে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করবে, না ব্রুককে বলব ঠেলে ফেলে দিতে?'

'শয়তান!' হিস হিস করে উঠল অনিক। 'ভেবেছিস, এ সব করে তুই পার পাবি...'

রাগল না এনিড। শান্তকণ্ঠে বলল, 'না পাওয়ার কি হলো? পানিতে পড়ে মরবে তুমি। পুলিশ ধরে নেবে বাপকে খুন করে অনুশোচনায়, আতঙ্কে তুমি নিজেই এসে আত্মহত্যা করেছ এখানে। কিংবা আমাকে ধরে নিয়ে এসে পানিতে ফেলতে গিয়ে নিজেই পা পিছলে পড়ে গেছ। আমি তো বলবই, ব্রুক আর হবও সাক্ষী দেবে। বিশ্বাস না করলে ওদের জিজ্ঞেস করে দেখো।'

দুজনের দিকে তাকাল অনিক। 'সত্যি বলছে?'

'তো কি মিথ্যে?' খিকখিক করে হাসল হব। 'তুমি গাধার কথামত চলব নাকি আমরা? কয় পয়সা দিতে পারবে? তুমি মারা গেলে সব সম্পত্তি কোর্ট থেকে আদায় করে নেবে এনিড। আমাদের অনেক টাকা দেবে বলেছে।'

'শয়তানের দল!' রাগে চিৎকার করে উঠল অনিক। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই একধাক্কায় পানিতে ফেলে দিল এনিডকে। 'প্রতিশোধ নিবি! যা, নে-গে এখন!'

বাইশ

হুড়মুড় করে গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

হতবুদ্ধি হয়ে গেল অনিক। কল্পনাও করেনি ওরা এখানে চলে আসবে। বোনকে ঠেলে ফেলতে ওকে দেখে ফেলেছে ওরা। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে। দিশেহারার মত হঠাৎ লাফ দিয়ে পাড়ের ওপরে উঠে বনের দিকে দিল দৌড়। ছুটতে ছুটতে ঢুকে পড়ল গাছপালার মধ্যে।

হব আর ব্রুকও তিন গোয়েন্দাকে আশা করেনি এ সময়। মুখ বন্ধ রাখতে হলে এখন তিনজনকেই খুন করতে হবে ওদের। এনিড মারা যাচ্ছে। তার কাছ থেকে টাকা পাওয়ার আশা শেষ। অনিকের কাছে ওদের মুখোশ খুলে গেছে। ওর কাছ থেকেও টাকা আদায় করতে পারবে না আর। শুধু শুধু তাই তিনজন মানুষকে খুন করার ঝুঁকি নিতে চাইল না ওরা। দাঁড়াল না আর

ওখানে। দ্রুত সরে যেতে শুরু করল ওখান থেকে।

ওদের ধরার চেষ্টা করল না কেউ। এনিডকে বাঁচানোটাই জরুরী। পানির কিনারে ছুটে গেল মুসা।

চাঁদের আলোয় সাদা লাগছে পানিকে। কালো একটা পুতুলের মত ডুবছে-ভাসছে এনিডের শরীরটা। এক হাত দিয়ে একটা শেকড় ধরে ফেলেছে। অন্য হাতটা পানিতে ভেসে যাওয়া মরা গাছের ডালের মত তুলে রেখেছে ওপরে। মাথাটা ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পারছে না। বার বার তলিয়ে যাচ্ছে পানিতে। গর্জন করে তার গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পানির স্রোত।

ওর কাছে গিয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল মুসা। বাড়ানো হাতটা ধরে ফেলল। আরেক হাত বাড়িয়ে একটা শেকড় ধরার চেষ্টা করল। নাগাল পেল না। চিৎকার করে রবিন আর কিশোরকে ডাকল, 'আমার হাত ধরো। শেকল বানিয়ে ফেলো।'

সঙ্গে সঙ্গে ওর বাড়ানো হাতটা চেপে ধরল রবিন। আরেকটা হাত বাড়িয়ে দিল কিশোরের দিকে। ওই হাতটা কিশোর ধরে অন্য হাত দিয়ে ধরল একটা শেকড়।

এনিডকে তুলে আনার জন্যে টানতে শুরু করল মুসা। সাংঘাতিক ঝুঁকি নিচ্ছে ওরা। একটা সাধারণ শেকড় এতজনের ভার রাখতে পারবে কিনা সন্দেহ। ছিঁড়ে গেলে এনিডের সঙ্গে মুসাও পড়ে যাবে পানিতে। টান লেগে রবিনও পড়তে পারে, কিংবা তিনজনেই। শেকড় যদি না-ও ছেঁড়ে তিনজনের মধ্যে কোন একজনের হাত ছুটে গেলেও দু'একজনকে মরতে হবে।

টানটা বেশি পড়ছে কিশোরের হাতে। তিনজনের ভার রাখতে হচ্ছে ওকে। হাতের শিরা ফুলে উঠল। টনটন করে ব্যথা শুরু হলো। হাঁপাচ্ছে। ঘাম বেরিয়ে আসছে দরদর করে। কতক্ষণ ধরে রাখতে পারবে কে জানে। তবে আর বেশিক্ষণ পারবে বলে মনে হয় না।

ইঞ্চি ইঞ্চি করে উঠে আসছে এনিডের শরীরটা।

আর কতক্ষণ?

সহ্য করতে পারছে না কিশোর। রবিন ওর যে হাতটা ধরে রেখেছে, সেটার কব্জির কাছ থেকে তীব্র ব্যথা উঠে এসে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সমস্ত কাঁধে।

রবিনের হাতও ব্যথা করছে।

টেনেই চলেছে মুসা।

কিশোর যখন আর পারছে না, আঙুলগুলো আপনাআপনি খুলে আসতে যাচ্ছে শেকড় থেকে, হঠাৎ ঢিল পড়ল এই সময়। অবশেষে এনিডকে পানি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে মুসা।

ওইভাবেই বসে থেকে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিল ওরা। তারপর এনিডকে বয়ে নিয়ে এল ওপরে।

প্রচুর পানি পেটে গেছে তার। বেহুঁশ হয়ে গেছে। মুখে মুখ লাগিয়ে

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। দেরি না করে মুখ লাগিয়ে জোরে জোরে ফুঁ দিতে শুরু করল মুসা।

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'তোমরা থাকো।'

'কোথায় যাচ্ছ,' জানতে চাইল রবিন।

'ফোন করতে। ডাক্তারকে খবর দিতে হবে। মিস্টার ম্যাকডোনাল্ডের এতক্ষণে কি অবস্থা হয়েছে, কে জানে। এনিডেরও চিকিৎসা দরকার। তা ছাড়া, পুলিশকেও খবর দিতে হবে।'

রবিনকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে রওনা হয়ে গেল কিশোর।

ভলিউম ৩২

তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

হাল্লো, কিশোর বন্ধুরা–
আমি কিশোর পাশা বলছি, আমেরিকার রকি বীচ থেকে।
জায়গাটা লস অ্যাঞ্জেলেসে, প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে,
হলিউড থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে।
যারা এখনও আমাদের পরিচয় জানো না, তাদের বলছি,
আমরা তিন বন্ধু একটা গোয়েন্দা সংস্থা খুলেছি, নাম

তিন গোয়েন্দা

আমি বাঙালী। থাকি চাচা-চাচীর কাছে।
দুই বন্ধুর একজনের নাম মুসা আমান, ব্যায়ামবীর,
আমেরিকান নিগ্রো; অন্যজন আইরিশ আমেরিকান,
রবিন মিলফোর্ড, বইয়ের পোকা।
একই ক্লাসে পড়ি আমরা।
পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে লোহা-লক্কড়ের জঞ্জালের নিচে
পুরানো এক মোবাইল হোম-এ আমাদের হেডকোয়ার্টার।

তিনটি রহস্যের সমাধান করতে চলেছি–
এসো না, চলে এসো আমাদের দলে।

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০